কথামালা প্রকাশনী

বীরেশ্বর বসু

চা

তৃতীয় পর্ব

১৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৬৭

প্রকাশক। মনোজকুমার বসু, কথামালা প্রকাশনী
১৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

মুদ্রক। প্রফুল্লকুমার রায়, অগ্রণী প্রেস
১৫৩।৫, অপার সারকুলার রোড কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ। সুবোধ দাশগুপ্ত

দাম : ৫·০০

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

ও

শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী

সপ্রীতিশ্রদ্ধাস্পদেষু

প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের ন্যায় এই পর্বের নতুন চরিত্রগুলিও কাল্পনিক।

লেখক

এই লেখকের :—

চা মাটি মানুষ ১ম পর্ব

চা মাটি মানুষ ২য় পর্ব

উন্মেষ

ঘূর্ণীহাওয়া

রাস

মায়ের গান

মানসলতা
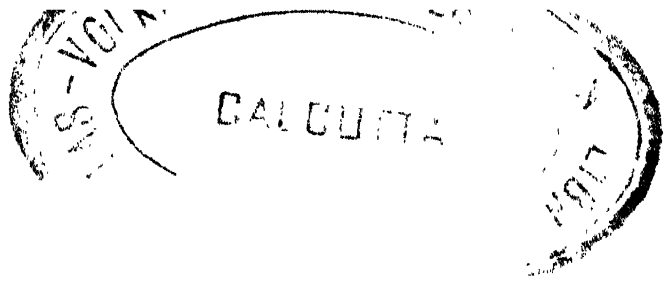
এক

ভাওনাথ ও পদমমায়া জেলে। আর সাধু মারা গেছে এই সংবাদে সমস্ত বাগানটাই কেমন যেন নিথর নিস্তব্ধ পাষাণের মত হয়ে পড়ে। সাধুর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সকলেই একটা বিভীষিকা দেখতে পায়। অন্যায় অবিচারে সাধুকে মারা হয়েছে নিরর্থক। এমন করেই ওরা হয়ত ভাওনাথ ও পদমমায়াকেও হারাবে। সেদিন আগতপ্রায়। রাতের স্বপ্ন কুহেলীর মধ্যে ভুতুম পেঁচার ডাকের মত বীভৎস চীৎকার শুনে চমকে ওঠে। একটা অশরীরী চিন্তা সমস্ত অন্তরে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। একটা কঠোর বাস্তব বেদনাময় অনুভূতিতে সর্বাঙ্গের রোমগুলো জেগে সোজা হয়ে দাঁড়ায়, ঠোঁট ভ্রু বেঁকে ও কুঁচকে যায়। সমস্ত দেহটা ভয়ে থর থর কাঁপতে থাকে।

প্রথমে এই সন্ত্রাস ভাব বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় বুড়োদের মধ্যে। তারপর তা সঞ্চারিত হয় জোয়ান জোয়ান ছেলে মেয়েদের মধ্যে। বুড়োরাই এজন্য দায়ী। বাবা মা যেমন তার অশান্ত ছোট ছেলেকে জুজুর ভয় দেখিয়ে শান্ত করতে প্রয়াস পায় এই বুড়োরাও এই জোয়ান জোয়ান ছেলেদের মনের পর্দায় মৃত্যুর একটা বিভীষিকা অঙ্কন করে দিয়েছে। মৃত্যু বলতে তারা যা বোঝে এ যেন তা থেকে পৃথক। এই মৃত্যু যেন তার আপন পথ ধরে আসেনি, একে জোর করে টেনে আনা হয়েছে। এ যেন বাঁধাধরা পথের মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি যন্ত্রণা ও বেদনাদায়ক। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বন্দীশালা। অনেক কঙ্কালসার রুগ্নদেহ, মাংস নেই শুধু হাড় আর ওপরে একটা চামড়ার আস্তরণ। হাড়গুলো গুনে বের করা যাচ্ছে। বড় বড় চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। কী বীভৎস ভয়ঙ্কর চেহারা! আর এদের চার পাশ দিয়ে ঘুরছে অগুণতি ছায়ামূর্তি। যে ভয়কে আজ ক'দিন আগেও ওরা আমল

দেয়নি সেই ভয় আজ যেন মূর্তিমতী হয়ে তাদের মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে।

এরপর একহপ্তা যেতে না যেতেই স্কুলের ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা প্রায় শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। অম্বরবাহাদুরের বুড়ো হাড়গুলোও ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে শুরু করেছে উত্তরের অপরিমেয় শৈত্যে। শোক, দুঃখ বেদনা আর নিঃসঙ্গ একাকিত্বের একটা অসহনীয় অনুভূতি তার সমস্ত বুকটা জুড়ে একটা বিষময় পাথর হয়ে দাঁড়িয়েছে। দম আটকে আসে তার। জামার বোতাম আর সুরুয়ালের বেল্ট খুলে দিয়ে সহজভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস নিতে চেষ্টা করে, সমস্ত দেহটা নুইয়ে দু'হাতে শক্ত করে মাথাটা চেপে ধরে বসে থাকে।

অনেকদিন বাদে একটু রকশি খেয়েছে অম্বরবাহাদুর। আধো বোজা চোখে সে দেখতে পায় একহারা প্রায় ডালশূন্য লম্বা শিরীষ গাছের পাতাগুলো কাঁপছে। একটা শোকার্ত করুণ মর্মরধ্বনি শুনতে পায় সে। পাতাগুলো কাঁদছে। সমস্ত অন্তর নিঙড়ে অম্বরবাহাদুরের চোখে জল আসে। একটা একান্ত অবোধ ছায়ার মত চিন্তা তার মনটাকে বিষিয়ে তোলে। মানুষের ওপরে আর কোন আস্থা নেই তার। একটা বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে রাস্তার দিকে তাকায়। রাস্তায় সন্ধ্যার আস্তরণ পড়েছে। কয়লার খরানিমোড়া রাস্তা আরো অন্ধকার দেখাচ্ছে, তা থেকে দু'চারটে বাল্ব চোখ মেলে উঁকি মারছে। মনে হচ্ছে বাল্ব নয় ছোট বিন্দু বিন্দু আলোর ফিনকি। নির্জন জনমানবহীন সন্ধ্যা। আলো মরে গেছে। ঘোর অন্ধকার জন্ম নিয়েছে। এই রকম সন্ধ্যা সে জীবনে দেখেনি কোন দিন। সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন এক নিশ্বাসে গ্রাস করে ফেলেছে সে। এই সন্ধ্যায় সে দেখে এসেছে রাস্তার ফাঁকে ফাঁকে কৃত্রিম আলো জলতে, শুনতে পেয়েছে মানুষের কলরব। বাড়িতে বসেই তাদের গন্ধ পেত অম্বরবাহাদুর। মনের অফুরাণ ও অকৃত্রিম আলোতে সে দেখতে পেত তাদের চেহারা। চোখেমুখে ছিল হাসি, আশা আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ। আর আজ সে দেখতে পাচ্ছে ভুতড়ির জঙ্গলটা যেন তার দৈত্যাকার

হাত বাড়িয়ে দিয়েছে রাস্তার ওপর। পশুগুলোও এগিয়ে এসেছে। তাদের গায়ের সোঁদা সোঁদা ভোট্কা গন্ধ পাচ্ছে নাকে আর শুনতে পাচ্ছে তাদের বিকট চীৎকার।

এই কঠোর অবাঞ্ছিত নির্মমতার মধ্যেও বাগানে দিন দিন ভোর আগের স্বাভাবিক সুরে ফিরে আসছে। ভোর না হতেই দু'টো পান্তাভাত খেয়ে কাজে বেরোয় আর সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে রকশি কিম্বা হাঁড়িয়া খেয়ে হল্লাহল্লি করে। অতীত বা ভবিষ্যতের চিন্তা নেই, শুধু অম্লান মধুর বর্তমানের রসে আপ্লুত। সেদিন যে কবে ছিলনা, কবে অন্যদিন এসেছিল তা ভাল করে স্মরণ করতে পারে না অম্বর-বাহাদুর। এ-কথা ভাবতেও লজ্জা বোধ করে সে। নিজেকে যেন নির্বোধ, অপমানিত ও অকৃতকার্য বলে মনে করে। প্রতারক ভাবে। না, প্রতারণা সে করনি কারো। তবে কি সে আগের পথে ফিরে যাবে আবার? কখন থেকে যে আকাশে মেঘ জমেছে তা টের পায়নি অম্বরবাহাদুর। মনে হচ্ছে বৃষ্টি পড়ছে টুপটুপ করে। চোখের আবছা আলোতে দেখতে পায় স্কুলের আধোমরা ফুলগাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা। না, বৃষ্টি নয় আকাশের অশ্রু। নিজের চোখ দু'টো মুছে নেয়। তখনও জল পড়ছে আকাশ ভেঙে। সে দেখতে পায় তার চারপাশে শুধু উপহাসের তির্যক হাসি। আগুপিছু সব সমান।

বিলাসী কিন্তু নির্বিকার, নিশ্চল একটা পাথর বিশেষ। কোন তাতেই তাপ উত্তাপ নেই তার। মোহ মায়া দুঃখ শোক সব কিছুর উর্ধ্বে সে। আর আশ্চর্য ঐ মেয়েটি, মদনফুল। মা জেলে গেছে একটুও ভ্রূক্ষেপ নেই।

বিলাসী অম্বরবাহাদুরের মনের ভাব বুঝতে পারে।

অম্বরবাহাদুর স্কুলের কাজ পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করতে আসে বিলাসীর কাছে। সে বললে, স্কুলে যে আর কেউ আসছে না আজকাল। কি করবে, ভেবে দেখেছ?

নির্বিকার চিত্তে বিলাসী উত্তর দেয়, স্কুল তুলে দেওয়া চলবে না সর্দার। তুমি, তোমার ছেলে মেয়ে, প্রেমপ্রকাশ, তার স্ত্রী, করুণা-সিং, মদনফুল আর আমি এতে মিলে নয় দশ জন হবে। ভালো

সর্দার অনেক সকাল আসে তারপর সন্ধ্যা, রাত হয়। অনেক ঝড় জল আসে আবার আকাশে রোদ দেখা যায়, সকালও হয়। এই ভয় সাময়িক, ভয়ের মধ্যেই সাহসের জন্ম হয় যেমন মেঘের মধ্যে রোদ। চিন্তা করার কিছু নেই, কাজ করে যাও যথারীতি।

অম্বরবহাদুরের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। শোকে, দুঃখে, বিক্ষোভে ও রাগে মাঝে মাঝে বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সে বললো, আমার আর ভরসা নেই এই গরুগুলোর ওপর। কাদের জন্ত এ-সব করা, কেন এই যন্ত্রণা ভোগ করা? আমার ইচ্ছে হয় বিলাসী আবার আগের পথে ফিরে যাই।

বিলাসী অম্বরবাহাদুরের শেষ উক্তি শুনে চমকে ওঠে। অল্পক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলে, তাতে সুখ পাবে না সর্দার। আগের পথে চললে লোকে বেশি উপহাস করবে, কাপুরুষ বলবে তোমাকে। সামনে এগিয়ে চললে হয়ত বোকা বলবে, দুঃখও করবে অনেকে কিন্তু তুমি যে বীর, সাহসী এ-কথাও মেনে নেবে। পিছিয়ে গেলে তুমি সেই আগের মান প্রতিপত্তিও নিশ্চয়ই পাবে না কারণ তখন তোমাকে লোকে নির্বোধ বলে জেনে নেবে আর এগিয়ে চলতে থাকলে বেশির ভাগ লোকেই ভাববে, নিশ্চয়ই এরমধ্যে কিছু আছে নতুবা সর্দারের মত একজন বুদ্ধিমান লোক কেন এমন করবে। এছাড়া আজকাল অনেকেই একটু লিখতে পড়তে শিখেছে, ভাবতে শিখেছে, জীবনটাকে অল্পবিস্তর উপলব্ধি করতে পেরেছে। এর একটা মূল্য আছে। একটা বীজকে তুমি যতই ছাই চাপা দেও না কেন তা একদিন না একদিন অঙ্কুরিত হবেই। ভয়ের বিভীষিকা কেটে গেলেই আবার ফিরে আসবে সকলে। ধৈর্যহীন হয়ে সমস্ত পরিকল্পনাটাকে কবর দিওনা আর ঐ সঙ্গে নিজেকেও খাটো করতে যেও না।

বিলাসী দেখতে পায় অম্বরবাহাদুরের বিকৃত, বিতৃষ্ণ বাঁকা মুখ ও কোঁচকা ভ্রু দুটো সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। স্তিমিত-প্রায় ছোট কুৎকুতে চোখ দুটো অনেকটা খুলেছে। উত্তরের পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে অম্বরবাহাদুর। সুন্দর পাহাড়ী ঢালুর উপরে এতক্ষণ যে একটা কুয়াশার আবরণ ছিল তা যেন কেটে

গেছে। বাতাসের সঙ্গে ভেসে আসছে পাহাড়ী ময়না, টিয়ে ও শ্যামার গান। কত পাহাড় পর্বত চড়াই উৎরাই পার হয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে উড়ে আসছে তারা। প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন অনেক ছবি ভেসে উঠছে তার চোখে। ছবিগুলো এতো স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠছে তাতে বিলাসীর মনে হয় সমস্ত নৈশ নিস্তব্ধতা যেন ভেঙে খান্ খান্ করে চন্দ্রলোকের আলোকরশ্মি দ্রুত চঞ্চল গতিতে এগিয়ে আসছে তাদের দিকে।

একটা পরিপুর্ণ দৃষ্টি মেলে অম্বরবাহাদুরের দিকে চেয়ে থাকে বিলাসী। মনে হয় তার বয়স যেন অনেক কমে গেছে, মুখখানা সরল কোমল দীপ্তিময় শিথিল দেহ যেন দৃঢ়তায় পরিপুর্ণ। একটা নতুন অনুভূতি উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে তার অন্তরে।

বিলাসীর মনে এক ঝাঁক নির্মল বাতাস এসে লাগে। চা ও শিরাষ-ফুলের গন্ধ পায় নাকে। দেখতে পায় নদীর শান্ত জলে আকাশের নিবিড় ছায়া। অসংখ্য ঢেউ আছড়ে, ছপ্ ছপ্ ঝপ্ শপ্ শব্দ হচ্ছে তার। কর্মরত ঢেউয়ের আনন্দ-কোলাহল আর প্রকৃতির ধ্যানগম্ভীর সৌন্দর্য মিলে সমস্ত নদী ও তার তীরভুমিকে উজ্জ্বল মধুরতম করে তুলেছে।

এরপর অম্বরবাহাদুরের সমস্ত খণ্ড খণ্ড ছবি একটা অখণ্ডতায় পুর্ণতর হয়ে ওঠে। অবচেতন মনের স্বপ্ন আলেখ্য থেকেই জন্ম নেয় অতি নৈকট্য বাস্তবতা। সে বলে ওঠে—তিমিলে ঠিকই ভনেয়ো বিলাসী। এ-কথা আমিও ভেবেছি আগে। আগু পিছু যেখানেই যাই সেখানেই উপহাস। আর মান প্রতিপত্তি বা বাহবার কি মূল্য আছে। যখন জন্মেছি তখন কি মান প্রতিপত্তি নিয়ে জন্মেছি আবার যাবার সময় যখন যাব তখনও মান প্রতিপত্তি সঙ্গে নিয়ে যাব না। তাই আমার মনে হয় মান প্রতিপত্তির কোন প্রশ্ন ওঠে না। এই মান প্রতিপত্তি একটা স্থূল কিছু যার মূলে শুধু স্বার্থ। যখন জন্মেছি তখন আনন্দ নিয়ে এসেছিলাম আর আনন্দই দিয়েছিলাম পারিবারিক লোকগুলোকে। জন্মের সময় যে হাসি ফুটিয়েছিলাম তাদের মুখে আমি সেই হাসিই অক্ষয় অব্যয় করে রাখতে চেষ্টা করবো।

অম্বরবাহাদুরের কথা শুনে দৃঢ় সংলগ্ন ঠোঁট দু'টো খুলে যায় বিলাসীর। তার সমস্ত রুষ্ট, রূঢ় অভিযোগগুলো মুহূর্তের মধ্যে সরে যায়। একটা মসৃণ অথচ বেদনাময় কণ্ঠে বললো—জানো, দুরদৃষ্টিতে দেখলে মানুষের জীবন মনে হয় বড় শূন্য, রিক্ত তখন জীবন বিদ্রূপের হাসি হাসে কিন্তু তাকে নিকটের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে দেখতে পাবে জীবন পূর্ণকুম্ভ। নিজের অন্তরের কথা শুনতে চেষ্টা করবে। অন্তরই জীবনের পথ নির্দর্শক। মানুষ তা বোঝে না যা অনুভব করতে পারেনা দুরদর্শিতার অভাবে। তাই যা সত্য তা হারিয়ে যায়। প্রকৃত শক্তিমান ছাড়া জীবনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পায় না কেউ। মানুষ তখন ভয়ে সন্ত্রাসে নিজেকে দুইভাগে বিভক্ত করে ফেলে। যৌক্তিকতা খুঁজে পায় না। একটা ঘৃণ্য, অপ্রীতিকর জীবনযাপন করে তখন।

বিলাসীর জীবনভাষ্যগুলি অম্বরবাহাদুরের প্রত্যয়কে আরো দৃঢ়তর করে। তার মনের সমস্ত অবাধ্য দেয়ালগুলো ভেঙে যেন একটা পূর্ণ মন গড়ে ওঠে। তার প্রতিফলন হয়েছে চোখে। সে বললো—তাহলে ঠিক আছে। কাল থেকে আবার কাজে লেগে-পড়া যাক।

বিলাসী বললো নিশ্চয়ই। এই তো আর কয়মাস বাদে পদমমায়া ফিরে আসবে তার কিছুদিন বাদে ভাওনাথও। তারপর আর চিন্তা কি? কথাগুলো হেসেই বলে সে কিন্তু তার মধ্যেও একটা ছায়া আছে প্রচ্ছন্নভাবে। সামনের সরল রাস্তার ওপর যেন একটা কালো ফিতার দাগ। কালো ফিতেটা মনে হচ্ছে রাস্তার বুক কেটে এইমাত্র বেরিয়ে এসেছে।

অম্বরবাহাদুর চলে যাওয়ার পর মদনকুল বললো—এই লোকগুলোর মনের দৃঢ়তা নেই। কীটভর্তি মন। মনটাকে চালনির মত শতছিদ্র করে দিয়েছে। জীবনটা যেন উদ্দেশ্যবিহীন। এদের সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই। শুধু বেঁচেই থাকতে চায় এরা কিন্তু অনাবশ্যক হয়ে।

ঠিক বলেছিস মদনকুল। যারা মনকে চিনতে পারে না তারা জীবনকেও উপলব্ধি করতে পারে না। মন বাঁধলে জীবনও বাঁধা পড়বে।

এরপর থেকে শুধু নামমাত্র কয়টি প্রাণী সন্ধ্যাদীপ জেলে ভুলে গিয়ে বসে, অনেক পরামর্শ করে, কি করে স্কুলটাকে জমজম করে তুলতে পারে। কোন পরামর্শ বা পরিকল্পনাই কার্যকরী করা সম্ভবপর হচ্ছে না অথচ সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা করে করে অনেক দিন চলে গেল কিন্তু কেউ মুখ ফিরিয়ে তাকায় না তাদের দিকে। এরা যেন পতিত, অপাঙক্তেয়। এদের মুখদর্শনেও পাপ হয়। এরা স্কুলঘরটার দিকে আর তাকাতে পারে না। মনে করে স্কুলঘরটা একটা আগুনের কুণ্ড। অথবা কোন কোন সময়ে মনে করে এ একটা রঙ্গমঞ্চ। এর অভিনয় শেষ হয়ে গেছে তাই যবনিকা টেনে দিয়েছে এর মালিকরা, নিভিয়ে দিয়েছে আলো। রঙ্গমঞ্চটা এখন আর নাট্যশালা নয়, এ একটা অতিকায় দৈত্য বিশেষ।

মদনকুল দুঃখের সঙ্গে বলে—কী আশ্চর্য, এই যে বিষ মিশ্রিত বাতাস বয়ে যাচ্ছে বাগানের ওপর দিয়ে যা আমাদের দেহ ও মনকে তিতিয়ে বিষিয়ে তুলেছে তা কি বাগানের আর আর লোক-গুলোর গায়ে লাগছে না? ওরা তো বেশ সুস্থই আছে। আমার ইচ্ছা ওদের সমস্ত দেহে বিষ ফোড়া হয়ে জেগে উঠুক, যন্ত্রণায় ছটফট করুক।

বিলাসী রাগত গলায় বলে উঠলো—ছি, মদন, লোকের অমঙ্গল কামনা করতে নেই।

মদনকুল একটুও দমেনি। আগের মত তিক্ত গলায় বললে—অমঙ্গল ডেকে এনে তার মধ্য থেকেই মঙ্গল বার করে নিতে হবে আমাদের নতুবা কোনদিনই সুযোগ আসবে না।

চিরদিন সমান যায় না মদন। সুযোগ সুবিধা আপনা থেকেই আসবে এ-জন্য লোকের অমঙ্গল ডাকতে নেই।

—আমি চাই অদৃশ্যলোক থেকে নেমে আসুক ক্রোধাগ্নি। মানুষ অনুতাপ করুক তার পাপের জন্য। জীবনের শৃঙ্খলা জন্যে ত খুঁজে ফিরুক সত্য লক্ষ্যপথ।

এরপর সমস্ত বাগানের বুকের ওপর নেমে আসে এক ধূসর

বিবর্ণ কুয়াশা। চারিদিকের সমস্ত স্বচ্ছন্দতা, মাতালের অস্পষ্ট অর্থহীন সঙ্গীত, মাদলের বেতাল বাজনা সব থেমে গিয়ে ক্ষীণ চাপা দীর্ঘশ্বাসে ভরে ওঠে বাগানটা। বাতাসে বাতাসে ভেসে আসছে সেই চাপা দীর্ঘশ্বাস। আশ্রয় খুঁজছে, সাহায্য-প্রার্থনা করছে। সমস্ত বাগানটা যেন মরে গেছে। তাকে ঘিরে আছে একটা কায়াহীন নিথর ছায়ামূর্তি।

এই অন্ধকারের মধ্যেও লোক আছে, আলো আছে। মৃত্যুর মধ্যেও জীবন আছে। মদনকুল হো হো করে হাসে।

এতে মনে ব্যথা পায় বিলাসী। মাতৃস্নেহ যেন তাকে কাতর রুগ্ন সন্তানের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাদের কাতর আর্তনাদ শুনতে পায় সে। মন ছুটে-যায় দূরে দূরে অতিদূরে তার দৃষ্টির বাইরে তবু সে দেখতে পায় তাদের ক্ষীণ দুর্বল দেহ, নিষ্প্রভ চোখ। রাগে আগুনের মত জ্বলে উঠে বলে—বেহায়া কোথাকার, লজ্জা করে না হাসতে।

মদনকুল এতেও নরম হয় না। সে সোৎসাহে বললে—এই তো সুযোগ এসেছে। এবারে অমঙ্গল থেকে মঙ্গলকে কুড়িয়ে নিয়ে আসবো।

ঘরে ঘরে তীব্র যন্ত্রণাদায়ক আর্তনাদ, নীরব বেদনাময় দীর্ঘশ্বাস আর ক্রন্দনের রোল মিলে আসন্ন ধ্বংসের একটা নিশ্চিত চিহ্ন ফুটে উঠেছে বাগানে। সাহেব বাবু কুলি মজুর দোকানদার সকলেই তটস্থ—কখন কি হয়।

এই সময়ে একটা নতুন প্রত্যয় দেখা দেয় মজুরদের ভেতরে যা কিছুদিন আগে অনেকের মধ্যেই বিশেষ করে পড়ুয়াদের মধ্যে এই প্রত্যয়ের কাঠামোতে চিড় লেগেছিল। সান্ধ্য নিস্তব্ধতার বুক চিরে ভেসে আসে শিঙে ডুম্বর করতালের শব্দ আর এর ফাঁকে ফাঁকে উপাধ্যায়ের দৃঢ় প্রত্যয়ভরা গুরুগম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ। সমস্ত যন্ত্রণার ঘায়ে ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়ে। বেদনাদায়ক আর্তনাদ দীর্ঘশ্বাস ও ক্রন্দনের রোল থেমে গিয়ে একটা নতুন জীবনের আস্বাদ আসে। হাতজোড় করে নিষ্পলক চেয়ে থাকে পুজারী আর পুজোর আসনের দিকে। ধুপধুনো ফুলচন্দনের গন্ধ আসে নাকে। ফুলগুলো যেন

জীবন্ত, প্রাণময় হয়ে উঠেছে কার স্পর্শে। তন্ময় হয়ে ভাবে। সামনে মূর্ত হয়ে ফুটে ওঠে জিতবাহন, করমগোঁসাই অথবা নারায়ণের অবয়ব। জিতবাহন ও করমগোঁসাই তাঁদের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঁধা দিচ্ছেন, আর নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দিয়ে বাতাসটাকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে কেটে ছিঁড়ে ফেলছেন।

প্রতিদিন ঘরে ঘরে পুজোর এত হিড়িক পড়ে যে এতে সকলের অনুরোধ উপরোধ রক্ষা করা একার পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে উপাধ্যায়ের। সে তার সারা জীবনের কাজ ও আয়ের সঙ্গে এই ক'দিনের কাজ ও আয়ের একটা হিসাব করে মনে মনে। সারা জীবনের হিসাবে একটা পয়সাও উদ্বৃত্ত নেই অথচ এই ক'দিনে দেদার খরচপত্তর করেও জমার খাতায় বেশ কিছু জমেছে। স্ত্রীর গলায় কণ্ঠি আর কানের বড় বড় দুখানা গোদোওয়ারী (কানফুল) হয়েছে। পারিবারিক একটা স্বচ্ছ স্বাচ্ছন্দ্যতা ফিরে এসেছে। এই স্বাচ্ছন্দ্যতার মধ্যে আজ-কাল মাঝে মাঝে মনে একটা খোঁচাও খায়। এতদিন অস্বচ্ছলতার মধ্যে যে অভাবটাকে সে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল সেই অভাব আজ তাকে পীড়ন করছে। সে পুত্র করুণা-সিংকে ডেকে পাঠায়। তাকে বলে—যা হবার হয়ে গেছে। এবারে ফিরে এস বাড়িতে। একটা প্রায়শ্চিত্ত করে আবার জাতিতে তুলে নেব। আমি একা আর সামাল দিতে পারছিঁ নে। আর এই মরসুমও দীর্ঘদিন থাকবে না। দু'জনে মিলে এই সময়টার সদ্ব্যবহার করলে আমার মনে হয় তোমার জীবন পর্যন্ত খাওয়াপরার কোনই অভাব হবে না।

পিতার অনুরোধের উত্তরে অনেক কিছু বলবার ছিল করুণ-সিংএর। অসংখ্য কথা তরঙ্গায়িত হয়ে মনের পাড় ভেঙে পড়ে কিন্তু সংযত করুণসিং তার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার বাঁধ দিয়ে তরঙ্গের গতিপথ রুদ্ধ করে। সামান্য একটা কথায় উপাধ্যায়ের কথাগুলোর জবাব দেয়। যে পথকে একদিন ন্যায় ও সত্য বলে গ্রহণ করেছি তাকে জীবন থাকতে ত্যাগ করবো না। তোমার কাছে মাপ চাইছি আমি।

একটা অপ্রত্যাশিত বিক্ষিপ্ত বাতাস এসে উপাধ্যায়কে অতর্কিত

আক্রমণ করে। সে যেন নির্বাক মাটির ওপর মুয়ে পড়ছিল। হঠাৎ চেতনা ফিরে রুখে দাঁড়ায়। ছোট করে ছাঁটা মাথার চুলগুলো যে যার মত খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে উড়ে আসা পথের বালিগুলো চোখ দু'টো বড় ও লাল করে দিয়েছে। সে বিকট একটা চীৎকার করে বলে ওঠে—ক্ষমা? কখনই না।

করুণসিং আর দেরি করে না সেখানে। যেতে যেতে শুনতে পায় উপাধ্যায়ের কথা। সে বলছে—ক্ষমা নয়, অভিশাপ দিচ্ছি তোকে। রোগীদের জন্য মঙ্গলকামনা করলি নে পাষণ্ড। আমি ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে, তোর বাবা হয়ে অভিশাপ দিচ্ছি ঐ রোগীদের মত যন্ত্রণা ভোগ কর তুই, রুদ্ধ হয়ে যাক তোর শ্বাস।

এমনি করে দিন দিন বাগানের জীবনপ্রবাহ অধিকতর দুঃসহ ও দুর্বহ হয়ে ওঠে। বড়সাহেব ও ডাক্তারসাহেব দুইজনে মিলে তার করেন কোম্পানীতে। তারেই মাধ্যমেই কোম্পানী থেকে জবাব আসে। তাঁরা জানান যে বাগানের পূর্বপ্রান্তে রিজার্ভ ফরেষ্টের লাগোয়া যে পতিত জমি আছে কোম্পানীর সেখানে বাঁশ খুঁটি খড় দিয়ে কতকগুলো লম্বা বড় বড় ঘর তৈরি করে কুলি লাইন থেকে রোগীদের স্থানান্তরিত করা হোক।

ডাক্তারসাহেবের নির্দেশ অনুযায়ী ঘর তৈরি করা হয়। একটা তুমুল হৈচৈ পড়ে বাগানে। ডাক্তারসাহেব বললেন—বসন্ত রোগের শুকিয়ে যাওয়ার সময়ই যত ভয় তাই খোসা ওঠার আগেই ওদের স্থানান্তরিত করা দরকার। বাগানের সমস্ত শ্রমিকই ভয়ে এতটুকু হয়ে যায়। তারা তাদের বাপ মা ছেলে মেয়ে ভাই বোনকে ঐরকম একটা নির্জন নিশাচরের জায়গায় যেখানে রাতে বন্য বাঘ ভালুক হাতী শুয়োরের অবাধ আমোদ আহ্লাদ চলে সেখানে পাঠাতে রাজী নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের যেতে হয় সেখানে। এই সময়ে নিতান্ত অসহায় মনে করে তারা। অন্য সময় হলে হয়ত এই জবরদস্তি তারা মেনে নিত না কখনই। নিজেদের রুগ্ন সন্তান সন্ততি ও আত্মীয়-স্বজনকে চোখের আড়ালে সরিয়ে দিয়ে ওরা যেন আরো শূন্যতার মধ্যে হারিয়ে যায়। আরো অনেক ধূপচন্দন পুড়তে থাকে। ফুল, বেলপাতা দুর্বা ঘাসেরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেউ

একটা আধটা পায় আবার কেউ পায় না। কিন্তু এই সময়ে ওদের মধ্যে অন্য একটা আত্মা কাজ করতে থাকে। ওরা যেন হিংসা দ্বেষবর্জিত পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। পুজোর সমস্ত উপকরণই ভাগাভাগি করে নেয়।

রোগীদের স্থানান্তরিত করার পর সকলেই চিন্তিত হয়ে ওঠে। কে ওদের দেখাশুনা করবে, সান্ত্বনা দেবে আর কেইবা কত সময় ঘরবাড়ি ছেড়ে গিয়ে থাকতে পারে। তারপর ম্যানেজারের হুকুম সেখানে যেন না যায় কেউ। এছাড়া হিংস্র জন্তুর ভয়। দুই চারজন অম্বরবাহাদুরের সঙ্গে পরামর্শ করতে আসে। অম্বরবাহাদুর চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলে। কোনই উপায় নির্ধারণ করতে পারে না। ওদের সঙ্গে করে বিলাসীর কাছে আসে। বিলাসী যেন আগেই সমস্ত বিষয়টা চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। বনের পশুপক্ষীর ভয়ের কথা তুলতেই সে বলে ওঠে—ভয়ের কিছু নেই সর্দার। সকলকেই বলে দেও শুকনো গাছের গুড়ি সংগ্রহ করতে। রোগীদের ঘরগুলোর খানিকটা দূরে ঐ গুড়িগুলোতে আগুন জেলে রাখবে সারারাত। এই কাজের ভার তোমার ছেলে, প্রেমপ্রকাশ ও করুণসিংএর ওপর ন্যস্ত কর।

সকলেই একবাক্যে সমর্থন করে বিলাসীকে। এরপর প্রশ্ন ওঠে রোগীদের দেখাশুনা করা ও সান্ত্বনা দেওয়া। এই প্রশ্ন উঠতেই মদনফুল বলে উঠলো—রোগীদের সেবা যত্নআত্তি করবো আমরা।

মদনফুলের কথাতে একটা অবাক নিস্তব্ধ চোখ চাওয়াচাওয়ি চলতে থাকে।

অম্বরবাহাদুর তার অবাক দুটো চোখ মেলে জিগ্যেস করে—তুমি কি বোঝ মদন? তারপর আমাদের তো সেদিকে যেতে দেবেন না ম্যানেজার।

মদনফুল বললো—আমরা বলতে আমি বুঝি, বিলাসী মাই, প্রেমপ্রকাশের স্ত্রী ও আমি। এ সম্পর্কে সে প্রেমপ্রকাশের স্ত্রীর সঙ্গে তার যে কথাবার্তা হয়েছে তাও জানিয়ে দেয়। আর এরপর যদি আর কেউ আমাদের সঙ্গে যোগ দেয়, ভাল কথা। না দেয়

তাতেও ক্ষতি নেই। আর ম্যানেজারের কাছে আজই গিয়ে তাঁর অনুমতি নিতে হবে আমাদের।

এরপর অনেকে মিলে ম্যানেজারের কাছে আসে ওরা। তাকে অনুমতি দেওয়ার কথা তুলতেই তিনি বলে ওঠেন—হোয়াট এ সিলি আইডিয়া। তোমরা কি ক্ষেপেছ? ভয়ঙ্কর ছোঁয়াচে রোগ, আমি কিছুতেই সেখানে রোগীর কাছে যেতে অনুমতি দিতে পারি নে।

মদনফুল একটু পিছনে ছিল। সে এগিয়ে গিয়ে সাহেবকে বললো—তাহলে কি করে আপনি ডাক্তার কম্পাউণ্ডারকে সেখানে যেতে অনুমতি দেবেন।

—তারা এ-জন্য রীতিমত ওষুধপত্তর ব্যবহার করবে।

মদনফুল বললো—বেশ, আমরাও তাই করবো। ডাক্তারের নিকট থেকে আমরাও ওষুধপত্তর নেব।

অনেক ভেবে চিন্তে শেষকালে অনুমতি দেন ম্যানেজার। কিন্তু ওষুধপত্তরের ওপর অনেকেরই আস্থা নেই কারণ এর কিছুদিন পুর্বে ডাক্তার যে গা ফুঁড়িয়ে ফুঁড়িয়ে ওষুধ দিয়েছিলেন তাতে কি হয়েছে? এরচেয়ে আমাদের নিজেদের মতে চলাই ভাল।

বিলাসী বললো, ওষুধ আমাদের ব্যবহার করতেই হবে কারণ তা না হলে সাহেব কিছুতেই অনুমতি দেবেন না।

মদনফুল বললো, বেশ, ঠিক আছে। আমরা ওষুধও ব্যবহার করবো আর ঐ সঙ্গে আমাদের নিজের টুকিটাকিও করবো।

এরপর অনেকেই জঙ্গলে গিয়ে কেঁটফিরি গাছের শিকড় সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। বেটে রস খায় আর খানিকটে করে শিকড় কোমরে বাঁধে। আর নিমগাছের পাতার রস করে সরিষার তেলের সঙ্গে মিশিয়ে সারা দেহে মাখে।

বিলাসী বলে, রোগীদের ঘরে ঢোকার আগে সারা গায়ে বেশ ছাই মেখে আর নাকে মুখে একটা পাতলা কানি জড়িয়ে যাবে যাতে রোগের বীজাণু টক্ করে দেহের রক্তে না ঢুকতে পারে। ঘরে ফেরার আগে ঝোরায় গিয়ে কলার খারে সিদ্ধ কাপড় জামা ধুয়ে পরিষ্কার করে আসবে। আর রোগীর গায়ে কাঁচা দুধের সঙ্গে চন্দন মিশিয়ে লেপটে দেবে। এতে যন্ত্রণার উপশম হবে।

শেষ পর্যন্ত বিলাসীর মতেই ওদের কাজ শুরু হয়। অম্বর-বাহাদুর আর বিলাসী তাদের ঘরেই থাকে। অম্বরবাহাদুরের ছেলে মেয়ে, মদনফুল, প্রেমপ্রকাশ, তার স্ত্রী ও করুণসিং রোগীদের দেখাশুনার সমস্ত ভার নেয়।

এর দু'তিন হপ্তা বাদেই আবার ফুলগাছে অনেক ফুল ফুটতে আরম্ভ করেছে, বেলগাছে কচি পাতা গজিয়েছে, আনাচি কানাচি নরম দুর্বাঘাসে ভরতি। বাগানটা শান্ত হয়েছে, রোগীরা সকলেই নিরাময় হয়ে আপন আপন ঘরে ফিরেছে। নিয়ে আসে একটা নতুন জীবনের স্বাদ, মায়া মোহ স্নেহ প্রীতি। রোগের যন্ত্রণার মধ্যেই ওরা দুরের মানুষকে অনেক নিকটে দেখতে পেয়েছে। নতুন চোখ ও মন জন্ম নিয়েছে তাদের মধ্যে।

পৃথিবীর তুলনায় মানুষ একটা পরমাণু মাত্র তাই পৃথিবীর অফুরন্ত রূপ রস গন্ধের সঙ্গে মানুষের আর কতটুকু পরিচয়। তবু মানুষের মন এক একটা পৃথিবী। কখন সে শূন্য অনন্ত আকাশে উড়ে যায় আবার কখন ডুবে যায় সমুদ্রের অতলে। এই অগণতি ওঠা নামা দিনের মধ্যে যে কতবার ঘটে তার হিসাব রাখতে পারে না মানুষ, ভুলেও যায়। জীবন মনটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় অন্য দিকে। জীবন যেন অনেক বড় আর মনটা ছোট তাই সে শিশুর মত তাকে নাচায়।

মদনফুল যে সহানুভূতিশীল মন নিয়ে তার সমস্ত অন্তর ঢেলে রুগীদের শুশ্রুষা করেছে তাতে বাগানের প্রত্যেকে প্রীত ও মুগ্ধ হয়েছে। করুণাসিংও বিস্মিত হয়েছে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্রাহ্মণের সন্তান হয়েও তাকে ঘাট মানতে হয়েছে মদনফুলের কাছে। তার দৃঢ় সংযত মনের ওপর একটা কেমন স্পর্শ অনুভব করে। কে যেন তার মধ্যে দ্রুততালে কাজ করে যাচ্ছে। রূপের পর রূপ, সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্যের অভিনব বিন্যাস। করুণাসিং যত ভাবে তত বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়। সে বুঝতে পারে না তার এই চোখ মন কোথায় ছিল আগে। মদনফুল

যেন রূপের জাহাজ। তার মনের তরঙ্গায়িত জলে ভাসছে সে। জলের সঙ্গে দোল খাচ্ছে। অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে হেসে খেলে চলছে। ঢেউকাটা জল ছিটকিয়ে জাহাজের ওপর এসে আছড়ে পড়ছে। এই সব মিলে তা থেকে একটা সঙ্গীতময় তাল ভেসে আসছে। করুণাসিংএর সমস্ত মন আকর্ষণ করে সেদিকে। হঠাৎ মনের পর্দা খুলে চোখের সামনে এসে দাঁড়ায় মদনকুল। একটা সুগন্ধময় ফুলের পরি। পাঁপড়িগুলো হাসছে। একটা কোমল সজাগ দৃষ্টি মেলে চেয়ে আছে করুণাসিংএর দিকে। সেই দৃষ্টি ও হাসি যেন তার বুকের পাঁজর ভেদ করে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে গিয়ে তার অন্য চিন্তা ভাবনাগুলোকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। একটা মেয়েকে এমনি করে কাছে পাওয়াকে সে দুর্লভ মনে করে। নিশ্চয়ই সে পারবে। তার পক্ষে বিয়ে করা অসহজ নয়। দু'জনে কামাই করলে স্বচ্ছন্দে চলে যাবে তাদের। তারপর সামাজিক কাজকর্মের ব্যাপারেও পরস্পরের প্রতি একটা সহানুভূতি আসবে। বিয়ের কথা ভাবে করুণাসিং। বিয়ে করে ওরা এক সঙ্গে এক ঘরে থাকবে। এক পথে চলবে পাশাপাশি। ভাবতে চেষ্টা করে বিয়ের পর ঘরে শুয়ে পরস্পর পরস্পরকে কি কথা বলবে। অনেক কথা খুঁজে পায়, আবার কোনটা শুধু এলোমেলো নিরর্থক চিন্তার মধ্যেই হারিয়ে যায়। নিজের মনেই হেসে ওঠে। নিশ্চয়ই আগে কথা বলতে হবে তাকে কারণ মেয়েরা বড় লাজুক। কথার জন্য ভাবতে হবে না তাকে, আবেগে অনেক কথাই আসবে যা তার জানা নেই এখনো। হঠাৎ মনটা নিদারুণ [illegible] ভরে ওঠে। মদনকুলকে পাওয়া অত সহজ নয়। সে স্বতন্ত্র ধরনের। শ্রমিক মেয়েদের মত নয়। তাদের মন কি ভালবাসা পেতে তেমন কিছু বেগ পেতে হয় না। কিছু হাঁড়িয়া, একটু সুগন্ধি তেল সাবান আর দু'একটা টাকা হলেই যথেষ্ট।

যদিও নিজের তরফ থেকে নিজেকে সে পবিত্র নিষ্পাপ বলে মনে করে তবুও নরনারীর যৌনবোধ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ নয়। এই [illegible]ক তার যে [illegible]তা তা সে লাভ করেছে শ্রমিকদের অবাধ [illegible]মেশা ও আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে। সে অনুভব করে

এর মধ্যে কেমন যেন একটা রুচি বিরুদ্ধ লজ্জাকর ব্যাপার আছে। তথাপি সে এই লজ্জার মধ্যেও একটা অস্বস্তি বোধ করে অথচ একটা দুর্দমনীয় কামনা, ঔৎসুক্য তার মনের মধ্যে অনেক কল্পনার ছবি আঁকতে থাকে। তার বিশ্বাস নরনারীর এই সম্পর্ক সব সময়ে সকলের কাছেই লজ্জা বা অপ্রীতিকর নয়। এর মধ্যেও প্রীতি ও পবিত্রতা আছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে সংশয়, ভয় ও সঙ্কোচ এসে তার দৃঢ়তাকে অনেকটা শিথিল করে দেয়।

এমনি করে পলে পলে অনেক চিন্তা ও ভাবভাবনার ওঠা নামার মধ্য দিয়ে একটা নতুন জীবন ফুটে ওঠে। চিত্তে অধৈর্য ও অসহিষ্ণুতার চটুল ঢেউ খেলতে থাকে। একঘেয়ে জীবন পেরিয়ে অনেক দূরে চলে যায় করুণাসিং। যেখানে ঘাত প্রতিঘাত নেই, শুধু শান্ত স্নিগ্ধ জলরেখা। তার মনে হয় যত কিছু অমার্জিত, বিশ্রী সবই ধ্বংস হয়ে গেছে এই নতুন শক্তির অখণ্ড প্রতাপে। যৌবনের আত্ম-প্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বের চেতনা দূরের আকাশকে অতি নিকটে এনে দিয়েছে। অনেক দৃঢ় প্রত্যয়ভরা, তর্কবিতর্কের অখণ্ডনীয় কথা মনের জলে ফেনা হয়ে কণ্ঠনালী পর্যন্ত ভেসে আসে সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যায় মদনফুলের কাছে। মনের মধ্যে অনেক শব্দ উচ্চারণ হয় কিন্তু কিছুই বাইরে প্রকাশ পায় না। এমনি করে চার পাঁচ দিন সে ফিরে এসেছে একটা বোবা লোকের মত বুকের দুঃসহ একটা বেদনা ও ভয় নিয়ে। এরপর একদিন এই বেদনা ও ভয়ের কথা চিন্তা করতেই তার পৌরুষে আঘাত লাগে। সঙ্গে সঙ্গে একটা দুর্জয় সাহস তার সমস্ত ভয়টাকে গ্রাস করে। সে মদনফুলের কাছে তার আত্মনিবেদন করে। প্রকৃত ভালবাসার ক্ষেত্রে এমনি হয়। এখানে জোর জবরদস্তি বা রূঢ়তা নেই, আছে ক্ষমা, ভিক্ষা, কারুণ্য, দাক্ষিণ্য। অনেক কথাই যা জপতপ করে এসেছে এতদিন তার প্রায় সব কথাই সে ভুলে যায় তখন। শুধু ভালবাসা নিবেদন করেই সে নির্বাক হয়ে যায়।

মদনফুল একদৃষ্টে ভাবালু চোখে মাটির দিকে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর শুষ্ক বিনম্র মুখে বললো—জানো করুণাসিং ভালবাসার মধ্যে কীট আছে। এই কীট মেরে ফেলবার শক্তি

না থাকলে মানুষ প্রকৃত ভালাবাসা উপলব্ধি করতে পারে না। সেই কীট তোমার দেহে ভালবাসার রোগের জন্ম দিয়েছে। এ বিষয়ে আমার পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে সে-কথা তোমরা সকলেই জানো। এই অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে কর্মের মধ্য দিয়ে, চোখ মন ফুটিয়ে সব দেখেশুনে, বিচার করে। তখন দেখতে পাবে ভালবাসা পবিত্র, এতে কীট নেই। সহজ সরল পথে চলে। এই পথের এক প্রান্তে দাঁড়ালে দেখতে পাবে ভালবাসা কত বড়, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এর ব্যাপ্তি। এ-কথা সত্য যে আমার এই সংক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র জীবনে যদি কারো ভালবাসি সে একমাত্র তোমাকেই। তবে এই ভালবাসা প্রথম স্তরের দৈহিক ভালবাসা নয়। এই ভালবাসা ভ্রাতৃত্ব ও সহকর্মীত্বের দাবী করে। এই ভালবাসার মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে। আমি চাই তোমার নিকট থেকে এই ভালবাসা। কর্মের একাকিত্বের মধ্য দিয়ে আমাদের যে ভালবাসার জন্ম নেবে তার মধ্যেই থাকবে আমাদের মন। দুই মন নয়, এক মন। তখন তুমি আমি এক, পৃথিবী এক, মানুষ এক। তুমি সহজ সরল পুরুষ। নারীর স্বভাব তুমি বুঝতে পারবে না। এরা সাপের মত এঁকেবেঁকে চলে, মনের মধ্যে ঢুকে কখন যে বিষ ঢেলে দেবে তা টের পাবে না তুমি। নিজেকে পৃথক করে রাখবে মেয়েদের থেকে, নরম কাদার মত মনটাকে আগুনে পুড়িয়ে লোহার মত শক্ত করবে।

মদনফুলের কথাতে করুণাসিং কেমন যেন একটা বিচ্ছেদ বেদনার তিক্ত লবণাক্ত স্বাদ অনুভব করে। সমস্ত অন্তর থেকে একটা বিক্ষুব্ধ আগুনের হলকা এসে তার সমস্ত দেহটাকে জ্বালাময় করে তোলে। একটা ঘন কালো অন্ধকার নেমে আসে। এই অন্ধকারের মধ্যে কিলবিল করছে অসংখ্য কীট। করুণাসিং একা। ওরা তাকে চারিদিক থেকে আক্রমণ করছে। একটা উচ্ছৃঙ্খল অনুভূতি জাগে অথচ নিজের মান সম্মান জীবন বাঁচিয়ে চলার মত শক্তি তার নেই।

মদনফুল বললো—রাগে দুঃখে ক্ষোভে ও অভিমানে অমন করে থেকো না করুণাসিং। তোমাকে দেখে সত্যই আমার দুঃখ

হচ্ছে। আমি জানি—তোমার মত একজন বুদ্ধিমান, কর্মঠ যুবকের পক্ষে এই সাময়িক দৈহিক ভালবাসা কিংবা উত্তেজনাকে জয় করা অসম্ভব হয়। ঠেলে ফেলে দাও এই দৈহিক কীটটা। অন্তর খুলে চেয়ে দেখ এই সাধারণ মানুষগুলোকে। কী কঠোর পরিশ্রম করে জীবনযাপন করে এরা। কী নোংরা ক্যাওটা জীবন। কী পঁচা নোংরা খাবার খায়, পোষাক পরে। চেয়ে দেখ সত্তর পঁচাত্তর বছর বয়সের বুড়োবুড়িরাও কী কঠোর পরিশ্রম করছে এক মুঠো অন্নের জন্যে। এতে দুঃখ হয় না তোমার করুণসিং? আর একটা কথা। তোমার এই কথা ঘুণাক্ষরেও কাউকে বলবো না আমি। আমি জানি—তুমি মহৎ, তুমি পবিত্র। এ তোমার সাময়িক উত্তেজনা। বয়সের একটা ঢেউ। এই ঢেউ কেটেই তোমাকে উত্তরণ হতে হবে নদী। আমি কখনই তোমাকে হীন প্রতিপন্ন করবো না কারো কাছে। তুমি অতি উঁচু তা না হলে তুমি কি ব্রাহ্মণ-সন্তান হয়ে সমাজের চিরাচরিত প্রথা, রীতিনীতি ভেঙে নতুন সমাজ গঠন করতে আসতে?

মদনফুলের এই কথাগুলো শুনে করুণসিং যেন মুহূর্তের মধ্যে সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। এক নিমিষের মধ্যে অন্ধকারের কীটগুলোকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আকাশে তারা ও চাঁদ হাসছে, বাইরে মৃদু হাওয়া। এই চাঁদ ও তারার আলোতে সে দেখতে পায় অসংখ্য কঙ্কালসার দেহ ও বিবর্ণ মুখ। চোখ ঢুকে গেছে কোটরে, ত্বক ঠেলে বেরিয়ে এসেছে নিরক্ত নীল শিরাগুলো। কানে শুনতে পায় এলোমেলো অনেক কান্না, আর্তনাদ, দীর্ঘশ্বাস আর খেদসূচক দু'চারটে ক্ষীণকণ্ঠের কথা। হঠাৎ অন্য এক উত্তেজনা এসে তার চেতনা ফিরিয়ে আনে। সে দৃঢ় ও সঙ্কল্প মনন নিয়ে একান্ত অপরাধীর মত মদনফুলের দিকে চেয়ে বলে, আমাকে ক্ষমা করো মদন।

মদনফুল এগিয়ে যায় করুণসিংএর পানে। তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে হেসে বলে, ক্ষমা কিসের ভাই? আমি যে তোমাকে ভালবাসি তা তুমি জান না।

এক সঙ্গে রোগীদের সেবাশুশ্রূষা করবার সময়ে করুণসিং মদন

ফুলের দেহের স্পর্শ অনুভব করেছে কিন্তু আজকার স্পর্শ আর সে সময়কার স্পর্শের মধ্যে যেন আকাশ পাতাল ব্যবধান। সেই স্পর্শ তার স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করেছিল আর আজকার এই স্পর্শে সেই উত্তেজনা নেই ; কেমন যেন একটা শান্ত মধুর ভাব। সে অনুভব করতে পারে কিন্তু প্রকাশ করতে পারে না। এর মধ্যে একটা বিরাটত্ব আছে, ক্ষুদ্রতা নেই। অথচ এই স্পর্শ আগের চেয়ে অনেক গাঢ় তা সে বুঝতে পারে।

এই পৃথিবীতে এক ধরনের মানুষের সঙ্গে করুণসিংএর পরিচয় আছে যারা খুবই বুদ্ধিমান, চালাক চতুর, অনেক ভাবে, অনেক বোঝে। যে কোন কথাকেই যুক্তিতর্ক দিয়ে খণ্ডন করতে পারে তারা। মদনফুলও তার কথাগুলো খণ্ডন করেছে কিন্তু তা যুক্তিতর্ক বা ধর্মের বুলি আওড়িয়ে বা ভয় দেখিয়ে নয়। তার ভাষা অন্য ধরনের। এতে আছে মানুষের প্রতি মানুষের দরদ। করুণাসিং যেন তার চোখের মণির মধ্যে সমগ্র চা-শ্রমিকের সমাজ ও জীবনের একটা মানচিত্র দেখতে পায়।

মদনফুল করুণসিংএর দিকে চেয়ে কি যেন ভাবতে ভাবতে বলে ওঠে, বীজ থেকে অঙ্কুর হতেই যদি পোকা লাগে তবে আর গাছ সতেজ ও দৃঢ় হতে পারে না। কিন্তু গাছটা বড় হলে আর কীটে কোন ক্ষতি করতে পারে না। তেমনি মানুষের জীবনেও যৌবন আসতে না আসতে যদি তাতে কীট ধরে তাহলে সেই মানুষ আর বড় হতে পারে না। তাই বলি যৌবনকে বাড়তে চাও, শক্তি সঞ্চয় করো। তারপর দেখতে পাবে ঘিয়ে জল ঢাললেও যেমন ঘি তেমনি রয়ে যাবে, জলের উপরে ভেসে উঠবে ঘি।

মদনফুল করুণ স্বরে বললো, রাগ করো না আমার ওপর। আমিও খুব ভালোবাসি তোমাকে।

এরপর সত্যই ওদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ জন্মে। পরস্পর পরস্পরকে মহৎ ভাবে, শ্রদ্ধা করে। করুণসিং ভাবে বাড়িঘর হারিয়ে, বাপ মা ভাই বোনের স্নেহ ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েও সে যা পেয়েছে তার মূল্য অনেক বেশি। আর

মদনফুল ভাবে—ভাওনাথের শূন্যতা এই করুণসিংই পূরণ করেছে।

মদনফুল আগে দু'একদিন বিলাসীকে অনুরোধ করেছে ভাওনাথের কাছে একটা চিঠি দিয়ে তার খোঁজখবর নিতে। অম্বর-বাহাদুর, করুণসিং ও প্রেমপ্রকাশও বলেছিল। এর উত্তরে বিলাসী বলে—চিঠি লেখা ঠিক হবে না কারণ চিঠি দিলেই জেল কর্তৃপক্ষ মনে করবে যে আমরাও সকলে জড়িত আছি তার সঙ্গে।

বিলাসীর কথার প্রত্যুত্তরে সকলেই বলে—সে তো আর চুরি করে জেলে যায়নি যে আমরা ভয় খাবো।

বিলাসী বলে—এ যে চুরির চেয়ে অনেক বড়। চুরি আর বিদ্রোহ এক নয়। এরপর আর চিঠি দেওয়ার কোনই প্রশ্ন ওঠে না। শুধু হাহুতাশ আর দীর্ঘশ্বাসের মধ্য দিয়েই দিন কাটে।

প্রতিদিনই স্কুল বসে সন্ধ্যায় কিন্তু ছাত্রসংখ্যা যা ছিল তাই আছে। মদনফুল মনে মনে খুব দুঃখিত হয়। আত্মপ্রত্যয়ে ফাটল লাগে। মনে করে সব কিছুই বাজে। ভালবাসা কি দরদের কোন মূল্য নাই। সব কিছু ভেঙে চুরমার করে ফেলতে ইচ্ছা হয়। মানুষের মধ্যে যেন আত্মা নেই। আত্মা মরে গেছে।

কলমকরা চা গাছগুলোর গোড়া খুলনি করে কয়েকদিন আগে সার দেওয়া হয়েছে তারপর জুৎসই বৃষ্টি পেয়ে গাছগুলো সবুজ ও সতেজ হয়ে উঠেছে। পাতি আসছে জোরতালে। পাতায় পাতায় শিষ ও বাক্য বিনিময় হচ্ছে তার সঙ্গে চলছে শ্রমিকদের আনন্দ সঙ্গীত। মদনফুল শুনতে পায় সেই সঙ্গীত। এই সঙ্গীত শোনার জন্যই মেলাতে গিয়ে উৎকর্ণ থাকে সে। তার মেঘলা মুখে ইন্দ্রধনুর ছায়া পড়ে, চোখ দুটো উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে। মনে করে পৃথিবীটা অনেক কাছে, মানুষ আরো কাছে।

ক্যাম্প থেকে নিরাময় হয়ে ঘরে ফিরে এসেও কোন রোগীই দু'হপ্তার আগে দুর্বলতা বশত ঘর ছেড়ে বাইরে যেতে পারেনি। ঘরে বসে বসে এরা মদনফুলের কথা বলেছে মা বাপ ভাইবোনদের কাছে। তাদের মনটা যেন কৃতজ্ঞতায় ভারি হয়ে উঠতো। আত্মীয়স্বজন সবাইকে জানিয়ে হালকা হতো। যে যেদিন ছুটি

পেত ক্যাম্প থেকে তাদের প্রত্যেকের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে রোগীর ঘরে আসতো, তাদের বহুদিনের অস্নাত, অশৌচ ও অরুচিকর দেহে নিমের পাতা আর কাঁচা হলুদ মাখিয়ে স্নান করিয়ে চন্দনের তিলক কেটে দিত মদনফুল। তাদের দেহ থেকে কেমন একটা পবিত্র পুজো পুজো গন্ধ আসতো ভেসে। ওরা নাক টেনে শুকতো আর নিষ্পলক নির্বাক চোখ মেলে মদনফুলের দিকে চেয়ে থাকতো। এই সঙ্গে আর একটা অনুভূতি জাগতো। তাদের সামনে ভেসে উঠতো অনেক বিয়ে বাড়ির ছবি—হলুদ ছোপানো বরকনে, মানুষের হৈ হল্লা। এদের মধ্যে অনেকেই তাদের অতীত জীবনের সেই অম্লান স্বাদ গ্রহণ করতো।

পনর ষোল দিন বাদে দু'একজন মেয়ে-পুরুষ আসতে শুরু করে মদনফুলের কাছে। এদের মুখময় বসন্তের দাগ। নিজেদের চেহারায় নিজেরাই লজ্জা পেত তারা। মুখটা যেন আগের মুখ নেই। টকটকে সিঁদুরে আমের গায়ে যেন পোকার কালো কালো দাগ ও গর্ত। অনেকে এইজন্য দুঃখ প্রকাশ করে মদনের কাছে। আবার পরক্ষণেই তৃপ্তকণ্ঠে বলে ওঠে—যাক গে এতে আর কি হয়েছে, বাপ মা ভাইবোন ছেলে মেয়েকে তো পেয়েছি। কি করবো রূপ দিয়ে, রূপের কাজ তো অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু যাদের বিয়ে হয়নি তাদের দুঃখটা যেন অনেক বেশি, মনকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছুই খুঁজে পায় না তারা।

মদনফুল বলে—দুঃখ করো না তোমরা, এই দাগ থাকবে না। একটু মাখন মাখবে সকাল সন্ধ্যায়। ডাব পেলে ভাল হতো কিন্তু এই পোড়া দেশে তো ডাব পাবে না তাই মাখন মাখতে হবে। হাঁ, আর একটা কথা মনে পড়েছে—শঙ্খভস্ম মাখলে দাগ উঠে যায়।

বিলাসী কাছেই ছিল। সে মদনফুলের কথা শুনে বললে—এখানে শঙ্খভস্ম কোথায় পাবে?

মদনফুল বললে—কেন, সাঁতালি-বস্তিতে জলা আছে, সেখান থেকেই কিছু শামুক ঝিনুক কুড়িয়ে নিয়ে এসে আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে নিলেই হবে।

বিলাসী দোমনা সংশয়ের সুরে বললো—শঙ্খভস্ম বলতে বোধ

হয় এই শামুক ঝিনুককে বোঝায় না। আমার মনে হয় সমুদ্রের শঙ্খ ছাড়া শঙ্খভস্ম তৈরি করা যায় না। তবে আর একটা জিনিস আছে যার প্রচলন ছোটবেলায় দেশে দেখেছি।

সকলেই বিলাসীর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। সে বললো—মুসুরীর ডাল ভিজিয়ে রেখে তা বেটে নিয়ে কাদা কাদা করে রোজ মুখে মাখলে দাগ উঠে যায়।

সকলেরই চোখে মুখে একটা আশার আলো ফুটে ওঠে। একটুক্ষণ বাদেই প্রশ্ন ওঠে খরচের।

মদনফুল বললো—এজন্য তোমাদের ভাবতে হবে না। আমি ব্যবস্থা করবো।

এরপর মদনফুল বিলাসী ও অম্বরবাহাদুরের সঙ্গে এই বিষয়ের আলাপ আলোচনা করে। তার ইচ্ছা স্কুলের ফাণ্ডের টাকা থেকে মাখন আর মুসুরীর ডাল দেওয়া হয় এদের।

বিলাসী ও অম্বরবাহাদুর উভয়েই আপত্তি উত্থাপন করে। অম্বরবাহাদুর বলে—ভাওনাথ ফিরে না আসা পর্যন্ত স্কুল ফাণ্ডের একটি পয়সাও আমাদের খরচ করা উচিত হবে না। এই ফাণ্ডের সঞ্চিত অর্থ আরো কোন বৃহত্তর কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য আছে আমাদের। মুখের দাগ, জীবন মরণের সমস্যা নয়।

বিলাসীও অম্বরবাহাদুরের কথায় সায় দেয়।

তিনজনেই নীরব থাকে খানিকক্ষণ। তারপর অম্বরবাহাদুর বললো—আচ্ছা ঠিক আছে মদন। এই মাখন আর মুসুরী ডালের দাম না হয় আমি নিজে দেব।

বিলাসী যেন এই কথার জন্য আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে—তুমি অর্ধেক দিও আর বাকি অর্ধেক আমি দেব।

এরপর থেকে অনেকেই অম্বরবাহাদুর, বিলাসী, মদনফুল ও করুণসিংএর কাছে আসে। এদের সঙ্গে কোলার ছেলেও আসে। কেউ কেউ কথা বলতে বলতে স্কুলে ঢোকে, এক দণ্ড বসে সেখানে। অনেক ভুলে যাওয়া বিষয় যা স্বপ্নের অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছিল আবার মুর্ত হয়ে ওঠে তা। এখানে যেন অনেক চিন্তা, বুদ্ধি লুকানো আছে। কোলার ছেলে বুধিরও এই রোগে ধরে। বা

শোনে বুঝতে চেষ্টা করে কিন্তু বুঝতে পারে না সব। একান্ত বোবা বোকার মত থাকে স্কুলে কিন্তু অনেক কিছু প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা, দ্বন্দ্ব মনের স্লেটে লিখে নিয়ে যায়। বাড়ি গিয়ে কোলাকে প্রশ্নের পরপ্রশ্ন জিগ্যেস করে।

কোলা বলে—ওসব কিছুই বুঝিনে আমি বুধি।

বুধি নিতান্ত আবদারের সুরেই বলে—আমাকে ভর্তি করে দাও না স্কুলে।

আজ যেন কোলা হঠাৎ অন্য মানুষ বনে যায়। কি একটু ভেবে বলে—সত্যি, মুর্খতা মানুষকে বড় করে না। বেঁচে থাকতে হলে বিদ্যাবুদ্ধির প্রয়োজন। এই দেখ না, এই রোগের শুরু থেকে এই পর্যন্ত যে সমস্ত টুকিটাকির সন্ধান দিয়েছে সর্দার, বিলাসী, মদনফুল ও করুণসিং তা কিন্তু আমাদের কারো জানা ছিল না অথচ জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এ-সব জানা থাকা দরকার। তুই কি ভাওনাথের মত হতে পারবি ?

—কেন পারবো না ? তুমি জানো না বাবা ওখানে গেলেই মগজ খুলে যায়। চিন্তা আসে। আর সেই চিন্তার মধ্য দিয়ে অনেক অজ্ঞাত জিনিসের সন্ধান মেলে।

এর পর বুধি আনন্দ আতিশয্যে কোলার কাথাগুলো বাগানের ঘরে ঘরে ছড়িয়ে দেয়। পরদিনই দেখতে পাওয়া যায় কোলা বুধিকে সঙ্গে নিয়ে স্কুলে গিয়েছে।

অম্বরবাহাদুর, বিলাসী, করুণসিংএর মনে হয় এর মধ্যে একটা কিছু দুর্বোধ্যতা আছে। হয়ত আবার কোন একটা মতলব ছেঁদেছে মনে মনে। বিলাসী বললো, এতে আমাদের কিছু এসে যায় না। কিন্তু এর দুদিন বাদেই ওরা বুঝতে পারে যে ওদের জল্পনা কল্পনা সবই মিথ্যা। কোলা নিজেই অনেককে স্কুলের উপকারিতা সম্বন্ধে বলেছে। এর ফলে এক সপ্তাহের মধ্যেই স্কুল আবার ছাত্র ছাত্রীদের কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে।

কোলা মাঝে মাঝে স্কুলে আসে। অম্বরবাহাদুর ও বিলাসীর সঙ্গে স্কুল সম্বন্ধে আলোচনা করে। হঠাৎ কি খেয়াল হয় একদিন স্কুলের ফাণ্ডে বিশ টাকা চাঁদা দিয়ে বসে। তার দুদিন বাদে আবার

নিয়ে আসে অনেক পুরি মেঠাই চা। সকলেই অবাক হয় এতে। অম্বরবাহাদুর বলে, স্কুল ঘরে এ-সব খাওয়া দাওয়া আমোদপ্রমোদ চললে পড়াশুনার ক্ষতি হবে।

কোলা বলে, এতো শুধু একদিনের একটা ঘণ্টার ব্যাপার। আনন্দ করবারই ব্যাপার বটে। গর্বেরও। এই যে ছেলে মেয়েগুলো সেরে উঠেছে কাদের জন্য, এই স্কুলের পড়ুয়াদের জন্য, বিশেষ করে মদনফুল আর করুণসিংএর জন্য। বিস্তর সম্মান দিতে হবে, আনন্দ করতে হবে।

কোলার এই রকম মেলামেশা ও অন্তরঙ্গতা করুণসিংএর ভাল লাগে না। কারণ সে ভাল করেই জানে অম্বরবাহাদুর ও ভাওনাথকে নাজেহাল করতে কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি সে। তাকে তার বাপ মা ভাইবোন থেকে বিচ্ছিন্নতার মূলে এই কোলা। কেউটে সাপ ঢুকলো কখন যে বিষ ঢেলে দেয় তার ঠিকানা নেই। এ কথা সে বিলাসী অম্বরবাহাদুর ও মদনফুলকে বলে।

করুণসিংএর কথা ওদের মনে দাগ কাটে কিন্তু ওরা জানে মানুষের মনের রঙ বদল হয়। এর দৃষ্টান্ত ওরা নিজেরাই। এ ছাড়া মন্তরের বিষয় ভাবলেও ওরা দেখতে পায় মানুষের পরিবর্তন অনিবার্য। এ জিনিস যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝানো যায় না, চিন্তা করে উপলব্ধি করতে হয়। সব মানুষেরই সব ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন হবে তা নয়। তবে পরিবর্তন ঠিকই হয়, হয়ত তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। এখানেই আমাদের পরীক্ষা।

সুখের দিনগুলো দ্রুততর গতিতে কেটে যায়। রাতের অন্ধকার, ভয় থাকে না, সুনিদ্রা হয়। ভোর হলেই সূর্য ওঠে অভিনব ছন্দে, তালে। দিনের আলোময় সুর ওদের জীবনে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যতা ও সমন্বয়ের আলো এনে দেয়। কেটে যায় ছয় মাস। পদমমায়া জেল থেকে ফিরে আসে।

পদমমায়াকে দেখলে কে বলবে এই সেই অন্ধকারের তিক্ত বিবর্ণ কীট, এর মনোবিকার হয়েছিল কোনদিন। মনোবিকার তার ঘটেনি। সে সজ্ঞানই ছিল। হয়ত সে অন্ধকারে ছিল,

কালো কালিঝুলিমাখা বিষ তাকে জরজর করেছিল কিন্তু আজ সে অন্ধকারে নেই। সমস্ত অন্ধকার ভেদ করে তার স্বরূপ ফুটে উঠেছে। চোখ দুটোতে অনেক আলো জ্বলছে তার। শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সে। তৃপ্ত মন, ঠাণ্ডা দেহ। অথচ উৎসাহের অভাব নেই, কর্মবিমুখও নয় বরং কর্মপ্রবণতা ও উৎসাহ আরো অনেক বেড়েছে।

জেল থেকে আসার পর পদমমায়ার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সন্ধ্যার আগে ডাক আসার সময় হলেই সে যেন কেমন অস্বস্তি বোধ করে। খবরের কাগজ হাতে পেলেই অস্বস্তি কেটে যায়। নিবিষ্ট মনে দেশ বিদেশের সমস্ত খবরগুলো পাঠ করে। তার মুখের হাবভাব দেখে সকলেই বুঝতে পারে সে আজ শুধু দলমান-নগরের শ্রমিকদের নয়। তার চোখে যেন বিশ্বের মানচিত্র। বিশ্বের সকলের খবরই জানতে চায় সে।

অনেকেই তাকে জেলের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জিগ্যেস করে। সে বলে, জেলের জীবন যাপনের তিক্ত অভিজ্ঞতা খুবই কম হয়েছে তার। কারণ জেলের মধ্যে সে দুইজন স্ত্রীলোক পেয়েছিল যাঁদের জন্য আসার সময় তাকে কাঁদতে হয়েছিল। তাঁদের কথা জীবন থাকতে ভুলতে পারবে না সে। জেল জীবনের প্রথম পাঁচ দিন যদিও সে নৈরাশ্য ও বেদনার মধ্যে কাটিয়েছিল কিন্তু সেই সঙ্গে তৃপ্তিও কম পায়নি। সেই সুখের কাছে ঐ নৈরাশ্য ও বেদনা যেন নাম গোত্রহীন। সাহেবের কুঠীর কাঁচ ভেঙে সে যে সাহস অর্জন করেছিল তাতে তার জীবনের অনেক সংশয়, দ্বন্দ্ব ও ভয় কেটে যায়। ঐ সঙ্গে ক্রোধও উপশমিত হয়। কারণ তার মনে হয় এতে সাহেববাবুরা বুঝতে পেরেছে যে আমরাও তাদের মত মানুষ, আমাদেরও প্রতিবাদ করবার মত যথেষ্ট শক্তি আছে। ঐ সময়ে তাকে কায়িক কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। অবশ্য এতে সে একটুও পিছু পা হয়নি কারণ ঐ আনন্দই তাকে উৎসাহ ও শক্তি দিয়েছে। আর থাকা খাওয়ার দুঃখ, তাও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়। আমরা এমনিতেই বা কিভাবে থাকি আর খাই। তবে রাত্রের নিসঙ্গতা বড় কষ্টদায়ক ছিল। মনে হতো

যেন একটা বিরাট হিংস্রুটে কিছু তাকে খামচে খেত। শোক, দুঃখ, বেদনা বিচ্ছেদ। এই যন্ত্রণাও শুধু পাঁচ দিনের জন্য। এই সময়ে একজন বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা আসেন জেলে। হাসি হাসি বিদ্যা বুদ্ধি উজ্জ্বল চোখ মুখ। প্রথমটায় তাকে মোটেই ভাল লাগেনি মদনকুলের। একটা জাতক্রোধ আসে। তার হাসি ওকে তিক্ত বিরক্ত করে তুলতো। মনে পড়তো বাগানের বাবু বাবুয়ানীদের কথা। কী অত্যাচার অবিচার করে ওরা শ্রমিকদের ওপর। হঠাৎ মনে পড়ে ভাওনাথের কথা। তার কাছে শুনেছে সে নিরঞ্জনবাবু ও তাঁর স্ত্রীর কথা। তাঁদের ছিল দরদী মন। তাঁদের কাছে নাকি উঁচু নিচুর প্রভেদ ছিল না তবে সমাজ শাসনের ভয়ে মনটাকে মাঝে মাঝে চেপে রাখতে হতো। তবু তাঁরা মানুষকে মানুষ ভেবে দরদ দিয়ে দেখতেন এবং তাদের মানুষের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। হঠাৎ একদিন মেয়েটা বললে—আমাকে অত সঙ্কোচবোধ কর কেন দিদি। আমি তোমাদের থেকে পৃথক নই, তুমি আমি দুইজনই মানুষ। জেলের মানুষ। আমরা সমস্ত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারি তবু আমরা মানুষ। মানুষের প্রতি মানুষের দরদ না থাকলে তুমি যেখানেই থাকো না কেন শান্তি পাবে না। আমরা এখন জেলের মানুষ, এই বন্দীশালাতেই আমাদের নতুন সমাজজীবন গড়ে তুলতে হবে। এরপর আস্তে আস্তে তার প্রতি একটা আসক্তি ও নির্ভরতা জন্মে পদমমায়ার। তার নিকটে অনেক শিখেছে, অনেক পেয়েছে জীবনে যা কারো কাছে পায়নি সে। বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হলে কি হবে অনেক জানে মেয়েটা, অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। স্কুল কলেজের সব পড়া শেষ করেছে সে। বলতো—স্কুল কলেজের পড়াই সব নয় জীবনে দিদি। নিজের মন গড়াই সব চেয়ে বড়।

যদিও মেয়েটি আমাদের ঘরেই ছিল তবু জেল কর্তৃপক্ষ তার সঙ্গে স্বতন্ত্র ব্যবহার করতেন। তার খাওয়াদাওয়া সুখ স্বাচ্ছন্দ্যতার দিকে তাঁরা বেশ মনযোগ দিতেন। মেয়েটি বিয়েথা করেনি। হয়ত করবেও না কোনদিন। পড়াশুনা শেষ করেই দেশের কাজে নেমেছিল। দেশমাতৃকার সেবা করে সে যে আনন্দ পেয়েছিল

সেই আনন্দই তাকে দৈহিক সমস্ত রকম কষ্ট সহ্য করবার শক্তি দিয়েছিল। মেয়েটির নাম চিরন্তনী। বাংলা, ইংরাজী ও বাংলা মিশ্রিত কাটাছেঁড়া হিন্দি ছাড়া অন্য কোন ভাষা জানতো না সে। ইংরাজী, বাংলা অনেক কাগজ, বই দিতেন জেল কর্তৃপক্ষ তাকে। তার কাছেই পদমমায়া বাংলা ও ইংরাজী হরফ লিখতে ও পড়তে শেখে। এর আগে বাংলা বা ইংরাজী হরফের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। সাহেবের সঙ্গে থাকতে থাকতে দু'চারটে ইংরাজী কথা বুঝতে ও বলতে পারতো মাত্র। এই বাংলা ও ইংরাজী শিক্ষার বিনিময়ে সে তাকে শিখিয়ে দেয় নেপালী ভাষা। সে জানতে পারেনি এই শিক্ষার বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনেরও বিনিময় হয়ে গেছে কখন। রাত্রি আর তখন দুঃসহ বোঝা হয়ে বুকটা চেপে ধরতো না। অনেক সুখ দুঃখের বিনিময় হতো তাদের মধ্যে। এর মাঝে মাঝে সে পদমমায়ার চোখের সামনে ধরতো অনেক ছবি। বেশ গম্ভীর অথচ শান্ত-বেদনা মিশ্রিত স্বরে বলতো—জানো দিদি, মানুষ কত বড়। এই মানুষই তাড়িয়েছে বাঘ ভালুক, তারাই এই দুর্গম পাহাড়-জঙ্গল কেটে রাস্তা তৈরি করেছে, শূন্য থেকে সূর্যকে নিয়ে এসেছে একটা বাস্তব জগতে, রাস্তার ধারে ধারে ঘরে ঘরে বসিয়েছে তাকে। আমরাও সেই মানুষ জাতের এক একজন। কিন্তু আমরা কত ছোট।

সত্যি বলছি বলে পদমমায়া—আমার নীচু মাথাটা উঁচিয়ে উঠতো তার কথা শুনে। মনে হতো মানুষ সব করতে পারে। আমিও তাদের মত একজন। এই দেয়াল, অন্ধকার, ভয় সব ভেঙে-চুরে চুরমার করে দেই।

এমনি করে দিনের পর দিন রাতের পর রাত সে তার মনের পর্দায় আঘাত করে করে মনটাকে লোহার মত শক্ত শক্তিশালী করে তোলে। মনটা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। চোখ দু'টোও। একদিকে দরদ আর অন্যদিকে নির্মমতা।

ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়েই সুখের লগ্ন আসে। চারিদিক থেকে আলো ঝলসে পড়ে। দেহ ও মন সুষমাময় হয়ে ওঠে।

এরমধ্যে একদিন জেলারের বাড়িতে রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কুলির

কাজ করতে যাই। ঘরের জিনিসপত্তরগুলো একপাশে সরিয়ে কাজ শুরু হয়। ঘরের কাজ শেষ হলে ঘর পরিষ্কার করার ভার পড়ে পদমমায়ার ওপর। তাকে শুধু ঘরটা পরিষ্কার করতেই বলেছিলেন জেলারের স্ত্রী কিন্তু পদমমায়া ঘরটা ধুয়ে মুছে ঝাড়ু দিয়ে সমস্ত জিনিসগুলো এমন রুচিসম্মতভাবে সাজিয়ে দেয় যে তা জেলারগৃহিণীর মন আকর্ষণ করে। তিনি তখনই বলে দেন আবার পরের দিন যেতে। এরপর অনেক কথা হয় তাঁর সঙ্গে। তার কথাগুলো মন ও দরদ দিয়ে শুনেছিলেন তিনি। একটা বেদনার ছায়াও ফুটে ওঠে তাঁর চোখে মুখে। তারপর জেলারকে বলে পদমমায়াকে তাঁদের বাড়িতে কাজকর্ম করার জন্য নিযুক্ত করেন।

সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পদমমায়া জেলারের বাড়িতেই কাজ করতো। খাওয়াদাওয়াও সেখানেই চলতো। দেহটা যেন আবার সুখের স্বাদ পায়। ছয় মাসে চারখানি শাড়ি, চারটে ব্লাউজও দিয়েছিলেন। এই শাড়ি ব্লাউজ ক'টাকে অতি যত্নের সঙ্গে সে তার সঙ্গে এনেছে। এই শাড়ি ব্লাউজের মধ্যে যেন অনেক স্নেহ-প্রীতি ভালবাসা ও দরদ মাখানো আছে।

তাই ছয় মাস পরে যখন পদমমায়া ফিরে আসে জেল থেকে তখন তাকে কাঁদতে হয়েছিল এই দুটি মানুষের জন্য। শুধু সেই কেঁদে আসেনি কাঁদিয়েও এসেছে ওদের। নীরব নিষ্পলক দৃষ্টি মেলে পদমমায়া যেন তাঁদের চোখের জল দেখছে।

অল্পক্ষণ চুপ থেকে আবার বললো—সে যা দেখেছে তাতে তার বিশ্বাস যে বাগানের মানুষের সঙ্গে জেলের মানুষের কোন সাদৃশ্য নেই। আকারে দুইই এক তবে মনে পৃথক। জেলের বন্দীদের প্রত্যেকের বেদনা এক তাই তাদের মনও এক। একের ওপর অপরের দরদ আছে।

দুই

সাধু মারা যাওয়ার পর এক সপ্তাহ কেটে যায়, বিনা আহার নিদ্রা, নানা চিন্তা শোক দুঃখ বেদনা ও শূন্যতার মধ্য দিয়ে। এখানে দয়া মায়া দাক্ষিণ্য বলতে কিছুই নেই। কাজ করে যায় ভাওনাথ। ঘোলাটে চোখে দিনের আলো নিভে যায়। সন্ধ্যা হলে অন্ধকারে কালি-ঝুলি-বালি-মাখা রাস্তার ওপর মরা সাপের মত কুঁচড়ে মুচড়ে শুয়ে থাকে। মনেপড়ে সাধুর সেই মৃত্যুহীন মুখখানা, কালো খাঁড়া খাঁড়া সজাগ চুল। চুল নয় এক একটা বল্লম। দেখতে পায় চোখের কোণের কালি-রেখা। নিষ্প্রাণ চোখ দুটো তাকে পেরিয়ে চলে গেছে কোন সুদুর দুরান্তে যেখানে ভাওনাথের দৃষ্টি যায় না। কোথায় কখন সাধুকে নিয়ে গেছে জেলকতৃপক্ষের লোকগুলো তা তার জানা নেই। কোথায় রেখেছে সাধুকে অথবা কবর দিয়েছে, ঝোরার জলে ভাসিয়ে দিয়েছে কিম্বা শেয়াল শকুনের মুখে তুলে দিয়েছে। না, সাধু মরেনি, মরতে পারেনা সে। মৃত্যুহীন জীবন তার। এই তো সে তাকে দেখতে পাচ্ছে। চেয়ে আছে সে দুর দুরান্ত পথের দিকে। দেখতে পায় দিগন্তব্যাপি বালুময় মরুভূমি। জনমানবহীন মরুভুমি। নদী নেই গাছ নেই। ধু ধু করছে বালির মাঠ। এই বালুময় মরুভুমির বুকে দাঁড়িয়ে কঠোর বাস্তবের সঙ্গে লড়াই করছে ভাওনাথ। হঠাৎ শুনতে পায় জলের কল্লোল। সমস্ত নৈশ নিস্তব্ধতা আর বালুর মাঠ ভেঙে খান্ খান্ করে ছুটে আসছে পাগলাঝোরা। তার বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সমস্ত পাহাড় পর্বত বনজঙ্গল নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে। তার দু'ধারের পাহাড়ের গাছগুলোর কম্পিত ছায়া পড়েছে জলে। চোখ মেলতে চেষ্টা করে ভাওনাথ। চোখ মেলতে পারেনা। কোথায় যেন হারিয়ে গেছে সে। তার মনে হয় ভাওনাথ নেই। মৃত্যু এসেছে তার অসংখ্য বড় বড় কালো শয়তানী চোখ মেলে। মানুষের ক্ষমতা কতটুকু।

মৃত্যু অপরাজেয়। মানুষ বেঁচে থাকে মৃত্যুর জন্য, মৃত্যুও আছে মানুষের জন্য। এই মানুষ আর মৃত্যুর মধ্যে আছে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

এর কয়েকদিন বাদে জেলকর্তৃপক্ষ একজন লামাকে এনে ভাওনাথের ঘরে ঢোকায়। এতে খুব বিরক্ত হয় সে। আগে যে কোন মানুষকেই দেখতে পেলে ভাওনাথ যতটা প্রীত হতো আজকাল তার চেয়ে অনেক বেশি বিরক্তি বোধ করে। তার মনে হয়, এই লামা এসে এবারে তার নিসঙ্গ একনিষ্ঠ জীবনটাকে হারিয়ে দেবে। নির্জনতা সে ভালবাসে। তার সমস্ত অন্তর দিয়ে ভাবতে চায় সাধুর কথাগুলো। লোকটাকে দেখে সে বিস্মিত হয়। সাধু সন্ন্যাসীর বেশ অথচ জেলে! হঠাৎ সাধুর কথা মনে পড়ে, হয়ত সাধুরই মত একজন ছদ্মবেশী হবে। না, সাধুর মত সত্যিই কেউ সাধু হতে পারে না। তবে লোকটা যে ছদ্মবেশী এতে কোন সংশয় নেই। হয়ত সাধুর বেশে চোর ডাকাত হবে। অতর্কিত ভাবে ভ্রু কোঁচকে ঘৃণাভরে নেপালী ভাষায় প্রশ্ন করে বসে ভাওনাথ, চুরি করেছিলে বুঝি?

লোকটা হয়ত ভাওনাথকেও মনে মনে চোর বলে ভেবেছিল। এটা স্বাভাবিক। কারণ যে যেরকম লোক সে মানুষকে তার সেই চোখেই দেখতে পায়।

লোকটা ভাওনাথের কথায় হেসে উঠে নেপালী ভাষায়ই উত্তর দেয়। চোরই বটে, চুরি করতেই গিয়েছিলাম কিন্তু কিছুই আনতে পারি নেই।

ভাওনাথ নিজের মনে বিড়বিড় করে বলে, যত চোরের আড্ডা এই পৃথিবীতে। যে যেদিক দিয়ে পারে চুরি করে। চারিদিকে চোর আর চোর। এই চোরের হাত থেকে রেহাই নেই কারো।

ভাওনাথের কথাগুলো কিছুই বুঝতে পারে না লোকটা। তবে সে যে আরো বিরক্ত হয়েছে এবং তার কথা বিশ্বাস করেছে তা টের পায় ভাওনাথের চোখমুখের চেহারা দেখে।

এবারে ভাওনাথ একটু জোরেই বলে, সাধুকে চুরি করেছে একজন। কিছুই যখন পাওনি আমাকেই চুরি কর তবে।

লোকটি ভাওনাথের কথাশুনে তারদিকে এগিয়ে গিয়ে মাথায় হাত দিয়ে হেসে বললো, তোমাকে চুরি করতে পারলে তো ভালোই হয় ভাই কিন্তু তা কি পারবো। তুমি যে সাধু আর আমি চোর। সাধুর শক্তি চোরের চেয়ে অনেক বেশি। সে চোরকে হজম করতে পারে কিন্তু চোর পারে না।

এরপর থেকে ভাওনাথ প্রতিদিনই দেখতে পায় যে লোকটা সকাল, সন্ধ্যা ও রাতে নিবিষ্ট মনে বসে চোখ বুজে মালা জপ করে আর মালা জপ শেষ হলে ধর্মগ্রন্থ নিয়ে বসে। কথা কম বলে। নিজের মনেই ঠোঁট নেড়ে অস্পষ্ট ভাষায় কি সব বলতে থাকে।

এতে ভাওনাথের মন আরো বিষাক্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলে, যত সব ভণ্ডামী আর কি। ভেবেছে এই দেখে জেলকর্তৃপক্ষ ওকে সাধু ভেবে খালাস দেবে। কিন্তু সেটি হবার জো নেই যাদু। জেল বড় কঠিন। এ মৃত্যুর চেয়েও কঠোর।

লোকটা আশ্চর্য বটে। কোন তাতেই কান দেয় না। তার তিব্বতীয় আলখেল্লার মধ্যে অনেকগুলো কেতাব পুরাণ। নিত্যি নতুন এক একটা বের করে পাঠ করে আপন মনে।

এর মধ্যে হঠাৎ একদিন কম্প দিয়ে জ্বর আসে ভাওনাথের। অনাবৃত দেহ হাড়ভাঙা শীতে থর থর করে কাঁপতে থাকে। লোকটা তখন মালা জপ করছিল। হঠাৎ ভাওনাথকে ঐরকম অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার নিজের কম্বলটা নিয়ে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে বুকে পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। ভাওনাথের তখন তেমন হুঁস ছিল না। ঘণ্টা পাঁচেক বাদে জ্বর ছেড়ে যায়। তখন রাত দুটোর ঘণ্টা বাজে। ভাওনাথ চোখ মেলে চেয়ে দেখে লোকটা তাকে জড়িয়ে শুয়ে বিড় বিড় করে কি সব বলছে।

ভাওনাথ উঠে বসে। সঙ্গে সঙ্গে লোকটাও। ভাওনাথ অবাক দুটো চোখ মেলে লোকটার পানে চেয়ে থাকে খানিকক্ষণ। তারপর বললো, সত্যিই তুমি চোর। তুমি আমার সব চুরি করে নিয়েছ।

লোকটা একটা প্রাণখোলা হাসি দিয়ে বললো—চোর তো নিশ্চয়ই। তুমি চোর বলেই তোমাকে চুরি করা সহজ হয়েছে।

সাধু হলে কিন্তু পারতাম না। জানো তো চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

এরপর থেকে লোকটার প্রতি আকৃষ্ট হয় ভাওনাথ। তার আগের বিশ্বাসে ফাটল লাগে। সে বুঝতে পেরেছে যে লোকটা নিশ্চয়ই চোর নয় হয়ত সাধুর মতই একজন হবে। তবে সাধুর স্পর্শ আর এই লোকটার স্পর্শ ভিন্ন ধরনের। কথাগুলো ও। সাধুর স্পর্শ ও কথার মধ্যে একটা রোমাঞ্চকর কিছু ছিল—আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে উঠতো আবার পরক্ষণেই নিভে যেত কিন্তু আগুন ছাইয়ের মধ্যে অল্প একটু আধটু রয়েই যেত। আর এই লোকটার স্পর্শে ও কথায় শুধু ঠাণ্ডা বরফজলের জলপটি। দেহের ও মনের সমস্ত আগুন নিভিয়ে দেয় অথচ মনটা চলতে থাকে উর্ধ্বে উর্ধ্বে অতি উর্ধ্বে অথবা অন্য কোথাও। সেখানকার খোঁজ ভাওনাথ জানে না। জানবার অবসর হয়নি, জানতে চেষ্টাও করেনি। অথচ সে অনুভব করতে পারে সেখানকার সেই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ।

লোকটা ত্যর তির্বতীয় ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে শোনায়, তার ব্যাখা করে নেপালী ভাষায় বুঝিয়ে দেয় তাকে। অহিংসার বাণী প্রচার করে। এতে লোকটার প্রতি আরো আকৃষ্ট হয় ভাওনাথ। তবে তার মতের সঙ্গে ভাওনাথের মতভেদ আছে। লোকটা যাকে হিংসা বলে ভাওনাথ তা বলে না। তার মনে হয় লোকটার বাণী আগের দিনের পক্ষে প্রযোজ্য ছিল, আজকার দিনে এই বাণীর কোনই মূল্য নেই। কারণ যুগে যুগে মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে অন্য সুরে অন্য ভাবধারা নিয়ে। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাণীরও অদলবদল হওয়া চাই।

এরপর ওদের কথার মাধ্যমে পরস্পর পরস্পরের স্বরূপ জানতে পারে। লোকটা বৌদ্ধ ভিক্ষু। অহিংসার বাণী এবং নির্বাণই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য প্রচার করাই তার কাজ। তাই সে বুদ্ধের বাণীপ্রাচারক হিসাবে সুদূর তির্বত থেকে অনেক পাহাড় পর্বত নদী ঝোরা বনজঙ্গল পার হয়ে এই দেশে আসে। অনেক জায়গা, অনেক চা বাগান ঘুরে শেষে সে তেরাই অঞ্চলে সুরংভ্যালি

চা বাগানে এসে একটা বৌদ্ধমন্দির প্রতিষ্ঠা করে। এই সময়ে ভুটান পাহাড় থেকে নেমে আসতো একদল ভুটিয়া। দিনের বেলায় তারা ভুটানের কুচি কুচি পাথর, রঙ বেরঙয়ের মালা, কস্তুরী, হরিণের সিং, বন্য গরুর চামর, পশুর রোমের কম্বল, আসন, জাফরণ আরো অনেক কিছু বিক্রি করে বেড়াতো তারপর রাত্র হলে সুযোগ মত বাগানের শ্রমিকদের ঘরে হানা দিয়ে লুটতরাজ করতো। এতে বাগানের ম্যানেজার সাহেব ও আর আর সকলে এই বৌদ্ধ ভিক্ষুকে সন্দেহ করে এবং পুলিশে ধরিয়ে দেয়। লোকটা ভাওনাথকেও একজন শ্রমিককর্মী বলে জানতে পারে।

বৌদ্ধ ভিক্ষু মালা জপতে জপতে এক ফাঁকে বলে—আত্মাকে চিন্তার কেন্দ্রীভূত করে মনটাকে অপরাজেয়, শক্তিশালী করে তোলো। হিংসা, পাপ ও হিংস্রতা দুর করো। দুর্বৃত্ত শত্রু ও অত্যাচারীদের জন্যই তোমাকে অহিংস হতে হবে। ওদের মনের দুয়ার খুলে প্রবেশ করে তোমার চিন্তা ওদের মধ্যে ঢুকিয়ে দাও। তবেই তো দেশের বড় কাজ করা হবে। সামান্য ছোট একটা জিনিসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত থেকে সামগ্রীকতাকে ভুলে যেও না।

ভাওনাথ বললো—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কাকে হিংসা, পাপ বা হিংস্রতা বলো। তবে তুমি কি বলতে চাও যে মানুষকে শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ করে গড়ে তোলা, তাদের মানবীয়তা ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলাকে হিংসা, পাপ হিংস্রতা বলে। অথচ আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষই অত্যাচার, হত্যা করছে মানুষকে নানাভাবে। গড়ে তুলছে বিরূপতা, ব্যবধান, শিক্ষা দিচ্ছে পরস্পরকে ঘৃণা করতে। জীবনে আমরা যারা চুরি করিনি, কাউকে হত্যা করিনি, কারো রক্ত চুষে খাইনি তারাই দোষী, তারাই হিংসুটে, তারাই পাপী অথচ যারা এ-সব করেছে, এর উপরেও যদি কিছু থাকে তাও করেছে তবু তারা নির্দোষ, নিষ্পাপ। আমরা লড়াই করছি মানুষ যাতে মানুষকে শোষণ নির্যাতন ও ঠকাতে না পারে।

ভিক্ষু বললো—এই জন্যেই তো তোমাকে আগেই বলেছি যে শত্রুকে সৎপথে চালিত করতে তোমাকে অহিংসার বাণী প্রচার

করো। ভেবে দেখ তোমরা যে লড়াই করছ তা কতটুকু আর এর পরিণামই বা কি। এই যে পৃথিবীব্যাপি এত বড় একটা যুদ্ধ হয়ে গেল তাতে নৈতিক মঙ্গল হয়েছে মানুষের? আমাদের জীবনের আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির কোন সুরাহা হয়েছে? তুমি কি মনে কর এতে মানুষের মনের সৎপ্রবৃত্তির জাগরণ হয়েছে। আমার তো মনে হয় এ থেকে নৈতিক উন্নতি কিছুই লাভ করিনি আমরা বরং আমরা আরো বেশি অপরাধ, দুর্নীতি ও হিংসা করতে শিখেছি।

—আমি ও-সব কিছুই বুঝি নে। বোঝবার চেষ্টাও করতে চাই নে। আমার মোটা কথা—আমার মুখের গ্রাস যা কিনা আমি আমার রক্তের বিনিময়ে উপার্জন করেছি তা কেড়ে নিয়ে যাবে একজন আর আমি নিশ্চপ দাঁড়িয়ে থাকবো? জার্মানীর তৈরি বন্দুক, রিভলবার, সড়কি বল্লম তাই দিয়ে আমাকে মারবে আর আমি নীরবে তা সহ্য করবো?

ভিক্ষু বললো—নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো এই জীবনই শেষ নয়। এরপর আর এক জীবন আছে—অনন্ত জীবন।

—আমার মনে হয় তোমাদের মত ভিক্ষু, ফকিররাই এই পৃথিবীর হিংস্রতা ও হিংসাপ্রবণতার জন্য অনেকখানি দায়ী। তোমরাই নিজ স্বার্থের জন্য, নির্বাণ চেয়ে, অকপটে নির্বিকার চিত্তে সমস্ত প্রকার অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে হিংসুটে লোকগুলোকে উৎসাহী ও প্রভাবান্বিত করে তুলেছ।

ভিক্ষু শান্তগলায় বললো—উত্তেজিত হলে আত্মার স্বরূপ দর্শন পাবে না।

—অনন্ত জীবনের কথা বলছো তুমি। সে-কথা আমি ভাবি না কারণ সে অনেক দূরের কথা। আমার সামনে যে জীবন আমি তাই দেখবো এখন। আর এই জীবনের মধ্য দিয়েই আমি যা দেখছি তাতে আর অন্য জীবন বা পরলোকের কথা বিশ্বাস করতে পারি নে। পরলোক যদি শূন্যে আকাশে হয় অথবা স্বর্গ যদি ইন্দ্রধনু হয় আর তার ছায়া যখন এই জগতে প্রতিফলিত হয় তখনই আমরা দেখতে পাই অনন্ত জীবনের রূপ। কেন তবে আকাশ

কালো হয়, সূর্য, চন্দ্র তারা গ্রহ উপগ্রহ হারিয়ে যায় আর কেনইবা মেঘ এসে ইন্দ্রধনুকে ঢেকে দেয়? তাহলে এ থেকেই বুঝতে পারি যে অনন্ত জীবনের কথা তুমি বলছো তার রূপও আমাদের এই জীবনের মত। এই অনন্ত জীবনের যদি কিছু অলৌকিক ক্ষমতা না থাকে তাহলে আমার বিশ্বাস আসবে কোথেকে। আর নির্বাণই বা কোথায়?

ভিক্ষু বললো—অনন্ত জীবনের রূপবদল হয় না। সমস্ত মন ও চিন্তা দিয়ে না দেখলে একে দেখা যায় না। এ-জন্য নির্জনতা চাই। তোমার সমস্ত অন্তরটা ঈশ্বরের চিন্তায় ডুবিয়ে দাও। এই পৃথিবীর সব কিছু থেকে নিজেকে সরিয়ে নাও। পাপ-পথ থেকে দূরে সরে যাও।

—মুক্তি আমি চাইনে। পাপও তেমন কিছু করেছি বলে মনে পড়ে না। তবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়েছি, আরো লড়বো। আমি চিনতে চাই, বুঝতে চাই এই জগতটাকে, মানুষকে আর তার জীবনটাকে।

ভিক্ষু বললো—সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই বুঝতে পারবে না তুমি। দূর থেকে চেয়ে দেখো সব কিছুই স্পষ্ট দেখবে। উঠে যাও পাহাড়-পর্বত পার হয়ে আরো উপরে সেখান থেকে জগতের দিকে দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকো। দেখতে পাবে তোমার ছায়া পড়েছে নিচেয়, নিচের লোকগুলো তাকিয়ে আছে তোমার দিকে। তোমার শক্তি তাদের মধ্যে কাজ করছে।

ভিক্ষুর কথা শুনে ভাওনাথ কেমন যেন একটা অজ্ঞাত চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সমস্ত কল-কোলাহল ডুবিয়ে দিয়ে মনটা কোথায় যেন দ্রুততর গতিতে ছুটে চলেছে। হঠাৎ একটা অন্ধকার এসে ধাক্কা মারে তাকে। তার চোখ দুটোর আলো চুরি করেছে অন্ধকার। ভাওনাথের গতি থেমে যায়। তার সমস্ত দেহটা অন্ধকারের নির্মম লোহ শক্ত বুকের মধ্যে। একটা ছায়াহীন নিথর ব্যথা তার আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। জীবনটাকে কিছুতেই ধরে রাখতে পাচ্ছে না তার মধ্যে। মৃত্যু তার লম্বা বাহু এগিয়ে দিয়েছে তার দিকে। এর মধ্যে সেই অন্ধকারের বুক থেকে সে

শুনতে পায় একটা অসহায় একঘেয়ে ক্ষীণকণ্ঠের গোঙানি। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ভাওনাথ। যন্ত্রণা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। জীবনটাকে বাঁচাতে চায় সে। অন্ধকারের বুক চিরে আলোর দিকে এগিয়ে যেতে চায়। মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—কী ভীষণ অন্ধকার, আমরা কোথায়? ভাওনাথ কাঁপছে।

ভিক্ষু হেসে জিগ্যেস করে, ভয় পেয়েছ?

ভাওনাথ বললো—কোথায় গেল সেই সূর্যকরস্নাত সকাল। এখন তো রাত নয় তবে অন্ধকার কেন?

—আত্মাকে একটা সূক্ষ্মতম বিন্দুর মধ্যে কেন্দ্রীভূত করো, দেখতে পাবে অনেক আলো। এই আলো আর নিভবে না। দেখতে পাবে সমস্তই জাগ্রত। শুষ্ক মরুতে জল দেখবে। পল্লবিত বনবৃক্ষরাজার গুঞ্জন ও পাখীর কাকলিতে মনটা ভরে উঠেছে।

ভিক্ষুর কথা শুনতে শুনতে ভাওনাথ কোথায় কোন কল্পনার রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হয়। তার মনে হয় সে যেন কোথায় এক বনের মধ্যে। চারিদিকে বন আর বন, নির্জন আর নির্জন। সে দেখতে পায় উপর থেকে আকাশ চেয়ে আছে মাটির দিকে। এই মাটির ওপরেই দাঁড়িয়ে ভাওনাথ। বনের মধ্যে আলো জ্বলছে। ভেসে আসছে পাহাড় থেকে নেমেআসা ঝরণার গান, বনের ঘাস আর ফুলের গন্ধ। বনের বুক চিরে চলে গেছে অনেক পথ দূরে দূরে বহু দূর। ভাওনাথ চলেছে পথরেখা ধরে, ধীর, অচঞ্চল, অব্যস্ত অথচ অবাধ গতিতে। একটা স্বপ্নের মত নির্বিরোধ জীবন।

ভাওনাথ চেয়ে আছে মাথা উঁচু পাইন গাছগুলোর দিকে। আর ভিক্ষু তার গলার ওপর হাত রেখে অস্ফুট স্বরে জপ করছে।

তিন

অল্পদিনের মধ্যেই স্কুলটা জমজমে হয়ে ওঠে। বসন্তের অম্লান ছায়া পড়েছে সমস্ত বাগানের ওপর। দিনের শান্ত আলো আর রাতের স্নিগ্ধ চন্দ্রাতপ অতীতের গ্লানি মুছে দিয়েছে। নির্মল আকাশ থেকে নেমে এসেছে অনেক আলো ঝলমল স্বপ্ন।

মদনকুলের মনে হয় বাগানের সমস্ত সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা যেন হারিয়ে গেছে। পুরোনো পৃথিবী মরে গেছে। সৃষ্টি হয়েছে এক নতুন রাজ্য—বিরাট বিস্তৃত অসীম এক নির্মল পৃথিবী। এই নিষ্পাপ পৃথিবীর বুক থেকে একটা নতুন মানবতার জন্ম হয়েছে। মানুষের গতি অবাধ, স্বচ্ছন্দ। নির্বিরোধ এগিয়ে চলেছে দুর দুর অতি দুরে। মগজটা চলমান মেসিনের মত কাজ করে চলেছে। নতুন নতুন ভাব ধারণা ও পরিকল্পনা যেন মাটি থেকে ভুইকোঁড়ের মত বেরিয়ে আসছে।

বিলাসী, অম্বরবাহাদুর, পদমমায়া, করুণসিং সকলেই বিস্মিত হয় তার চিন্তা শক্তি দেখে। ওরা খুশী হয় সকলে। তবু এই খুশীর মধ্য থেকে মাঝে মাঝে একটা অবরুদ্ধ জল পদমমায়ার বুকের পাড়টাকে আঘাত করে। পদমমায়া অস্বস্তি বোধ করে, বুক থেকে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে।

পদমমায়ার এই অস্বস্তির কারণ বুঝতে বিলম্ব হয় না বিলাসীর। সে পদমমায়াকে বলে—মদনফুল কত বড়। তার তুলনা পদ্মিনী, পদ্মাবতী বা রুক্মিনী ছাড়া হয় না। ও আমাদের উত্তরের পদ্মিনী। আমাদের মেয়ে। কত গর্বের বিষয় আমাদের।

পদমমায়া বলে—সবই বুঝি দিদি। তবু আমার মনে হয় তার জীবনে একটু ফাঁক থেকে যাচ্ছে। মদনের জীবনের সঙ্গে আমার জীবনটা যে জড়িত তাই তার জীবনের অভাবটাকে আমার নিজের অভাব বলে মনে হয়। একটা বিয়ে করলে ভাল করতো।

করুণসিং ছেলেটাকে বেশ ভাল লাগে আমার। ওর সঙ্গে মদনের বিয়ে হলে বেশ মানাতো।

বিলাসী বললো—ভুল বুঝেছ পদমমায়া। একটা অতি ক্ষুদ্র দিকে নজর দিয়ে তুমি তোমার আদর্শ ভুলে গিয়ে সংকীর্ণতার মধ্যে পা বাড়াচ্ছ। ভালবাসার ক্ষেত্র অত সংকীর্ণ নয়, এর বিস্তৃতি পৃথিবীময়। যেখানে সমগ্র পৃথিবী সেখানে একটা মাত্র মানুষের ভালবাসা প্রকৃত তৃষ্ণাতুরের কাছে এক বিন্দু জলও নয়। বাগানটার দিকে চেয়ে দেখ একবার। বাগানের সমস্ত লোকগুলো চেয়ে আছে তার দিকে। বাগানটাকে মনে কর একটা বিরাট পুকুর আর তার মধ্যে একটা মাত্র পদ্মফুল। দেখতে পাচ্ছ পুকুরটার সমস্ত জল পদ্মটাকে ঘিরে কি করছে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে, হাসিতে হাসিতে ফুলটার জীবন ভরে দিচ্ছে।

বিলাসীর কথা শুনে ক্ষণিকের জন্য মনে মনে গর্ব অনুভব করে পদমমায়া। মনটা মোহ মায়ার হাত থেকে মুক্তি লাভ করে চলে যায় অন্য এক দিগন্তে যেখানে মনটাকে পিছনে ফেলে জীবনটা একটা রূঢ় বাস্তবের হাতে পড়ে আর্তনাদ করছে। দেখতে পায় মেসিনগুলো সরব সহাস্য মুখে ঘর-ঘর শব্দ করতে করতে চলছে। আর অন্যদিকে স্তূপীকৃত রাই শস্য। মেসিনগুলো দাঁতে দাঁত দিয়ে গর্জন করে উঠছে আর সঙ্গে সঙ্গে রাইশস্যগুলো মেসিনের মুখে গিয়ে পড়ছে। নিটল তৈলাক্ত দেহের সমস্ত তেলটুকু নিঙড়ে যাচ্ছে আর পড়ে থাকছে রস রক্তশূন্য ছোবড়া এই মানুষগুলো। একটুক্ষণ বাদেই অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে লোকগুলো। তাদের নিশ্চুপ পদক্ষেপের শব্দ শুনতে পায়, দেখতে পায় কম্পনঘন ছায়ামূর্তির মিছিল। কোথায় চলেছে ওরা? এই পৃথিবী মাটি মানুষ ছেড়ে? দেখতে পায় মদনফুলকে। সবল নির্ভীক পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছে পথের ধারে। লোকগুলোর অসাড় নিষ্পন্দ দেহ টলে পড়ছে আর মদনফুল দু'হাত দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরছে। লোকগুলো সবল ও দৃপ্ত হয়ে উঠছে মুহূর্তের মধ্যে। নোংরা জীবনের তলদেশ থেকে ভেসে আসছে অসংখ্য সঙ্গীতময় লহরী।

জীবনটা ঘোড় নেয়, সঙ্গে সঙ্গে মন তার ভাষা যোগান দেয়। মদনকুল অনুভব করে স্বাধীনতার মধ্যে আনন্দ আছে। এই আনন্দই মানুষকে জীবনের নানারূপের অভিজ্ঞতা এনে দেয়। আর ঘাড়ে বোঝা না চাপালে লোকের দেহও চলতে চায় না। ভাওনাথ জেলে যাওয়ার পর তার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। ভাওনাথ জেল থেকে ফিরে আসার আগেই সে স্কুলটার যতটা সম্ভব উন্নতি করতে আর লোকগুলোকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়ে জাগিয়ে তুলতে চায়। আর এই সঙ্গে তাদের জীবনটাকেও বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দিতে চেষ্টা করে। তার ধারণা প্রত্যেক মানুষেরই অল্পবিস্তর ভৌগোলিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাই একখানি বিশ্ব-মানচিত্র এনে স্কুলের দেয়ালে টাঙিয়েছে। নিজে যতটুকু বোঝে সকলকে বুঝিয়ে দেয়। তার বিশ্বাস বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে যেন সমস্ত জীবনটাকে চেনা যায় না। মাঝে মাঝে মানচিত্রের দিকে চেয়ে কি সব ভাবে। চোখ মুখ কুঁচকে ওঠে। একটা বিরক্ত বিতৃষ্ণ অভিযোগের চিহ্ন ফুটে ওঠে। হয়ত নিজের অক্ষমতা ও ক্ষুদ্রতাই এর কারণ। সমস্ত অহঙ্কার খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যায় এই ক্ষুদ্রতার কাছে। হঠাৎ নিতান্ত অসহায় ক্ষীণকণ্ঠে পড়ুয়াদের বলে ওঠে—দেখেছ মানুষ কত ছোট আর পৃথিবী কত বড়। এই মানচিত্র এর প্রমাণ। এর দিকে তাকালেই মানুষ তার নিজের ও পৃথিবীর পরিচয় পাবে।

এই ক্ষুদ্রত্ব ও বিরাটত্বের তেমন কিছু বুঝতে পারে না পড়ুয়ারা। তবে তারা নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারে যে এর মধ্যে একটা অভিযোগ বা উদাসীনতা আছে মদনকুলের।

খানিকক্ষণ নিশ্চুপ থাকে সকলে। অনেক এলোমেলো নিরর্থক ভাব ভাবনার মধ্যে ডুবে যায়। অবোধিগমতার জন্য অচিরেই মূল চিন্তাধারাটা বাতাসে উড়ে যায়, অন্য আর এক চিন্তা, হয়ত সামাজিক, অর্থনৈতিক অথবা অনেক অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা এসে ভিড় করে।

পর মুহূর্তেই আবার আগুনের মত দপ্ করে জ্বলে ওঠে মদনকুল। একটা গন্ধাকুল আবেশে সতেজ ও চঞ্চল হয় সে। হারিয়ে যাওয়া

জিনিসের পুনঃপ্রাপ্তির মুহূর্তটির মত হাস্য উদ্বেলিত কণ্ঠে বলে ওঠে—না, না মানুষ ক্ষুদ্র নয়। মানুষ বিরাট। মানুষই তো এই বিরাট পৃথিবীটার সৃষ্টি করেছে। মানুষের এই ক্ষুদ্রত্বের মধ্যেই বিরাট সব কিছু আছে, তাকে চিনে নিয়ে পৃথিবীটাকে নিজের মধ্যে পেতে হবে। যেমন ক্ষুদ্র এই মানচিত্রে আছে সমগ্র পৃথিবী তেমনি আমাদের মধ্যেও আছে এই বিরাট পৃথিবী যার কথা আমরা ভাবি না, ভাবতে চেষ্টাও করি না।

লেখাপড়া ছাড়াও যে জীবনের আরো অনেক দিক আছে যা অনেক বেদনার মধ্যেও আনন্দ দেয় সেই সমস্ত দিকগুলোর বিষয় চিন্তা করে মদনকুল। হঠাৎ আবিষ্কার করে—সাহেব বাবুদের মত বনভোজন করতে হবে।

স্কুলে সকলের কাছে এ বিষয় উত্থাপন করে। সে বলে—জীবনে কাজের সঙ্গে আনন্দও দরকার।

সকলেই একবাক্যে রাজী হয়।

বিলাসী বললে, সব বুঝলাম। কিন্তু সময় কোথায়? হপ্তার রবিবার ছুটি। সেদিন অসংখ্য কাজ আমাদের। কাপড় জামা পরিষ্কার করা, হাট বাজার করা আরো সংসারের অনেক খুটিনাটি, যেমন পরিষ্কার করা, ঘরের টুকিটাকি মেরামত করা লকড়ি সংগ্রহ করা। আরো অনেক কিছু আছে যা হয়ত এখন মনে পড়ছে না কিন্তু বাড়িতে গেলেই মনে পড়বে।

অম্বরবাহাদুর বললে—বেশ, আর ক'দিন বাদেই তো ফাগুয়ার ছুটি। ঐ সময়ে বনভোজন করলেই হবে।

এরপর ফাগুয়ার ছুটিতে বনভোজন করে ওরা। বনের বুক চিরে যৌবনা ডুরবা বয়ে চলেছে মহানন্দে। এই ডুরবার পূর্ব পাড়ের খানিকটে জায়গার জঙ্গল পরিষ্কার করে নেয় ওরা। পুরুষে পাতাপুতি, কাষ্ঠ সংগ্রহ করে নিয়ে আসে জঙ্গল থেকে আর মেয়েরা রান্নাবান্নায় ব্যস্ত। উত্তরে বিরাট নীলচে পাহাড়, উপরে বসন্তের নীল সাদা অনন্ত আকাশ আর নদীর দু'ধারে সবুজ বনানী। ডুরবা ছুটে চলেছে। গতি অবাধ, স্বচ্ছন্দ। সকালের শান্ত মধুর রোদ এসে শুয়ে পড়েছে জলের বিছানায়। ঢেউ তুলে জলগুলো মৃদু

মন্থর গতিতে ছুটেছে। সেই জল থেকে একটা অবরুদ্ধ শক্তি নির্গত হচ্ছে। একটা মিষ্টি মধুর কল্লোল ভেসে আসছে। পাখীগুলো গান গাইছে, ফুলের গন্ধ আসছে নাকে বন নিঝুম পড়ে আছে।

বিলাসী বললে—দেখেছ, কী সুন্দর পরিবেশ। আমার মনে হয় সমস্ত জগতটাই এখানকার মত মন্থর, অচেতন গতিতে চলেছে। কিন্তু এর মধ্যেও কত সৌন্দর্য, শক্তি। বন আর পাহাড়টার দিকে চেয়ে দেখ, ওরা যেন অচেতন পড়ে আছে, ওদের মধ্যে কত বেদনা, গ্লানি। ওদের জাগিয়ে তুলছে নদী, পাখী আর ঐ ফুলগুলো।

বিলাসীর কথাগুলো সকলের কাছেই অস্পষ্ট, অবোধ্য বলে মনে হয়। তবে মদনকুল হয়ত বুঝেছিল। সে বললে—ঠিক বলেছ মাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের মধ্যেই বড় বড় জিনিস আছে আর এরাই বড়কে জাগিয়ে তোলে। উনুনটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কয়েকটা ইঁট দিয়ে তৈরি উনুন, ইঁটের মাঝে মাঝে ফাঁক। আগুনের শিখা ইঁটে বাঁধা পেয়ে আরো জোরে ফুঁসে উঠে ফাঁকগুলো দিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। কাছের সমস্ত বনটা আলোকময় হয়ে উঠেছে। উনুনের উপরে বসানো বড় লোহার কড়াইয়ের জল ফুটছে টগবগ করে। কড়াইয়ের তলে পড়ে থাকা ভারী চাল ডালগুলো জলের আঘাতে নড়ে উঠছে। উপরে ভেসে উঠছে, জলের সঙ্গে পাক খাচ্ছে। সেইদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মদনকুল বললে—দেখছ, আগুন কতটুকু এই বনের তুলনায় তবু বনটা জেগে উঠেছে। চালডালের তুলনায় জলই বা কি তবু জলটা চালডালগুলোকে জাগিয়ে তুলেছে। শুষ্ক প্রাণহীন কাষ্ঠের মধ্যেই বা তেমন কি আছে? তবু তার দাহন শক্তি কতখানি তা ভাববার বিষয়। এই সবই হচ্ছে একাধিক সংযোগের ফল। এই কাষ্ঠ কখনই জ্বলতো না যদি না তাতে আগুন যোগ দিত। তাই আমার মনে হয় আমরা যে শুধুমাত্র আনন্দ উপভোগ করছি বন ভোজনে তা নয়, আমরা আরো উপলব্ধি করতে পারছি আমাদের জীবন। আমরা এখানে এই জীবন পাচ্ছি এও সংযোগের ফল। শক্তির যোগ হয়েছে। আমরা নিজ নিজ ঘরে বসে শুধু নিজেকেই চিনেছি, আত্মার তুষ্টি হয়েছে কিন্তু আজ আমাদের এই মিলন

পরস্পরকে চিনতে দিয়েছে, এক করেছে। আমরা ভাই ভাই বোন বোন। আমরা এক।

মদনকুলের কথাতে হাততালি দিয়ে ওঠে সকলে। বলে—ঠিক বলেছ মদন।

করুণসিং বললে—একা থেকে একা খেয়ে আত্মার তৃপ্তি হয় না। আত্মা বিরাট, তার পরিধি বিশাল বিস্তৃত। সে শুধু আমার এই দেহটাকে চায় না, সে চায় আমার জীবন আর আমার জীবনের সঙ্গে সংশিষ্ট সব কিছুকে।

উনুনটার চারপাশে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে সকলে। করুণসিং বসেছে মদনকুলের সামনাসামনি হয়ে। মাঝেখানে আগুন জ্বলছে। পাতাপুতি পোড়া অনেক ছাই উড়ে যাচ্ছে শূন্যে শূন্যে। ফট্ ফট্ পট্ পট্ আওয়াজ হচ্ছে। মনে হচ্ছে আগুনের মধ্যে যেন কান্না গুমরে গুমরে মরছে। সেই কান্না থেকে হাসি জন্ম নিচ্ছে। আগুন হাসছে, নদী বন হাসছে আর হাসছে এই মেয়ে পুরুষগুলো। অন্তরে এক অদ্ভুত আনন্দ, মুখে ও মনে অফুরন্ত কথা, গানের কলি। সকলকেই বেশ সাহসী সুন্দর বলে হয় করুণসিংয়ের। এখানে সব কিছু, অভিযোগ, বেদনা পরাভূত। বিষে জরজর লোকগুলো যেন সহজে নিশ্বাস ফেলছে। করুণসিং চেয়ে আছে মদনকুলের দিকে। মদনকুলকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে। আগুনে আর কতটুকু সৌন্দর্য ও দহনশক্তি আছে—মদন যেন তার চেয়ে অনেক কিছু। মাঝখানের ঐ আগুনের সমস্ত রূপটা যেন তার কাছে হার মেনেছে। অন্তরের অন্তস্তল থেকে একটা বেদনাময় অনুভূতি জেগে ওঠে করুণসিংএর। সমস্ত পৃথিবীটাকে যেন সে মদনকুলের মধ্যে দেখছে। তারই ধ্বনি, তারই সুর যেন জগতময় প্রচারিত হচ্ছে। নিজের মনেই প্রশ্ন জাগে—এ কি কামনা, মোহ বা অন্য কিছু? না, এ কামনা অথবা মোহ নয় এ জীবনেরই একটা বাস্তব রূপ। এখানেই জীবন, এখানেই আনন্দ। এ কামনা বা মোহের অনেক উর্ধ্বে। এখান থেকে কামনা বা মোহকে দেখতে পাওয়া যায় একটা পরমাণুবিশেষ।

কোলাও এসেছে ওদের সঙ্গে। তারও উৎসাহের অভাব নেই।

সকল পুরুষের মত বন থেকে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে সে। সকলের মত হাসি তামসায় মুখর। বিলাসী, মদনকুল ও করুণসিংএর কথার বিন্দুমাত্রও বুঝতে পারে না সে তবু বুদ্ধিমানের ভানে বোকার মত চাকচিক্য হাসি দিয়ে ওদের কথার সায় দেয়। অথচ সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে মোড়লগিরি করার ষোল আনা বাসনা।

অনেকেই হাসে এতে। আবার বিরক্তও হয় মাঝে মাঝে। বিশেষ করে করুণসিং। এই লোকটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না সে।

অম্বরবাহাদুরকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন দেখাচ্ছে ওদের থেকে। ওদের কোন কথাতেই কান নেই তার। নদী আর ওপারের বনের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছে সে। গুমরে উঠছে মনটা। জীবনের বাষ্প তার বুকটাকে চেপে ধরছে মাঝে মাঝে। এর মধ্যেও ক্ষণে ক্ষণে তার চোখেমুখে দেখা যায় জলের ওপর ভাসমান একটা স্বপ্ননীল আকাশের ছায়া। একটা প্রত্যয়ভরা জীবন্ত উজ্জ্বল স্বপ্ন। পরক্ষণেই মৃত্যুর মত একটা কালো ছায়া এসে ঘিরে দাঁড়ায় তাকে। একটা বিরক্তিকর আবহাওয়া। নাক মুখ কুঁচকে যায়। ঘন ঘন নিশ্বাস টানে। কী যেন একটা দারুন দুর্গন্ধ আসছে ভেসে।

অনেকেই অম্বরবাহাদের এই বিষাদ আনন্দ মিশ্রিত তন্ময়ভাব লক্ষ্য করেছে। এদের মধ্যে অনেকের মনে হয় হয়ত সর্দার আজকার এই আনন্দটা উপভোগ করতে পারছে না কিন্তু এই ধারণার নিশ্চয়তা সম্বন্ধে তাদের সন্দেহ আছে কারণ তারা সকলেই জানে সর্দার বোকা বর্বর নয়। নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে এর, তা জানে না তারা।

বিলাসীও লক্ষ্য করেছে সর্দারের এই তন্ময়তা। মদনকুল ও করুণসিংও লক্ষ্য করেছে হয়ত কিন্তু তাদের সরল যৌবনসুলভ চঞ্চল চিন্তারাশি মনে দাগ কাটার আগেই বাতাসের সঙ্গে উড়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে। মদনকুল ভেসে চলেছে জীবনের একটা নতুনদিকের আবিষ্কার ও আনন্দে একটা স্বপ্নময় সুরধ্বনি তুলে আরো অনেক নতুন নতুন এলোমেলো অস্পষ্ট পরিকল্পনার

ছায়া ধরে, জীবনের আরো অন্য কোন দিকের অনুসন্ধানে। আর করুণসিং ভাবছে মদনের কথা। তার সাফল্য যেন করুণসিংএরই জীবনের একটা উত্তরণ। করুণসিং আর মদন এক।

বিলাসী অম্বরবাহাদুরকে জিগ্যেস করে—তুমি যে কোন কথা কইছো না সর্দার? কি ভাবছ এতক্ষণ ধরে?

অম্বরবাহাদুর বললে—নদীর ওপারের বনের দিকে একটু চেয়ে দেখ। আগুন লেগেছে সেখানে। পাতাপুতি গাছপালা পুড়ছে। বিশাল বিস্তৃত অরণ্যটিকে মনে হচ্ছে একটা বিষণ্ণ পাষাণ প্রাচীর। লাল ক্ষতচিহ্নভরা। তার মাঝে ঐ ছোট ছোট পোড়া, অর্ধপোড়া গাছ লতাপাতাগুলোকে মনে হচ্ছে এক একটা ছায়ামূর্তি। বনের পাষাণ বুকটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। কেঁপে উঠছে মাটি আর ঐ নদীর জল। শুনতে পাচ্ছ মুমূর্ষু আত্মার আর্তনাদ?

বিলাসী বললে—ভুল বুঝেছ সর্দার, ও আর্তনাদ নয়—জয়োল্লাস। আগুন নয়—আলো। চেয়ে দেখ বনের নিবিড় বুকে আলো। চেয়ে দেখ বনের নিবিড় অন্ধকার বুকে আলো জ্বলছে। আশার প্রতীক, সাফল্যের জয়গান। ঐ দেখ, পাহাড় থেকে শিবের জটা ছিঁড়ে নেমে আসছে ভগীরথ। সঙ্গে গঙ্গা। এ তাদেরই জয়গান। আমাদের সাফল্য। মানুষের শক্তি পরীক্ষা, জীবনবোধ।

বিলাসীর কথা শুনে অম্বরবাহাদুরের চিন্তা অন্য দিকে বাঁক নেয়। অন্য এক বাতাস আসে। অন্য এক গন্ধ। অম্বরবাহাদুর মুখর হয়ে ওঠে।

প্রেমপ্রকাশ ও তার স্ত্রীর উৎসাহ কম ছিল না। কাজকর্ম হাসি ঠাট্টা আমোদ প্রমোদের মধ্যে প্রায় সবক্ষণই কাটিয়েছে তবে মাঝখানটায় কেমন একটু বিষণ্ণ দেখিয়েছিল তাদের তবে শেষটায় তা সুদে আসলে উসুল করেছে তারা।

পদমমায়া কথা কম বলছে সত্য কিন্তু চোখে মুখে বিষাদের কোন রেখাপাত করেনি বরং আরো উজ্জ্বল হয়েছে সন্ধ্যাতারার মত। গর্ব অনুভব করছে মনে মনে। মনে হচ্ছে মদনকুল একজন রাজনৈতিক নেতা। অনেক শিখেছে, অনেক ভেবেছে সে। যুগের পরিবর্তন সাধন করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে না। নতুন যুগের অনেক ছবি দেখতে পাচ্ছে পদমমায়া।

বিলাসী সকলের অনুমতি নিয়ে কোলার স্ত্রীর ওপর রান্নার ভার দিয়েছে। এতে কোলা ও তার স্ত্রী খুব গর্ব অনুভব করে। কিন্তু বিলাসী যে একটা চাল চালিয়েছে এরমধ্যে তা টের পায়নি ওরা। খাওয়ার সময় উপস্থিত হতেই প্রেমপ্রকাশ ও তার স্ত্রীর সমস্ত স্ফূর্তি যেন কোথায় উধাও হয়ে যায়। সংশয় ও ভয় এসে ওদের সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন করে বসে। একপাশে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে ভীতচোখে চাওয়াচাওয়ি করে পরস্পরে। সকলেই গোল হয়ে গা ঠেসাঠেসি বসেছে। ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিলাসী বললে—তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন, বসে পড়। বিলাসীর কথায় ওদের ঘোলাটে চোখে আলো জ্বলে ওঠে। সন্ত্রস্তচোখে সকলের দিকে একবারটা তাকিয়ে সঙ্কোচের সঙ্গে পংতি মধ্যে বসে পড়ে। কোলা ও তার স্ত্রীর এ সমস্ত ভাববার ফুরসৎ নেই। তাদের মনের মধ্যে তখন অন্য এক আত্মার কাজ চলছিল। অহঙ্কার অথবা নেতৃত্বের তৃপ্তি কিংবা অন্য একটা কিছু হবে।

খিঁচুড়ি আর বেগুন ভাজা এতেই ওদের পরম তৃপ্তি। এর বেশি কিছু আশা করতে পারে না এরা। এই চাল ডাল তেল নুন হলুদ এ-ও ওরা তোলা করে বাড়ি বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছে। অম্বরবাহাদুর, কোলা আর মস্তরে বেগুন দিয়েছে। কারণ তাদের বাড়িতেই যথেষ্ট ফলেছে গাছে। কোলার স্ত্রীই পরিবেশন করছে। যে শালপাতা সংগ্রহ করে এনেছিল জঙ্গল থেকে তাতে খিঁচুড়ি দেওয়া হয়েছে, বেগুনভাজা তখনও দেওয়া হয়নি পাতে। এর মধ্যেই অনেকে গরম খিঁচুড়ি হাতে নিয়ে গন্ধ শুকছে। সারা বনটি—খিঁচুড়ির গন্ধে মেতে উঠেছে।

বিলাসী ও পদমমায়া চেয়ে আছে কোলার দিকে। কারণ তাদের আতঙ্ক হচ্ছে তাকে নিয়ে। খিঁচুড়ির গ্রাস মুখের মধ্যে না দেওয়া পর্যন্ত পরিপূর্ণ তৃপ্তি অনুভব করতে পারছে না ওরা। হঠাৎ প্রাণটার মধ্যে একটা গরম লোহার সেক দেওয়ার মত যন্ত্রণা উপলব্ধি করে। পদমমায়ার দিকে তাকায় বিলাসী। পদমমায়াও তার পানে চেয়েছে এর মধ্যে। দুইজনের মধ্যে চোখাচোখি হয়। ওরা দেখতে পায় কোলা উসখুস করছে। পদমমায়া অসহায় দৃষ্টি

মেলে বিলাসীর পানে চায় আবার। বিলাসীর মুখে একটা ম্লান অনিশ্চিতের ছায়া। বিলাসী হেসে বললে—বনভোজনে সকলে এক সঙ্গে বসে না খেলে কখনও সম্পূর্ণ আনন্দ পাওয়া যায় না। গন্তব্যস্থানে পৌঁছুতে হলে কষ্ট হলেও সমস্ত রাস্তাটাই যেতে হবে। মাঝখানে থেমে গেলে যা বাঞ্ছিত তাতো পাওয়া যাবেই না বরং তার পরিবর্তে না পাওয়ার যন্ত্রণা আরো বেড়ে যাবে নৈরাশ্য ও হতাশে। তারপর একাত্মকরণ সকল সমাজের পক্ষেই একটা উন্নততর স্তর। সকল সমাজ সকল জাতিই এগিয়ে গেছে বহুদুর, আমরাই শুধু পড়ে আছি পিছনে। আমাদেরও উঠতে হবে। স্রোতের বিপরিত দিকে না গেলে শক্তি পরীক্ষা হয় না।

বিলাসী কথাগুলো এমন ভাষা ও ভঙ্গি দিয়ে বলে যে তাতে সে ব্যক্তিগত ভাবে কারো কাছে বলেছে বলে মনে করা যায় না। মিটিংএ বলার মত। কথাগুলো সর্বসাধারণের পক্ষেই প্রযোজ্য।

মন্তরে কি জানি হয়ত আগে থেকেই কিছু বলবে বলে প্রস্তুত ছিল। এক সঙ্গে এক পঙতিতে খাওয়ার কথাই ভাবছিল সে। বিলাসীর শেষের কথাগুলো হয়ত তার কানেই পৌঁছেনি। বিলাসীর কথা শেষ হতেই বলে ওঠে—ঠিক বলেছ তুমি। বড়বাবুর বাসায় থেকে দেখেছি তো কায়েত বামুন, বারুই কামার সকলেই একসঙ্গে বসে খায়।

করুণসিং বললে—এতো নিজেদের কথা মন্তরে, এখানে তো বিভেদ থাকা কখনই উচিত নয়। দেখেছ তো কত বিভিন্ন জাতির রাজা মহারাজা পণ্ডিত, উপাধ্যায় এক সঙ্গে এক টেবিলে বসে খায় সাহেবদের সঙ্গে।

বিলাসী উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। মন্তরে ও করুণসিংকে লক্ষ্য করে বলে, তোমরা চুপ করো একটু। আমার বিশ্বাস তোমাদের চেয়েতে কোলা অনেক বেশি জানে। সে তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অংশটাই জ্ঞানবাবুর সঙ্গে কাটিয়ে অনেক দেখেছে, অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। তাকে বলতে দাও। এই বলেই মুখটা কোলার দিকে ঘুরিয়ে নেয়।

বিলাসী কোলার মন ও মেজাজ চিনে নিয়েছে এরমধ্যে। সে

জানে কোলা কি চায় আর কিসে সে পরাজয় স্বীকার করে। অবশ্য তার নিজের কাছে এটা পরাজয় নয়, জয় বলেই মনে করে।

বিলাসী কোলার দিকে তাকাতেই দেখতে পায় তার সেই আগের উসখুস ভাব কেটে গিয়ে বেশ শান্ত ও স্বাভাবিক অথচ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ভারি গম্ভীর অথচ প্রত্যয়ভরা দৃঢ় কণ্ঠে বলে— বিলাসী ঠিক কথাই বলেছে। বনভোজনে একসঙ্গেই খাওয়া উচিত সকলের। সামাজিক ক্রীয়াকর্মের বেলাতে অন্য কথা।

প্রেমপ্রকাশ ও তার স্ত্রীর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকায়। চোখের পাতা ও ঠোঁট নড়ল তাদের। কথাগুলো নিশব্দে এক অন্তর থেকে অন্য অন্তরে প্রবেশ করল।

এদিকে পশ্চিম আকাশে সূর্য ডুবে যাচ্ছে। বিশাল বিস্তৃত সুদূর বনরেখা ছাড়িয়ে পাহাড়। তার বুকে অস্ত যাচ্ছে সূর্য। সূর্য যেন আর আকাশে নেই নিচে পাহাড়ে নেমে এসেছে। অন্ধকারের পোকাগুলো আবার অন্ধকারে এক জায়গায় জড় হয়েছে। ভুরষার জলরাশির বুকে মন্থরতা। বন ও নদী ওদের বিদায় সম্ভাষণ জানায়। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সমস্ত বনভূমি পেরিয়ে বাগানের সীমানার মধ্যে এসে পড়ে ওরা। নিবিড় অন্ধকারের বুকে ছোট ছোট ঘরগুলো কালো পিচুটি পড়া ঘায়ের মত দেখাচ্ছে। সমস্ত কল্পনারাজ্য মুছে দিয়ে সেখানে একটা বাস্তবরাজ্যের প্রতিফলন হয়েছে।

চার

পৃথিবী চলমান। এর বুক থেকেই সময়ের জন্ম আবার সময় থেকে জীবন। আর এই সময়ের বিবর্তনেই জীবনের বিভিন্ন রূপ। সেই জন্য জীবনও গতিশীল, পরিবর্তমান। পৃথিবীর গতি থেমে গেলে সময় নেই, জীবনও নেই। এই চলমান পৃথিবীও একটা নিয়মের অধীন। এই নিয়মই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে—সুখ, দুঃখ, জন্ম, মৃত্যু। একদিকে নিয়ম বন্ধন অন্যদিকে মুক্তি।

দিন চলেছে অবাধ নির্বাধ নদীর মতো। হঠাৎ থেমে যায় এক জায়গায় গিয়ে। সামনে বাঁধ, বন্ধন। সেই বন্ধনের পর মুক্তি। মানুষের জীবনেও অনেক থামা আছে আর সেই থামার মধ্যেই মুক্তি আছে। বন্ধন ভয়, মৃত্যু; মুক্তি সাহস, আনন্দ।

নিয়মের অনুবর্তি হয়ে পৃথিবী চলেছে, ঐ সঙ্গে দিন ও মানুষও চলেছে। দলমাননগরও চলছে। নিয়মের সমস্ত দুঃখ বেদনা পেরিয়ে আনন্দমঞ্চ চলছে বাগানে। এই আনন্দ থেকে জন্ম হচ্ছে অনেক কিছু, অনেক জড়পদার্থ মূর্ত হয়ে উঠেছে। বাঁশের বাঁশি আর জড় নেই এখন। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে সুর, তান। মৃত্যু মরে গেছে। মৃত্যু বলতে কিছু আছে বলে মনে হয় না ওদের।

মদনকুল মনে মনে গৌরব অনুভব করে। স্বাধীনতা যে মনবিকাশের শ্রেষ্ঠতম সহায়ক তা সে উপলব্ধি করতে পেরেছে। ভাওনাথের অবর্তমানে অনেক কিছু করেছে সে। তার সবচেয়ে গৌরবের বিষয় হচ্ছে সে কোলার মত একজন স্বার্থপর লোককে তাদের মধ্যে আনতে পেরেছে। ভাওনাথ ফিরে এসে নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে এতে। তার আসার দিন এগিয়ে আসছে। কর গুনে হিসাব করে মদনকুল। আর মাত্র দু'মাস বাকি আছে। এ-কথা ভাবতে মনটা আনন্দে মেতে ওঠে তার। তার নিকট থেকে অনেক

কিছু জানতে পারবে সে। কারাগারের বিচিত্র জীবন যাপনের কথা। আর এ-ছাড়া এই দুই বছর অন্তর সাধনা করে সে নিশ্চয়ই অনেক কিছু জ্ঞান লাভ করেছে। জীবনের আরো অনেক দিকের অনেক ছবি ভেসে ওঠে মদনকুলের মনে।

ভাওনাথের ফিরে আসার দিন যত এগিয়ে আসছে বাগানের লোকগুলো তত আনন্দ মুখর হয়ে উঠছে। কিন্তু কোলার মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। দিন দিন তার গাম্ভীর্য বেড়ে যাচ্ছে। এই গাম্ভীর্য যে আনন্দের নয় তা সকলেই অনুমান করতে পারে। এর মধ্যে যেন কেমন একটা বিষাদ অথবা কূটনৈতিক চালের ইংগিত আছে। কোলা হাসে, কথা কয় তার মধ্যেও কেমন একটা আড় বা বক্রতা আছে, সহজ হতে পারে না।

বাগানের সকলেই কোলার এই ভাব লক্ষ্য করে বটে তবে সেটা সাময়িক আর এ-নিয়ে মাথাও ঘামাবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করে না তাই কোন উচ্চবাচ্য করে না। কিন্তু করুণসিং খুব খুশী হয়েছে। সে হাসতে হাসতে অম্বরবাহাদুর, বিলাসী, পদমমায়া ও মদনকুলকে বলে—কোলার পরিবর্তনের কারণ বুঝতে পেরেছ তো ?

সকলেই হেসে জবাব দেয়—বুঝবো না কেন ?

ভাওনাথের আসার দিন যত এগুচ্ছে প্রত্যেকের উতলা তত বাড়ছে। গাড়ির সময় হলেই বিলাসী, পদমমায়া ও মদনকুল ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। আশার পর নৈরাশ্য তারপর আবার আশা। এমনি করে আশা আর নৈরাশ্যের মধ্য দিয়ে দিন চলছে অনন্তের পথে।

আজকাল মদনকুলের গতিপথ অবাধ। বিলাসী ও পদমমায়া খুশী হয় মনে মনে। তারা বুঝতে পারে মদনকুল তার যৌবনটাকে বেঁধে রাখতে পেরেছে। দৈহিক আনন্দের চেয়ে আত্মার আনন্দের বিস্তৃতি অনেক বেশি তা জানতে পেরেছে সে। দৈহিক সুখ সাময়িক উত্তেজনা আর দেহের অবক্ষয় কিন্তু আত্মার সুখ শান্ত, শক্তিবর্ধক ও ক্রমবর্ধমান।

অম্বরবাহাদুর, করুণসিং, প্রেমপ্রকাশ, মন্তরে আরো অনেকে

গাড়ির সময় হলে স্টেশনে যায়। এদের সঙ্গে মদনকুলও প্রায়ই যায়।

এরপর সত্যিই একদিন ভাওনাথ আসে। সে রাত্রের গাড়িতে আসে। ঐদিন ঐ সময়ে স্টেশনে কেউ যায়নি। রাত তখন এগারটা। সকলেই ঘুমিয়েছে। বিলাসী রাস্তার দিকে মুখ করে বসে আসে। হঠাৎ রাতের ঘন নিস্তব্ধতার মধ্যে পায়ের একটা শব্দ শুনতে পায় সে। বিলাসী বলে ওঠে—কোন আহে?

অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ামূর্তি দেখতে পায় বিলাসী অথচ কোন জবাব নেই। বিলাসীর মনের মণি চোখে এসে দুই মণি এক সঙ্গে কাজ করছে দৃঢ়তর ভাবে। নিবিড় অন্ধকার ও চেহারার অস্বাভাবিক পরিবর্তন সত্বেও ভাওনাথকে চিনতে বিলম্ব হয় না বিলাসীর। তার সমস্ত চোখমুখ মাথার বড় বড় আধো কাচাপাকা চুল ও দাঁড়িমোচে যেন সামান্য একটা তৃণের মত গভীর অরণ্যের মধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে। গায়ের কালো রঙের সঙ্গে বহুদিনের অধৌত জামা কাপড়ের ময়লা রঙ এক হয়ে একটা কালো অন্ধকার পিণ্ডের মত দেখাচ্ছে। অন্ধকারের শব্দ নেই, ভয়ঙ্করতা আছে কিন্তু এই অন্ধকার পিণ্ডের শব্দ ও ভয়ঙ্করতা দুইই আছে। তাই এই পিণ্ডটাকে বিলাসীর কাছে অন্ধকারের চেয়েও ভয়ঙ্কর বলে মনে হয়। তবু এই মৃত্যুমুখী ভয়ঙ্করতার মধ্যেও সজীব প্রাণের একটা কল্লোল শুনতে পায় সে। সমস্ত মৃত্যু, ভয়ঙ্করতা যেন পরাজিত সেখানে। মৃত্যু নেই, ভয়ঙ্করতা নেই, ভয় বা হার নেই শুধু আলো আর আলো, প্রাণের অফুরন্ত উৎস, আনন্দ। বিলাসী ছুটে গিয়ে ভাওনাথকে জড়িয়ে ধরে। তার মুখের দিকে সজল আনন্দ চোখে চেয়ে থাকে। ধুলোবালিমাখা দাঁড়ি চুলে হাত বুলিয়ে দেয়। হঠাৎ ভাওনাথের ডান হাতে তার হাত লাগে। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না বিলাসী তবু সে অনুভব করতে পারে—ভাওনাথের হাতের মধ্যে কি একটা শক্ত পদার্থ আছে। বিলাসী জিগ্যেস করে—হাতমে কা চিজ্ আহে?

এতক্ষণ কোন বাক্য বিনিময় হয়নি তাদের মধ্যে। ভাওনাথ বললে—জপমালা আহে।

বিলাসী চমকে উঠে বলে—জপমালা? মনে মনে চিন্তা করে জপমালা কোথায় পেয়েছে ভাওনাথ। তবে কি ভকত হয়েছে সে? জীবনের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পরকালের রাস্তা খুঁজছে। মনের মধ্য থেকে পিড়ীত লোকের কোঁকানির মত একটা শব্দ ভেসে আসে। বিলাসী যেন মুহূর্তের মধ্যে নিজেকে একান্ত অসহায় নিরবলম্ব বলে মনে করে।

ভাওনাথ একটু হেসে বললে—হ্যাঁ, জপমালা। এবারে তার হাসি আর গলার স্বরটার বিষয় ভাবতে চেষ্টা করে বিলাসী। হাসিটা কেমন যেন অতি সাধারণ হলেও তথ্য ও রহস্যপুর্ণ, গলার আওয়াজ সাধারণ মানুষের মত স্বাভাবিক নয়, গাম্ভীর্যপুর্ণ। অনেক ভেবেচিন্তে বলা অথবা গুরুগম্ভীর চিন্তার মধ্যে একটা শব্দমাত্র। অথচ এই শব্দ শুধু শব্দ নয়, তথ্যপুর্ণ আবেগ মাখা বাতাসের মত হালকা। এই হালকা বাতাসের মধ্যেও যেন একটা কিছু ভারী আছে যা সাধারণ মানুষের অজ্ঞাত এই শব্দ বা সামান্য ছোট্ট কথাটির মধ্যেও তেমনি গুরুভার একটা কিছু আছে তা বুঝতে পারে বিলাসী।

ঘরের দরজার কাছে এগিয়ে যায় বিলাসী। কুপিটা জ্বালে। অন্ধকার হঠাৎ আলো হয়ে যায়। সেই প্রথম আলোতেই একবার একটু দেখে নেয় ভাওনাথকে। একটুক্ষণ আগে তাকে যতটা অস্বাভাবিক বলে মনে করেছিল বিলাসী কার্যত সে ততটা নয়, আগের মতই স্বাভাবিক। সরল, সহজ, সহাস্যভাবে জিগ্যেস করে—পদমমায়া, মদনফুললোক কাহা আহে মাই?

বিলাসী অনেকটা আশস্ত হয় এবারে। ভাওনাথের মুখ থেকে এই কথাটাই শুনতে চেয়েছিল সে। এই কথাটার মধ্যে একটা দরদ আছে। সে তার থেকে পৃথক বা স্বতন্ত্র নয়, একাকিত্ব আছে। বললে—আহে, নিদ যাওথে।

ভাওনাথ দার্জিলিং যাওয়ার সময়ে একটা জামা ও একখানি কাপড় এনে বিলাসীর কাছে রাখতে দিয়েছিল। সেই জামা ও কাপড়টা সে সযত্নে তার বাঁশের তৈরি পেটরার মধ্যে রেখেছিল। সাদা ধবধবে সেই জামা কাপড় এনে ভাওনাথের হাতে দিয়ে নোংরা ময়লা কাপড় জামা বদলি করতে বলে।

বিলাসীর ধারনা ছিল ভাওনাথ খুব খুশী হবে এতে। হয়ত হেসে কুটিপাটি হয়ে পড়বে। কিন্তু ভাওনাথের মধ্যে কোনই পরিবর্তন দেখতে পেল না সে।

ভাওনাথ জামা কাপড়টা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো। তারপর একটু হেসে বললে—সবই এক আছে। মাটি মানুষ, মানুষ মাটি।

ভাওনাথের কথাগুলো বরাবরই হেঁয়ালির মত কিন্তু বিলাসীর মনে হয় আজকার এই কথাটা যেন আরো অনেক বেশি হেঁয়ালি আগের চেয়ে। ঠিক হেঁয়ালি বলা চলে না কারণ তার মধ্যে থাকতো একটা দৃঢ়তর অথচ শান্তসুপ্ত উত্তেজনা কিন্তু আজকার হেঁয়ালি অন্যরূপের। এতে উত্তজনা নেই তবে দৃঢ়তা আছে। আর অন্য এক প্রত্যয়।

বিলাসী এলোমেলো অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে ভাত দেয় ভাওনাথের। হাড়ি থেকে ভাত বাড়তে হাতা খুন্তির ঠুংঠাং আওয়াজ হয় সেই আওরাজে পদমমায়া ও মদনফুলের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুমের জড়তামাখা চোখে বড় বড় চুল দাঁড়ি মোচওলা কিম্ভুত কিমাকার একটা অপরিচিত লোককে দেখতে পেয়ে প্রথমটায় চমকে ওঠে দু'জনে। ওদের হাবভাব দেখে বিলাসী মুচকে হাসতে থাকে। ভাওনাথ নিজেকে রহস্যায়িত রাখার জন্য অন্য দিকে মুখ করে মিটমিট হাসে। বিলাসী বললে—তোয়লোক নেই চিনলেক।

ভাওনাথ এবারে ফিক্ করে হেসে ওঠে। বলে—মানুষের চোখে নিত্যি নতুন রঙ। একটু চোখের আড়াল হয়েছ কি হারিয়ে গেছ। মন এতটুকু কিন্তু পৃথিবী কত বড়। সাধরণ মানুষে কতটুকু মনে রাখতে পারে বল।

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঘরটা হেসে ওঠে। প্রায়-অন্ধকার টিমটিমে কুপি যেন খুব জোরে জলে উঠেছে। আকাশের সমস্ত বিদ্যুৎ নেমে এসেছে ঘরটার মধ্যে।

মদনফুল বললে—তোমার কথা মেনে নিতে পারছি নে আমি। আমার বিশ্বাস—মন পৃথিবীর চেয়ে ছোট নয়। মন সমস্ত পৃথিবীটাকে জুড়ে বসে আছে।

ভাওনাথ বললে—ঠিক বলেছ মদন। মন পৃথিবীর চেয়ে ছোট

নয়। কিন্তু সাধারণ মানুষের মন পৃথিবীর কোলাহলে হারিয়ে যায় যেমন কোলের শিশুর কোলাহলে মা হারিয়ে যায়। এখানে তার কাছে পৃথিবীর সব কিছুর চেয়ে বড় হয়ে ওঠে শিশু সন্তানটি। পৃথিবীতে একশ্রেণীর লোক আছে তারা অতি অসাধারণ। এই অতি অসাধারণ লোকগুলো পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল থেকে দূরে থাকে। একটা অবিচ্ছিন্ন নীরবতার মধ্যে। সেখানে কোলাহল নেই অথচ এই নীরবতার মধ্যে থেকেই পৃথিবীর সমস্ত কিছু দেখা যায়, শোনা যায়। এখানে মন ও চোখ অনেক বড়।

বিলাসী লক্ষ্য করে কথাগুলো বলতে বলতে কেমন একটা তন্ময়তার মধ্যে ডুবে যায় ভাওনাথ। হাতের গ্রাস হাতেই থেকে যায় মুখ পর্যন্ত পৌঁছে না। অবশ্য বিলাসী বুঝতে পারে তার নিজের মনটাকেও কে যেন সাঁড়াশি দিয়ে চেপে ধরেছে। ভাওনাথের কথাগুলো খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের মত নয়, এ যেন অন্য ধরনের অন্য অর্থপুর্ণ।

হঠাৎ গুদোমে রাত দু'টোর ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পায় বিলাসী। ব্যস্তভাবে বললে—এখন ঐ সব আলোচনা রেখে দাও। রাত অনেক হয়েছে। একটু না ঘুমুলে শরীর খারাপ করবে ভাওনাথের।

ভাওনাথ বললে—মানুষ তো ঘুমিয়েই থাকে মা। কে কবে জেগে থাকে? জেগে যদি থাকতো তাহলে তো জগতের সব কিছুই দেখতে ও জানতে পারতো। চোখ বুজে থাকা সহজ কিন্তু খুলে থাকাই যত কষ্টের যেমন যে কোন একটা জিনিসকে ছুড়ে ফেলে দেওয়া যতটা সহজ কুড়িয়ে আনা তত সহজ নয়।

খাওয়া শেষ করে আসন ছেড়ে উঠে যেতেই ভাওনাথ দেখতে পায় যে ঘরের পশ্চিম কোণে একটা তক্তার ওপরে অনেকগুলো বই স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। বইগুলো তক্‌তক্‌ ঝক্‌ঝক করছে, একটুও ধুলোবালি নেই। ভাওনাথ ঈষৎ হেসে বললে—মদনকুল তো অনেক বই সংগ্রহ করেছে এর মধ্যে।

বিলাসী বললে—ওগুলো সব ওর বই নয়। তুই জেলে যাওয়ার পর বইগুলো পোকা মাকড়ে নষ্ট করে দেবে বলে তোর বইগুলো

এখানে এনে রেখেছে মদন। প্রতিদিনই ধুলোবালি ঝেড়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বইগুলো।

কথাগুলো শুনে কেমন যেন একটা নিরাসক্ত নির্বিকারভাবে জবাব দেয় ভাওনাথ—ঠিকই করেছে মদন। ওগুলো তোমাকেই দিয়ে দিলাম। আমার কোন প্রয়োজনে লাগবে না।

বিলাসী ভাওনাথের কথার অর্থ খুঁজে পায় না। প্রয়োজনে লাগবে না তার। কেন, প্রয়োজনে লাগবে না কেন? তবে কি সে যা সন্দেহ করছে তা ঠিক? ভকত হয়েছে ভাওনাথ?

ভাওনাথ হেসে বললে—মদনফুল ।কন্তু বেশ বড় ও ভারিক্কি হয়েছে। কেমন মুরব্বি মুরব্বি গৃহিণীপনা শান্ত মাতৃভাব।

মদনফুল লজ্জা পেয়ে একটু হেসে মুখটা ঘুরিয়ে নেয় ভাওনাথের দিক থেকে। হঠাৎ তার নজরে পড়ে ভাওনাথের ছেড়ে-রাখা ময়লা কাপড় জামার দিকে। নাকটা টেনে ভ্রূ কুঁচকে বিলাসীকে জিগ্যেস করে—ওখানে ঐ কাদামাটি মাখা ওগুলো কি?

বিলাসীর উত্তর দেওয়ার আগেই ভাওনাথ বললে—আমার জেলের কাপড়জামা।

মদনফুলের চোখমুখ যেন নিমিষের মধ্যে রক্তরাঙা হয়ে ওঠে রাগে। মনে মনে জেল কর্তৃপক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ করছে সে। মানুষে মানুষকে এমনি করে রাখে? রাগত-গলায় বলে ওঠে—জেলের মধ্যে এ-নিয়ে আন্দোলন করনি কেন? আমি জানতাম তোমার দেহ ও মনে অপরিসীম শক্তি ও দৃঢ়তা ছিল কিন্তু আজ দেখছি তা নয়।

ভাওনাথ হেসে বললে—জেল অন্য একটা পৃথক জগত সেখানকার ধারণা তোমার নেই। সেখানে মন অন্য একটা দিকে বলিষ্ঠতর হয় অথচ জাগতিক একটা দুর্বলতা দেখা দেয়। অবশ্য এই জাগতিক দুর্বলতার উৎস কোথায় তা জানিনে তবে মনে হয় মানুষ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধববর্জিত হয়ে চিন্তা ভাবনায় জীবনের অন্য একটা দিক আবিষ্কার করে যেখানে ত্যাগ বা আত্মসমর্পণের মন্ত্র ছাড়া অন্য কোন মন্ত্র থাকে না। এই ত্যাগ আসে অনুশোচনা অথবা পূর্ব কৃতকর্মের উপলব্ধি থেকে আর আত্মসমর্পণ আসে অসহায়তা থেকে।

ভাওনাথ জেলে যাওয়ার পর তার ঘরে থাকে করুণসিং। এই ব্যবস্থা করে অম্বরবাহাদুর, বিলাসী, মদনকুল ও প্রেমপ্রকাশ। ঘরটা অন্য একটা পরিবারকে দেবেন বলে ঠিক করেছিলেন বড়সাহেব কিন্তু অম্বরবাহাদুরের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন নি তিনি। কারণ প্রথমটায় তাঁর ধারণা হয়েছিল যে ভাওনাথ নিশ্চয়ই কোন দুষ্কর্ম করেছে কিন্তু জেলকর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে যখন জানতে পারেন যে তার বিরুদ্ধে তেমন কোন প্রামাণ্য অভিযোগ নেই তখন পুর্বপরিকল্পিত মতের পরিবর্তন করেন।

বিলাসী ভাওনাথকে আর তার ঘরে যেতে দেয় না সেদিন। তার ঘরেই সেদিনকার মত শোওয়ার ব্যবস্থা করে। সকলেই শোয় বটে কিন্তু ঘুম বোধ হয় কারো আসেনি। দু'বছরের অনেক কথা, আনন্দ বেদনা তাদের মনের মধ্যে ভিড় জমিয়েছে। এদিকে দেখতে দেখতে পাখি ডেকে ওঠে। তারপর গুদোমের সিটি বাজে। বিলাসী উঠে বসে। তারপর পদমমায়া ও মদনকুল। ভাওনাথ চোখ বুজে পড়ে আছে। নিশ্বাস প্রশ্বাস অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, স্বাভাবিক নয়।

ভাওনাথের প্রত্যাবর্তন আকস্মিক হলেও ভোর না হতেই এ-খবর বাগানের সর্বত্র রটে গেছে। অম্বরবাহাদুর, করুণসিং, প্রেমপ্রকাশ, মন্তরে আরো অনেক পড়ুয়া এসে হাজির হয়েছে বিলাসীর বাড়িতে। রাজাভাতখাওয়ার একজন ফরেষ্ট গার্ড কায়লা সোনারের আত্মীয়। সে সেখানে গিয়েছিল সকালের গাড়িতে, বাগানে ফিরছিল রাতের গাড়িতে। গাড়ির মধ্যেই ভাওনাথের সঙ্গে দেখা হয় তার। প্রথমটায় তাকে চিনতে পারেনি সে। ভেবেছিল হয়ত সাধু সন্ন্যাসী কিম্বা একটা পাগল টাগল হবে আর কি। অনেকক্ষণ ধরে কৌতূহলী চোখ মেলে চেয়ে থাকে তার দিকে তারপর তার কপালের কাটা দাগ দেখে চিনতে পারে যে সে ভাওনাথ। রাতে কি জানি ঘুমুতে পারেনি কায়লা। ভোরের আলোর অপেক্ষা করেই হয়ত উসখুস মন নিয়ে রাত কাটিয়েছে। তারপর ভোরের পাখি ডাকতেই ঘরে ঘরে গিয়ে ভাওনাথের আগমনবার্তা জানিয়ে আসে।

অম্বরবাহাদুর এসেই ভাওনাথকে গাঢ় আলিঙ্গনে জাপটে ধরে।

অল্পক্ষণ মিলনের নির্বাক আনন্দ উপভোগ করে ভাওনাথের দাঁড়িতে হাত দিয়ে হেসে বলে—তিমি সাধু ভয়ো হেরছু।

করুণসিং বললে—ঠিকই ভয়ো। যো মনখিলে দোসরাকা অন্তে জান খতম করছ উসিলে তো জরুর সাধু ছ।

ভাওনাথ কোন জবাব না দিয়ে শুধু একটু হাসে। অন্ত সকলেও হাসে। কিন্তু সকলেই অবাক হয় ভাওনাথের এই অস্বাভাবিক আচরণে। ভাওনাথ তো এমন ছিল না। গম্ভীর ছিল বটে তবু তার মধ্যে উচ্ছ্বলতাও ছিল।

এরপর অনেকেই অনেক প্রশ্ন করে ভাওনাথকে।

অম্বরবাহাদুর সাধুর মৃত্যুর কারণ জিগ্যেস করে শোক প্রকাশ করে।

ভাওনাথ সমস্ত ব্যাপার খুলে বলে কিন্তু এজন্য একটুও বিষণ্ণ বা বিচলিত দেখা যায় না তাকে। একান্ত স্বাভাবিক অথচ প্রত্যয়ভরা কণ্ঠে বললে—সাধারণ মানুষের জন্ম মৃত্যু অনিবার্য। এর মধ্যে নতুন কিছু নেই। এই মৃত্যু তার নিয়মের ধারাবাহিক রাস্তা ধরে আসবেই। মানুষের শোক দুঃখ বেদনা তাকে আটকে রাখতে পারে না।

ভাওনাথের কথাগুলো কেমন যেন খাপছাড়া অপ্রাকৃত বলে মনে হয় সকলের কাছে। যে সাধুর নাম শুনলে জ্ঞানহারার মত ছুটতো, উচ্ছল উদ্বেল হয়ে উঠতো আর আজ কিনা সে নির্বিকার চিত্তে সাধুর মৃত্যুকে নিয়তির বিধান বলে মেনে নিয়েছে।

সকলেই বিলাসীর দিকে তাকায়।

বিলাসী এর কারণ বুঝতে পারে। একটা ম্লান বিষণ্ণ হাসি দিয়ে বললে—ভাওনাথ ভকত হয়েছে। জপ করে আজকাল।

এর এক ফাঁকে ঘরে গিয়ে জপমালাটা নিয়ে আসে ভাওনাথ। আড়াই ফুট তিন ফুট লম্বা লাল নীল সাদা কালো কাচ কি পাথরের গুলি দিয়ে সুতোয় গাঁথা মালাটা গলাতে গলিয়ে ডানহাতের বুড়ো ও অনামিকা আঙুল দিয়ে বিড়বিড় করতে করতে একটার পর একটা করে করে গুলিগুলো সরিয়ে যায় আর ফাঁকে ফাঁকে কথা কইছে।

সকলেই বুঝতে পারে কথাগুলো 'কথার কথা' অসংলগ্ন, অকেজো, ঠোকা দেওয়া। মন অন্য দিকে।

এরপর সকলেই একটা বিরূপ ধারণা নিয়ে যে যার কাজে চলে যায়। অম্বরবাহাদুর, করুণসিং, মন্তরে, প্রেমপ্রকাশ ও আরো অনেকে ঠিক করেছিল যে স্কুলে ভাওনাথকে ফুলের মালা ও চন্দন দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন করবে। এই সঙ্গে ঐ সময়ে চা ও সামান্য একটু জলযোগের ব্যবস্থাও করবে। অবশ্য চা ও জলযোগের সমস্ত খরচটাই অম্বরবাহাদুর নিজে বহন করবে এইটেই সে ভেবেছিল মনে মনে। কারো কাছে তা প্রকাশ করেনি। ইচ্ছা ছিল সবাইকে অবাক করে দেবে। কিন্তু সমস্ত বাসনা ভেস্তে যায় ওদের। ভাওনাথের ভাবগতিক দেখে এই প্রস্তাবের কোন প্রশ্নই জাগে না মনে।

দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে কিন্তু ভাওনাথের কোন পরিবর্তন দেখা যায় না। অনেকের ধারণা এমনি করে আস্তে আস্তে লোকটা হয়ত পাগল হয়ে যাবে। বিলাসীর মনে কিন্তু এ-ধারণা জন্ম নেয়নি কারণ সে নিশ্চিত জানে যে ভাওনাথের মন মুক্তি চায়। তবে তার বিশ্বাস ছিল যে ভাওনাথের পরিবর্তন হবে। দুই বছর জেলে নির্জনে থেকে চিন্তা করতে করতে এদিককার সব ভুলে গেছে হয়ত। আস্তে আস্তে সব মনে পড়বে, চোখে দেখতে পাবে তখন আবার যে ভাওনাথ সেই ভাওনাথ হয়ে উঠবে। কিন্তু ছয় মাস কেটে গেল তবু বাগানের কোন কিছুই যেন তার চোখে ধরা পড়লো না। লোকে তাকে পাগল বলে বিলাসী সহ্য করতে পারে না তা।

একদিন বিলাসী ভাওনাথকে বললে—তোকের আদমিলোক পাগলা বোলথে, মোকের ঠিক নেই লাগোথে। হয়ত আরো কিছু বলতো বিলাসী কিন্তু ভাওনাথ সেই সুযোগ আর দেয়নি তাকে। সে হো হো করে হেসে ওঠে। এই হাসিতে চমকে ওঠে বিলাসী। মনে হয় সত্যিই কি পাগল হলো তাহলে।

ভাওনাথ বললে—পাগল মনে করা তো ভাল। এতে ক্ষতি কি আছে? আমার মত পাগল সবাই হোক তাহলে দেখতে পাবে

সারা জগতটার রূপ পালটে গেছে। তবে শোন বলি আজ। জেনে আমিও প্রথম প্রথম একজন বৌদ্ধভিক্ষুকে চোর বলে ভেবেছিলাম। তারপর সেই চোর একদিন আমাকেই চুরি করলো। জপমালাটা উঁচিয়ে বললে—তারই সেই চুরির মন্ত্র এই মালার মধ্যে আছে। সে যেমন আমাকে চুরি করেছে আমিও যদি সেই রকম এদের পাগল করতে পারি তাহলে সেখানেই আমার স্বার্থকতা।

এরপর একটুক্ষণ কি ভেবে বৌদ্ধভিক্ষুর কাহিনী বলতে থাকে ভাওনাথ। বিলাসী দেখতে পায় ভাওনাথের চোখ ও মন অন্য কোথাও বিচরণ করছে। এই দৃশ্য বিলাসী দেখেনি কোনদিন, কল্পনাও করতে পারে না। সে যেন সমস্ত জগত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তারপর কাহিনী বলতে বলতে এক ফাঁকে বলে—জানো কি মা, মাঝে মাঝে মনে হয় আমিও ঐ বৌদ্ধভিক্ষুর মত একজন পরম চোর হই, লুপ্ত ধনের মধ্যে ডুবে থাকি। ভিক্ষুর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই একটা অসহনীয় বেদনা আমার সমস্ত মনটাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। হয়ত এই বেদনাকে কাটিয়ে উঠতে পারতাম কিন্তু এর মধ্যে একটা আকাঙ্ক্ষা আছে যা আমাকে পরমুহূর্তেই অন্য এক প্রত্যয়ের স্বাদ এনে দেয়। দেখতে পাই একই রঙের মধ্যে অনেক বিচিত্র রঙ, একই ছায়ার মধ্যে অনেক ছায়া। কী সে রঙ, কী সে ছায়া আমি তা কল্পনা করতে পারি, ভাবতে পারি, দেখতে পাই কিন্তু ব্যক্ত করতে পারিনে। কী এক অনির্বচনীয় আনন্দ সমাবেশ। এই আকাশ পাহাড়, জল, মাটি, ঘাস সব নিয়েই শুধু একটা প্রকৃতিতে প্রকটমান। মাঝে মাঝে মনে হয় সব ছেড়ে বেরিয়ে পড়ি। কি হবে এই সব করে যখন শোক দুঃখ জরা মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাব না।

বিলাসী বললে—শোক দুঃখ জরা মৃত্যুর হাত থেকে কি কেউ কোনদিন রেহাই পেয়েছে? আমার তো মনে হয় কেউ কোনদিন পায় নি, পারবেও না। কারণ সমস্ত সৃষ্টিই নিয়মের বন্ধনে। এই নিয়মের বন্ধনেই সমগ্রতা। এই নিয়ম বা বন্ধন থেকে বিচ্ছিন্ন হলে মূল ঐক্য হারিয়ে যাবে, একটা বিরোধের সৃষ্টি হবে। একসঙ্গে সমগ্রকে দেখতে পাওয়া যায় না। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে।

খণ্ড খণ্ড করে দেখতেই অখণ্ডের সমস্ত রূপটা পরিষ্কার ও পরিপূর্ণ ভাবে দেখতে পাওয়া যায়।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমি যা দেখতে পাই তা যেন অনেক বড়, অনেক আনন্দের। মনে হয় আমি তখন মুক্ত।

বিলাসী প্রতিবাদ করে বললে—না, তুমি যাকে আনন্দ বলছ, মুক্তি বলছ তা আনন্দ বা মুক্তির কোনটাই নয়। এই আনন্দ বা মুক্তির মধ্যে জীবন নেই, আছে শুধু স্বার্থপরতা। আর মানুষ যদি এই আনন্দ বা মুক্তি চায় তাহলে তার বেঁচে থাকবার কি প্রয়োজন আছে বল। আমার তো মনে হয় এখানেই তুমি সমগ্রতা বা অখণ্ডতা থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়ছ। এই সমগ্রকে পেতে হলে কর্মের মধ্য দিয়েই পেতে হবে তোমাকে। কারণ আনন্দের স্বভাবই হচ্ছে ক্রিয়া। আনন্দ সব সময়েই নিজেকে বিচিত্র ভাব ও প্রকাশের মধ্যে মুক্তিদান করে।

ভাওনাথ বললে—কর্ম তো বন্ধন!

কর্ম যেমন বন্ধন তেমনি মুক্তি। কর্মের লক্ষ্য যখন স্বার্থ তখন কর্ম বন্ধন আবার যখন নিষ্কাম নিস্বার্থ তখন তা মুক্তি।

ভাওনাথ জিগ্যেস করে—তাহলে তুমি কি বলতে চাও আমি যা দেখি তাতে সত্য আনন্দ বা মুক্তির কিছু নেই। কিন্তু আমি যে আনন্দ পাই এতে।

এই আনন্দের ব্যাপ্তি বা অখণ্ডতা নেই। এই আনন্দ শুধু তোমারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। একে আনন্দ বলে না। এটা সুখ। সুখ তো শুধু নিজের কিন্তু কল্যাণ জিনিসটি জগতের। তাই এই কল্যাণের মধ্যে জগত আছে, অখণ্ডতা আছে। একেই যথার্থ আনন্দ বলে। এই আনন্দ তুমি পাবে কর্মের মধ্য দিয়ে, জগতের কল্যাণ সাধন করে।

বিলাসীর কথাতে দ্বন্দ্ব, সংশয় ও চিন্তার মধ্যে তলিয়ে পড়ে ভাওনাথ। জপের মালা থেকে হাতটা খসে পড়ে তার। মালাটা বুকের সঙ্গে স্থির হয়ে মিশে থাকে। অল্পক্ষণ কি একটু ভেবে বললো—স্বার্থ ছাড়া কি জগতে কিছু আছে? এই যে আমরা কাজ করি, খাই দাই এর মধ্যেও তো স্বার্থ আছে।

বিলাসী বললে—বেঁচে থাকাই তো ধর্ম, এতেই তো আনন্দ। কাজ করছ তা থেকেই তোমার খাওয়াপরা আসছে আর এই খাওয়া পরার মধ্যেই আনন্দ।

ভাওনাথ বললে—তাহলে কি তুমি বলতে চাও যে মুক্তি বলে কিছু নেই।

আমার তো মনে হয় তাই। কারণ অখণ্ডতার সমাপ্তি নেই। খণ্ড খণ্ড জীবনের মধ্যেই অখণ্ডের রূপ। পাখিগুলো উড়ে যায় উর্ধ্বে, উর্ধ্বে, আরো উর্ধ্বে। মনে করে আকাশ স্পর্শ করবে। কিন্তু পারে কি তা? তবু এই উড়ে যাওয়াই তাদের কাজ এবং তাতেই তাদের আনন্দ। মানুষও তো তেমনি কাজ করে যাবে তাতেই তার আনন্দ।

বিলাসীর কথা শুনতে শুনতে কখন যে ভাওনাথ তার গলা থেকে মালাটা খুলে ফেলেছে তা টের পায়নি সে। মালাটা ঘরের মেঝের ওপরে মরা সাপ বদড়ির মত পড়ে রয়েছে।

বিলাসী বললে—এছাড়া স্বধর্ম ত্যাগ করে পরধর্মে যাওয়া কি ভাল? আমার তো মনে হয় পরধর্মে যাওয়া মানেই নিজেকে অনেকখানি পিছনে ঠেলে ফেলে দেওয়া।

ভাওনাথের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছুটো পাখি। পাখি ছুটো উড়ে যাচ্ছে পরস্পরের বিপরিত দিকে। একটা যাচ্ছে বাতাসের অনুকুলে আর অপরটি প্রতিকুলে। যেটি বাতাসের অনুকুলে যাচ্ছে সে অনেকদূর চলে গেছে আর প্রতিকুলেরটি বাতাসের ঘাতে প্রতিঘাতে অনেক পিছিয়ে পড়ছে। প্রতিকুলযাত্রী পাখিটির প্রতি করুণা হয় ভাওনাথের। মনে করে পাখিটি অজ্ঞান তাই সে বাতাসের প্রতিকুলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও ঐ বাতাসের প্রতিকুলযাত্রী অজ্ঞান পাখিটি বলে মনে করে। দেখা যায় সমাজ মাটি মানুষ ছেড়ে কোথায় চলেছে সে। কোন ধর্মেরই কোণ একচেটিয়া কিছু নেই। নির্বাণ বা মুক্তি বলে যদি কিছু থাকে তাহলে তাদের আদিবাসীরও আছে। তাহলে অন্য ধর্মের মাধ্যমে খুঁজে বেড়াবে কেন তা? হঠাৎ অস্ফুটস্বরে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে—এগিয়ে চল আপন পথে, জানাচেনা পথে।

ভাওনাথের পরিবর্তন লক্ষ্য করে মনে মনে খুব খুশী হয় বিলাসী। এতদিন সময় ও সুযোগের অপেক্ষাই করছিল সে। অনেক সুচিন্তিত প্রামাণ্য উদাহরণ ঠিক করে রেখেছিল বিলাসী কিন্তু অল্পতেই ভাওনাথের পরিবর্তন হওয়ায় আনন্দ আতিশয্যে সব তালগোল পাকিয়ে যায়। অন্ধকার মনে হাতড়িয়ে বেড়ায়। কিছুই মনে আসে না। মনে করে আরো কিছু অকাট্য প্রমাণ দেখানো উচিত। অনেক চিন্তা করে, মনের পটে অনেক অতীত ছবি ভেসে ওঠে। শেষে অতীতকে ডিঙিয়ে বর্তমানে তারপর ভবিষ্যতে এসে পড়ে। কবে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ হয়েছিল তা সে জানে না, তার বাপ ঠাকুরদাও জানতো না তবু যেন সেই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এখনো চলছে। হঠাৎ মনে পড়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের কথা। সে ভাওনাথের দিকে তার চোখ দুটো আরো গাঢ় ও তীব্র করে বললে—তোমার বোধ হয় মনে আছে তুমিই একদিন আমাকে বলেছিলে—শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন, কর্মই ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ যদি অর্জুনকে এই কর্মযোগতত্ত্ব বুঝিয়ে না দিতেন তাহলে হয়ত অর্জুন সব ছেড়ে ফেলে বনে গিয়ে বাস করতেন। আর এ না হলে কখনই ধর্মরাজ্য ও সমাজ স্থাপনের কোনই প্রশ্ন ওঠে না।

স্কুলের কাজ চলছে যথারীতি। কেউ আর ভাওনাথকে তাদের মধ্যে আশা করে না। ভাওনাথকে স্কুল থেকে হারানোতে দুঃখ-প্রকাশ করে—সভা হয়। সভা আহ্বান করে কোলা। বিলাসী, পদমমায়া, মদনফুল, করুণসিং ও অম্বরবাহাদুর খুব দুঃখ পায় মনে। অম্বরবাহাদুর বললে—যাকে নিয়ে আজ আমরা আনন্দ-সভা করবো ভেবেছিলাম আর তাকে নিয়েই দুঃখপ্রকাশ সভা করছি এ যে কত যন্ত্রণাদায়ক তা কি একবার ভেবে দেখেছ তোমরা।

কোলা বললে—ভাওনাথকে হারানো দুঃখের বটে তবে সে যে পথে যাচ্ছে তা আমাদের পথের চেয়ে অনেক বড়। এজন্য তাকে অভিনন্দন জানান কর্তব্য কারণ সে আমাদেরই একজন। তবে ভাওনাথ যে মোড় ঘুরবে এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিল বিলাসী,

করুণসিং, পদমমায়া ও মদনফুল। তা হলেও দিন যত কাটে ওদের দৃঢ়তাও শিথিল হতে থাকে। মনে সংশয়, সন্দেহ এসে বাসা বাঁধে। কোলার উৎসাহ বেড়ে গেছে। ভাওনাথের অভাবের কথা উঠলেই সে বলে ওঠে—আরে, আসম থাকলে কি রাজার আসন খালি থাকে? সর্দার রয়েছে, আমি আছি, অভাব কিসের?

ভাওনাথ বড় একটা কথা বলে না কারো সঙ্গে। অনেক কথার জবাব শুধু একটা হাঁ, না অথবা অল্প একটু মৃদু শান্ত হাসি দিয়েই শেষ করে। কোলা মাঝে মাঝে তার কাছে আসে। যদিও নির্বাণ বা মুক্তি সম্বন্ধে তার নিজের কোন ধারণা নেই তবু বলে—তোয় ঠিকই করলেক ভাওনাথ। আমরা পাপের বোঝা বয়েই চলছি। আমাদের মত পাপীকে কি জিতবাহন তোমার মত মতিগতি দেবেন? তাঁকে কি দেখতে পাব কোনদিন?

ভাওনাথ কোলার মনোভাব বুঝতে পারে। একই কথার পুনরুক্তি করে রোজ। ভাওনাথ জবাব দেয় না। কিন্তু শেষে একদিন নিরাসক্ত দৃষ্টি মেলে একটু হেসে জবাব দেয়—কেন পাবে না। তিনি তো তোমার দিকে চেয়েই আছেন। তুমি তাকাও না তাই দেখতে পাও না।

এরপর হঠাৎ একদিন ভাওনাথকে স্কুলে দেখতে পেয়ে সকলেই অবাক হয়। একটা মুহূর্তের মধ্যে স্কুলের সমস্ত হৈ-হল্লা থেমে যায়। খানিকক্ষণ নীরব চোখ চাওয়াচাওয়ি, সংশয়, সন্দেহ ও দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটে সকলের। পদমমায়া, বিলাসী, মদনফুল ও করুণসিং হাসছে। অম্বরবাহাদুরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কোলা সামনে বসে ভ্রূ কুঁচকে কি যেন ভাবছে সেদিকে অনেকেরই লক্ষ্য নেই। করুণসিং ডান চোখটা বাঁকা করে মৃদু হেসে মদনফুলের দিকে তাকায়। এক ফাঁকে অম্বরবাহাদুর উঠে যায় ভাওনাথের কাছে। জড়িয়ে ধরে তাকে। অম্বরবাহাদুর এত জোরে চেপে ধরে ভাওনাথকে যে ভাওনাথ না হেসে থাকতে পারেনি। সে হাসতে হাসতে বলে—তিমি মেরো মরাই দিনছ হালা।

ভাওনাথ স্কুলে এসেছে এই সংবাদ অম্বরবাহাদুরের মেয়ে গিয়ে

তার মাকে বলে। একটুক্ষণ বাদেই মা ও মেয়ে স্কুলে আসে। তাদের হাত ভরতি ফুল।

অম্বরবাহাদুর তার মেয়েকে বললে—মালা করেরে লে আমু। সেদিন দুঃখপ্রকাশ করে সভা করেছি আজ আনন্দসভা হোক্।

অম্বরবাহাদুরের কথায় আনন্দ ও হাসিতে অনেকের জোড়া ঠোঁট খুলে যায়।

ভাওনাথ বললে—তোমরা তো দেখছি স্কুলের অনেক উন্নতি করেছ সর্দার। দুটো আলমারি করেছ, ব্লাক বোর্ড, ম্যাপ কিনেছ। পড়ুয়ারা কি জানি আজকাল অনেক কিছু শিখেছে। এই বলেই সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে নেয়। বলে—চোখ মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে। এরপর এক ফাঁকে কোলার দিকে চেয়ে বললে—তুমি আমাদের মধ্যে আসবে তা আমি জানতাম কোলা।

এতক্ষণে কোলার মুখে হাসি দেখা গেল। সে হেসে বললে—তুমি কি করে জানতে ?

ভাওনাথ বললে—তোমার আর আমার মন যে এক তাই না তোমাকে প্রথম দর্শনেই অত ভালবেসে ছিলাম।

বিলাসী বললে—শুধুই কি আসা ? কোলা অনেক কিছু করেছে স্কুলের জন্য।

কোলা হেসে বললে—তুমি আনতে পারনি ভাওনাথ। আমাকে টেনে এনেছে মদন।

আরো অনেক কথাবার্তার পর অম্বরবাহাদুর বললে—কালই তোমার চুল আর দাঁড়ি কেটে ফেলবে ভাওনাথ। তোমার ঐ চুল আর দাঁড়ির মধ্যে যেন একটা ভয়ঙ্কর কিছু আছে বলে মনে হয়।

পাঁচ

১৯২৬ সাল।

হঠাৎ ডুয়ার্সের পাহাড় অঞ্চলের সমস্ত আকাশে আলো ঝলমল করে ওঠে। দূর পাহাড় ঠেলে সূর্য উঠেছে। অল্প অল্প আভা দেখা যাচ্ছে তার। নতুন আর একটা অজ্ঞাত জগতের খবর নিয়ে আসছে সূর্য। এ শুধু চোখের দেখা, শব্দ কিংবা কথা নেই। এই পৃথিবীটা এতক্ষণ নিশ্চিন্তে নিরিবিলি ঘুমচ্ছিল। হঠাৎ হাওয়া আসে। সমস্ত পৃথিবীটাকে চাদরে মুড়ে হাওয়া আসে। এই হাওয়া নতুন জগতের শব্দ বা কথা নিয়ে আসে। নিয়ে আসে স্পর্শবোধ। সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো গরম হয়ে ওঠে।

সূর্য আসে বটে কিন্তু পৃথিবীটাকে দু'খণ্ডে বিভক্ত করে আসে। এর একদিনে ভয়, অন্য দিকে সাহস, একদিকে অন্ধকার বা রাত্রি অন্য দিকে দিন বা আলো। অন্ধকারের লোকগুলো ভয়ে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যায় আর দিনের লোকগুলো হাসতে হাসতে এগিয়ে যায়।

এর মধ্যে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ও ধর্মঘটের খবর এসে পৌঁছে বাগানগুলোতে। সরকার ও চা বাগানের কর্তৃপক্ষ থেকে বাগানের পরিচালকমণ্ডলীর কাছে সর্তক থাকার জন্য খবর আসে। এ-সংবাদে পরিচালকগণ কেঁপে ওঠেন। ক্লাবে ক্লাবে এ-নিয়ে অনেক আলাপ আলোচনা চলে। ভিতরে ভিতরে এর প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট হন। এ-নিয়ে আর বেশি দিন মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয়নি পরিচালকমণ্ডলীর। সরকার পক্ষই এর সমাধান করে দেন। এই থেকেই শুরু হয় ভেদনীতি। জাতে জাতে বিরোধসৃষ্টি করে দিতে থাকেন বাগানের সাহেব বাবুরা।

দলমাননগরেও এই ভেদনীতির হাওয়া আসে। আজকাল

কোন জাতি বড় কোন জাতি ছোট এ-নিয়ে প্রাই আলোচনা করতে শোনা যায়। ভাওনাথ, বিলাসী, পদমমায়া, অম্বরবাহাদুর ও করুণসিং অনেকটা দমে যায় মনে মনে। মনে করে হয়ত শীঘ্রই এর প্রতিক্রীয়া শুরু হবে।

অম্বরবাহাদুর ভাওনাথকে বলে—কি জানি আমাদের কি পরিণাম ?

ভাওনাথ সান্ত্বনার সুরে বললে—অনেক ঝড়ই গেল আমাদের ওপর দিয়ে, ভয় কি, এটাও কেটে যাবে নিশ্চয়।

মদনফুলের কোন ভয় ভীতি নেই। হয়ত সেটা তার বয়স বা স্বভাবসুলভ। সে বললে—আমরা এগিয়ে চলবো তাতে যাই আসুক না কেন তার জন্য ভয় খাবো কেন।

করুণসিং বললে—তোমার বয়স কম তাই এ-কথা বলছ।

দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলে ওঠে মদনফুল ভয় তো মনের, আত্মার নয়।

মদনফুলের মুখে এমন একটা কথা শুনতে পাবে তা আশা করেনি ভাওনাথ। সে খুশি হয়ে বললে—সত্যি কথা বলেছ মদন, ভয় মনের, আত্মার নয়। মনটা ক্ষুদ্র বোধের মধ্যে ঘুরপাক খায় আর আত্মা সমস্ত বোধের ওপরে। মনটা বোধকে হজম করতে পারে না, তার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ কিন্তু আত্মা হজম করতে পারে তাই সে তোয়াক্কা করে না কারো।

বিলাসী বললে—একবার যখন হাওয়া বইছে তখন তার স্পর্শ, গন্ধ মনে রূপ দেবেই। এজন্য চিন্তার কিছু নেই।

ভাওনাথ বললে—এক দলা মাটিকে গুঁড়িয়ে একটা পরমাণু করা যায় বটে—কিন্তু সেই পরমাণু ও মাটি তার মধ্যেও মাটির সমগ্রতা আছে এবং আবার সে মাটির সঙ্গে মিশবে। আমাদের এই শ্রমিকজাতির বেলাতেও তাই। একে খণ্ড বিখণ্ড করলেও সে শ্রমিকই থাকবে, আবার সে শ্রমিকের সঙ্গে মিলবে। যে নিজে সমগ্র তাকে নিশ্চয়ই সমগ্রতার মধ্যে আসতেই হবে।

অল্পদিনের মধ্যেই ভেদনীতির প্রচারকার্য প্রবলতর ভাবে চলতে থাকে। এই সুযোগে নেপালী উপাধ্যায় আর আদিবাসী বৈগা

সম্প্রাদায়ও এই প্রচারকার্যকে সমর্থন করে জোর দেন। সমস্ত চা বাগানগুলোতে স্পর্শদোষবোধ প্রকটভাবে দেখা দেয়। নেপালী ও আদিবাসীর সৌহৃদ্যতা আরো শিথিল হয়ে ওঠে। মনে মনে বিরোধের সৃষ্টি হয়। বাগানের মেলাতে, রাস্তাঘাটে, সর্বত্রই এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে এড়িয়ে চলে যাতে স্পর্শ না লাগে। দলমাননগরের বাগানেও এই দোষ দেখা দেয়। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরাও আস্তে আস্তে দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে বসে পাহাড়ী নেপালীরা আর অন্য দিকে আদিবাসী। জলের কলের ব্যাপারেও তাই। আদিবাসীর কেউ কল থেকে জল নিয়ে গেলে নেপালীরা মুখটা বিকৃত করে। তারপর কলটাকে পুর্ণ স্নান করিয়ে জল তোলে।

ভাওনাথ, বিলাসী, অম্বরবাহাদুর সকলেই প্রমাদ গোনে। চিন্তা করে কি করে এই স্পর্শদোষবোধটা শ্রমিকদের মন থেকে দুর করা যায়।

ভাওনাথ বললে—বাগানের সকলকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে স্পর্শদোষ বা জাতিবিচার প্রত্যেক মানবজাতীর উন্নতির অন্তরায়। আগামীকাল স্কুলে পড়ুয়াদের নিয়ে এ-বিষয়ের আলোচনা করা যাক। তোমরা সকলে যে যার মত এই জাতিবিচার ও স্পর্শদোষের বিরোধিতা করবে উপযুক্ত প্রমাণ, উদাহরণ ও যৌক্তিকতার দ্বারা। তবে এর আগে একটা কমিটি গঠন করা দরকার।

ভাওনাথের এই পরামর্শ সকলেই মেনে নেয়।

বিলাসী বললে—আমার মনে হয় কোলাকে সভাপতি করলে বেশি ফল পাব আমরা।

অম্বরবাহাদুর বললে—তাহলে তো কোলাকে খবর দেওয়া উচিত।

ভাওনাথ বললে—প্রয়োজন নেই। এটা যে আমাদের পুর্ব পরিকল্পিত বিষয় তা জানতে না দেওয়াই ভাল। জানতে পারলে হয়ত মনে করবে এর মধ্যে একটা কিছু কারসাজি আছে আমাদের। আর এ-ছাড়া সম্ভবত গর্ব ও আনন্দের আবেগে বাগানের সর্বত্র বলে বেড়াবে। এতে অনেক বিপদ। সাহেব, বাবুদের কানে

গেলেই তাঁদের চর এসে হাজির হবে স্কুলে। কোন পড়ুয়াকেও এ-সম্বন্ধে ঘুণাক্ষরে কিছু বলবে না।

পরদিন সন্ধ্যায় সকল পড়ুয়াই স্কুলে আসে। কোলাও এসেছে। সে উপস্থিত হতেই ভাওনাথ তাকে ডেকে নিয়ে বাইরে যায়। অম্বরবাহাত্বরও ওদের সঙ্গে আছে। ভাওনাথ কোলাকে বলে স্কুল সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে কতকগুলি জরুরি পরামর্শ আছে। এই পরামর্শ প্রথমটা আমাদের ঘরোরা ব্যাপারের মত তোমার, আমার আর সর্দারের মধ্যেই হওয়া প্রয়োজন তারপর আমরা তিনজনে এক মত হলে সমস্ত পড়ুয়াদের কাছে উত্থাপন করবো।

মেঘমুক্ত নির্মল আকাশ। চাঁদ উঠেছে। সন্ধ্যার সমস্ত নীরবতা, ভয়ঙ্করতা মুহূর্তের মধ্যে কেটে গিয়ে একটা সঙ্গীতময় সুরের ঢেউ তুলে তালে তালে ছুটে চলেছে। জ্যোৎস্নার আলোতে কোলার সমস্ত মুখখানি একটা আবেগময় উষ্ণতার উদ্‌বেলিত হাসির আভায় ভরে ওঠে। তৃপ্তকণ্ঠে জিগ্যেস করে—কা বাদ আহে ?

ভাওনাথ বললে—স্কুলটা তো দেখছি এখন বেশ ভাল ভাবেই জমেছে। আমার অবর্তমানে তুমি, সর্দার, মদনফুল অনেক কিছু উন্নতি করেছ্ স্কুলের। সর্দার ও মদনফুল বলে তুমি স্কুলে যোগ না দিলে নাকি এতটা হতো না, হয়ত ভেঙেই যেত একেবারে। আমার মনে হয় স্কুলের কার্য পরিচালনার জন্য এখন আমাদের একটা কমিটি গঠন করা একান্ত প্রয়োজন। এতে একজন সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এবং চার পাঁচ জন কমিটি মেম্বার প্রয়োজন। আমার মনে হয় আমরা আজই একটা মিটিং করে কমিটির সদস্য ও কর্মসচীব নির্বাচন করি।

অম্বরবাহাত্বর এমন একটা ভান করে মুখের যে সে যেন কিছুই জানে না। সে কোলার দিকে চেয়ে বললে—এ কোরা ঠিকই ছ কোলা। এওড়া কমিটি কা জরুর কাম ছ।

হঠাৎ আকাশের গায়ে একখণ্ড মেঘ দেখা দেয়। চাঁদটাকে মেঘ গ্রাস করে। কোলার উজ্জ্বল মুখেও কালির অন্ধকার একটা

ছাপ পড়ে। একটু গম্ভীরও হয়ে ওঠে। মনে হয় তার মনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে, বুকটা কাঁপছে দুর দুর করে।

ভাওনাথ অম্বরবাহাদুরকে বললে—আমার ইচ্ছে কোলাকেই সভাপতি করা। তোমার কি মত সর্দার?

অম্বরবাহাদুর বললে—আমাদের মধ্যে কোলাই উপযুক্ত। ঠিকই বলেছ তুমি।

মেঘ কেটে যায়। আবার চাঁদ ওঠে। কোলার মুখখানা স্বাভাবিক হয়েছে। কোলা হেসে বললে—সভাপতি ভাওনাথ হলেই ভাল হয়। কথা কটি বলে কেমন নিজেকেই নিজে অপরাধী মনে করে কোলা।

অম্বরবাহাদুর ও ভাওনাথ কোলার মনোভাব টের পেয়ে বাধা দিয়ে বললে—না, না; তুমিই একমাত্র উপযুক্ত লোক। এ-কাজ তোমার ছাড়া অপরকে দিয়ে চলতে পারে না।

অম্বরবাহাদুর বললে—প্রয়োজন মত ভাওনাথ পরামর্শ দেবে তোমাকে। আমরা সবাই তো রয়েছি, তোমার ভয় কি?

এরপর স্কুল ঘরে মিটিং বসে। ভাওনাথ ঘরে ঢুকেই সমস্ত পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে বললে—এতদিনে আমাদের স্কুলটা অনেকটা কায়েমি হয়ে উঠেছে। এখন এই স্কুলের পরিচালনার জন্য একটা কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। তোমরা সকলেই জান একজনের মগজের চেয়ে দশজনের দশরকম মগজে অনেক বেশি নতুন নতুন ভিন্নধারার চিন্তা আছে। দশজনের চিন্তা, বিদ্যা বুদ্ধি একসঙ্গে করলে যে কোন কাজের ওজন বাড়ে তাই আজকার এই মিটিং পরিচালনার জন্য আমি কোলাকে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করি।

অম্বরবাহাদুর সমর্থন করে।

সকলেই চোখ চাওয়াচাওয়ি করে। বিস্মিত হয়। ভাওনাথ থাকতে কোলা কেন সভাপতির আসন গ্রহণ করবে। দু'চারজন ফিসফিস করে নানাপ্রকার মন্তব্য করতে থাকে। গুঞ্জনটা ক্রমান্বয়ে দ্রুত ও উচ্চতর হতে শুরু করে। বিলাসী, পদমমায়া, মদনকুল ও করুণসিং সকলকেই শান্ত ধীর গলায় এর কারণ বুঝিয়ে দেয়।

ভাওনাথ বললে—স্কুলের কার্যপরিচালনার জন্য আমরা আজ যে কমিটি গঠন করবো আমার মনে হয় এবং আমি প্রস্তাব করি যে কোলাকেই এই কমিটির সভাপতি করা হয় আর অম্বরবাহাদুরকে কোষাধ্যক্ষ, ও করুণসিংকে সম্পাদক।

ভাওনাথের এই প্রস্তাবে প্রেমপ্রকাশ ও মন্তরে প্রতিবাদ করে দাঁড়িয়ে। একটা হট্টগোলের সম্ভাবনা দেখা দেয়। ভাওনাথ বললে—এক এক জন করে বল। আচ্ছা, প্রেমপ্রকাশ তোমার কথাই আগে শুনি।

প্রেমপ্রকাশ বললে—সব বুঝলাম। কিন্তু যেটি বামন সেইটিই উপোস। ভাওনাথ কেউ নয়?

প্রেমপ্রকাশের কথা শেষ হতেই মন্তরে দাঁড়িয়ে বললে—আমিও ঐ কথাই জিগ্যেস করি। ভাওনাথ বিলাসী মদনফুল এরা না থাকলে কখনই স্কুল টিকবে না।

এরপর আরো অনেকে প্রতিবাদ করে।

অম্বরবাহাদুর বললে—আচ্ছা, তোমরা চুপ কর। মিটিংটা শেষ হতে দাও তারপর এ বিষয় বিবেচনা করা যাবে।

আবার বলতে শুরু করে ভাওনাথ। এই কমিটির পরিচালক মণ্ডলীকে পরিচালনার কাজে সহায়তা করার জন্য কয়েকজন সদস্যের প্রয়োজন। বিলাসী, মদনফুল, প্রেমপ্রকাশ, মন্তরে পদমমায়া আর সুরজনকেই আমি উপযুক্ত বলে মনে করি।

ভাওনাথের সমস্ত প্রস্তাবগুলিই এক এক করে সমর্থিত হয়।

সুরজন বললে—সবই তো হলো। কিন্তু ভাওনাথের কথা তো উঠলোই না।

চারদিক থেকে আবার গুঞ্জন ওঠে। ঠিক হলো না, মাথা না থাকলে মুড়ো ছাঁটা গাছ কি বাড়বে।

বিলাসী এতক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে এই কথাই ভাবছিল। এবারে দাঁড়িয়ে বললে—আমার মনে হয় ভাওনাথকে কমিটির প্রধান উপদেষ্টার পদ দেওয়া উচিত।

উপস্থিত সকলেই এ বিষয়ের একটা সমাধান চিন্তা করছিল। হঠাৎ বিলাসীর এই প্রস্তাবে সমস্ত স্কুলটা স্বাভাবিক রূপ ধারণ করে।

[illegible]হাদুর, কোলা, করুণসিং, মদনকুল আরো অনেকে চেঁচিয়ে উঠে বললে—ঠিক বলেছে বিলাসী।

এরপর সমস্ত প্রশ্ন বা প্রতিবাদের সমাধান হয়ে যায়। ভাওনাথ সকলকে কমিটির উপকারিতা বুঝিয়ে দেয়। কমিটি বা সমিতি এইরকম একটা কিছু না থাকলে কখনও কোন জাতি বা দেশ উন্নতি করতে পারে না। চোখের সামনেই এর বহু দৃষ্টান্ত দেখতে পাই আমরা। সাহেবেরা গঠন করেছেন ক্লাব। সেখানে তাঁদের সুখ দুঃখ বেদনার কথা হয়। জাতি বা দেশের উন্নতি সাধনের জন্য শপথ করে। এছাড়া তাঁরা গড়ে তুলেছেন বিরাট প্রতিষ্ঠান। যাকে 'ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসন' বলা হয়। আমাদেরও আস্তে আস্তে ঐরকম একটা কিছু গড়ে তুলতে হবে। তা না হলে জাতির উন্নতি কোনদিনই হবে না। এইজন্যই না দেশের সমস্ত বড় বড় মাথাওলা লোকগুলো 'জাতীয় কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এঁদের দেখেই আমাদের শিখতে হবে, এঁদেরই পথ অবলম্বন করে চলতে হবে তবেই আমাদের উন্নতি অনিবার্য। তা না হলে নিলয়গামী হতে হবে। এই যে ভেদনীতির ধোঁয়া তুলেছেন সরকার আর কারখানার মালিকরা এর মূলে আছে তাঁদের স্বার্থ আর আমাদের ধ্বংস। আমরা যাতে আমাদের শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য কোনরূপ উন্নতিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে না পারি তার জন্যই সরকার ও কারখানার কর্তৃপক্ষদের এই ভেদনীতির প্রচেষ্টা। এই ভেদনীতি মানুষের মনকে এক করে না, পৃথক করে, তাই বলছি সরকার ও কারখানার মালিকদের এই ভেদনীতিকে সত্য বা ধর্ম বলে যদি মেনে নেই তাহলে আমাদের পক্ষে পরম ক্ষতিকর হবে। কর্ম পৃথক হতে পারে কিন্তু ধর্ম এক। মানুষও তাই। আর এই মানুষের জন্ম থেকেই ধর্মের জন্ম। মানুষ না থাকলে ধর্ম কোথায়? তাই আমি বলবো মানুষই ধর্ম, ধর্মই মানুষ।

কোলা বললে—ঠিকই বলেছে ভাওনাথ। ধর্ম আর মানুষ এক। প্রতিটি মানুষকে মানুষ বলে নিজের করে না নিতে পারলে ধর্ম নেই।

বিলাসী মনে মনে অনেক কিছু ভাবছিল এতক্ষণ। এবারে

দাঁড়িয়ে বললে—মানুষের মধ্যে যেমন একটা বিরাটত্ব আছে তেমনি ধর্মের মধ্যেও আছে তাই মানুষকে ছোট করে দেখলে বা নিজের থেকে পৃথক করে দেখলে ধর্মকে ক্ষুণ্ণ বা ক্ষীণ করা হয়। ধর্ম বলতে আমরা বুঝি কল্যাণ। জীবনের মূল্য শুধু বেঁচে থাকায় নয়, কল্যাণপুত কর্মে। কল্যাণ আত্মকেন্দ্রিক নয়—কল্যাণের মধ্যে আছে সমগ্র মানবগোষ্ঠী, বৃহত্তম একটা কিছু যা সমস্ত মানবের চিরস্থায়ী শুভ-সাধন। তাই আমি মনে করি সরকার মালিকের এই ধোঁয়াতে আমরা যদি সাড়া দেই তাহলে আমরা কল্যাণ ভুলে যাব। এ ধর্ম নয়, কল্যাণ নয়; এ অধর্ম, অকল্যাণ যা মানুষকে পাপ-পথে নিয়ে যায়।

করুণসিং বললে—আমি তো দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যতটুকু এগিয়েছিলাম এই ধোঁয়াতে এর মধ্যেই তার চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে গিয়েছি। কাজের মেলাতে গোলমাল, জলের কলে গোলমাল এমন কি স্কুলঘরেও এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। আমরা নির্বোধ, বোকা বর্বর তাই যে যা বলে তাকেই সত্য বা ধর্ম বলে মনে করি কিন্তু প্রকৃত ধর্ম বা জাতি যে কি তা জানিনে, জানতে চেষ্টাও করি না। একটা কিছু ধোঁয়া হলেই পাখাওলা উঁইয়ের মত মাটি ছেড়ে দলে দলে উড়ে যাই মোহমায়ারূপী আলো বা আগুনের দিকে। তারপর জ্বলেপুড়ে মরি।

মদনফুল বললে—ঠিকই বলেছে করুণসিং। আমরা অনেক পিছিয়ে যাচ্ছি। যে একাত্মবোধের জন্ম নিয়েছিল আমাদের মধ্যে তার যেন মৃত্যু হচ্ছে প্রতিদিন। প্রতিদিনই আমি দেখতে পাচ্ছি নেপালী পাহাড়ী আদিবাসী সকলেই যেন তিল তিল করে পরস্পরের থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে। একাত্মবোধে আমাদের মধ্যে যে শক্তির জন্ম নিচ্ছিল তাও মরে যাচ্ছে। আমরা ভুলে যাচ্ছি সম্মিলিত শক্তির কাছে একার শক্তি কতটুকু। যাদের কথা আমরা সত্য বা ধর্ম বলে মনে করছি তাদের কথা কি ভেবে দেখেছ তোমরা? তাঁরা কি আমাদের ছোঁয় না, তারা কি আমাদের ছোঁওয়া কল থেকে জল নেয় না? এই সাহেব, বাবুদের মধ্যে কি জাতিভেদ নেই মনে কর তোমরা? তাঁদের মধ্যে কেন এই ছোঁওয়াছুয়ি,

জাতের প্রশ্ন ওঠে না? আর তাঁদের মধ্যে যখন এই প্রশ্ন ওঠে না তখন তাঁদের কথা আমরাই বা বিশ্বাস করবো কেন? তাঁরা জ্ঞানী, বড় এ-কথা সত্য। তাই আমার মনে হয় তাঁরা কাজে যা করেন আমাদেরও তাই করতে হবে দেখে, শিখে কিন্তু তাঁরা যা বলবেন অথচ কাজে করবেন না তার মধ্যে ছলনা, স্বার্থ বা দমননীতির কিছু না কিছু নিশ্চয়ই থাকবে।

অম্বরবাহাদুর বাঁ হাত দিয়ে মাথার বাঁ পাশের চুল টানতে টানতে দাঁড়িয়ে বললে—সাহেব বাবুদের কি আমরা ছুঁই নে? তলব ঝুকতে আমরা কি করি? এতে বুঝি জাত যায় না? আমি তো দেখতে পাই ওঁরা ছুঁলে আমরা আরো গর্ব অনুভব করি।

অম্বরবাহাদুরের কথা শেষ না হতেই প্রেমপ্রকাশ বলে ওঠে—জাত পৃথক থাকতে পারে কিন্তু মানুষ নয়। তাই জাতটাকে বড় করে দেখলে মানুষের বিচার করা হয় না।

উপস্থিত সকলেরই নজর পড়ে প্রেমপ্রকাশের দিকে। যদিও সে হ্যারিকেনের আলো থেকে বেশ খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে কথাগুলো বললো তবুও সকলেই বুঝতে পারে বাতির সমস্ত আলোকরশ্মি যেন তারই চোখেমুখে ঠিকরে পড়েছে। সকলের মুখেই মৃদু হাসি দেখা দেয়। তির্যক দৃষ্টি মেলে অনেকেই তাদের বন্ধুবান্ধবের দিকে তাকায়। প্রেমপ্রকাশের কথাগুলোর কোনই গুরত্ব দেয় নি ওরা বরং নীলবর্ণ শৃগাল অথবা ময়ুর পুচ্ছধারী কাকের উক্তি বলে মনে করে।

সভার কোন কিছুই ভাওনাথের সন্ধানী চোখ দুটোর দৃষ্টি এড়াতে পারেনি। সে প্রেমপ্রকাশের কথার গুরুত্ব বুঝিয়ে বলে প্রেমপ্রকাশ যা বলেছে সত্যিই তাই। জাতিবিচার দিয়ে মানুষের বিচার হয় না। আর মানুষ ছাড়া যখন ধর্ম নেই তখন মানুষ যে জাতিভুক্তই হোক না কেন তাকে দূরে ঠেলে ফেলে দিয়ে ধর্ম হয় না। ধর্ম সমষ্টিগত, জাতিগত নয়।

ভাওনাথের মনে অনন্ত ঢেউয়ের সমাবেশ। চোখেমুখে দেহে একটা অনাগত আলোর উত্তাপ অনুভব করে। সে দেখতে পায় ইতিমধ্যে অনেক পড়ুয়াই আগের মত গা ঠাসাঠেসি করে বসেছে। নেপালী আদিবাসী আস্তে আস্তে এক হয়ে গেছে। পরস্পর

পরস্পরকে ছুঁয়ে আছে, মুখের বাঁধন খুলে গেছে। কথা কইছে পরস্পরে। পূর্ব আচরণের কথা মনে হতেই প্রত্যেকেই যেন লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে।

এরপর প্রায় এক বছর কেটে যায় তখনও বাগানের লোকগুলোর মনে ভেদনীতির দ্বন্দ্ব চলছে। সরকারপক্ষ ও বাগানের মালিকদের প্রচারকার্য অব্যাহত। অনেক বাগানেই প্রতিদিন অল্পবিস্তর নেপালী আর আদিবাসীর মধ্যে প্রায়ই বচসা, মারামারি হচ্ছে। শান্তিপ্রিয় সাহেবগুলো শ্রমিকদের অভিযোগে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। দিন নেই রাত নেই, সময় অসময় নেই সকল সময়েই বিচার নিয়ে থাকতে হয়। আদিবাসী ও নেপালী দু'দলের লোকই বলছে—আমাদের মেলা লাইন, কল সব পৃথক করে দেওয়া হোক্। এই মেলা, লাইন ও কলের পৃথক ব্যবস্থা করে দেওয়া চারটিখানি কথা নয়। তার ওপর এই ব্যবস্থা করে দিলে আরো নতুন নতুন ফ্যাঁকড়া বা চাহিদা বাড়বে। এই সময়ে অনেকেই শ্রমিকদের বুঝাতে চেষ্টা করেন। তাঁরা বলেন সাধারণ চলাফেলা বা জীবনযাত্রায় পরস্পরের স্পর্শ বা ছোঁয়াছুয়িতে তেমন কোন দোষ নেই তবে তোমাদের ধর্ম আলাদা তাই ধর্ম সংক্রান্ত কিম্বা সামাজিক ব্যাপারের সময়েই এটা দোষনীয়।

দলমাননগরে ভেদনীতির ঢেউ তেমন জোরালো নয় কারণ স্কুলে এ নিয়ে প্রায়ই মিটিং বসে এবং আলোচনা হয়। তারপর সাহেববাবুদের তরফ থেকে যখন স্পর্শদোষের গুরুভার উঠিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা চলে তখন ভাওনাথ খুব খুশী হয় মনে মনে। জোরগলায় বলতে থাকে—এখন তো বুঝতে পারছ যে এই লোকগুলো স্বার্থবাদী। স্বার্থের জন্য এঁরা অনেক কিছুই বলেন অথচ তা মূল্যহীন বা ভিত্তিহীন এমন কি আমাদের পক্ষে ক্ষতিকর, আমাদের উন্নতির পরিপন্থী। এতে একজনের লাভ, অন্যজনের ক্ষতি।

জেলে থাকাকালীন বৌদ্ধভিক্ষুর সঙ্গ লাভ করে সাধুর কথা যেন একেবারে ভুলেই গিয়েছিল ভাওনাথ। মাঝে মধ্যে মনে

হলে জপমালা নিয়ে বসতো অন্য একটা প্রত্যয়ে সমস্ত অন্তর তলিয়ে যেত। তার মনে হতো সাধারণ মানুষের পক্ষে শোক, দুঃখ, মৃত্যু অনিবার্য। পরক্ষণেই বৌদ্ধভিক্ষুর প্রতিকৃতি ভেসে উঠতো তার চোখের সামনে। ভাওনাথ চলে যেত মৃত্যুর অনেক ওপরে আর এক অভিনব বৈচিত্র্যে। আবার অনেকদিন বাদে সাধুর কথা মনে পড়ে। এবারে ভুলতে চেষ্টা করে না। এক এক করে গোড়া থেকে সাধুর মৃত্যু পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে সেগুলো মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। শোক দুঃখ বেদনায় মনটা কুঁকড়ে ওঠে। এই শোক দুঃখ বেদনার মধ্যেও সাধুর কথাগুলো স্মরণে উৎসাহ ও আনন্দে মন ও দেহ পরক্ষণেই সবল, সতেজ ও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে তার মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তের কথাগুলো ভাওনাথকে অনন্তের কর্ম-পথে টেনে নিয়ে যায়। সাধু বলেছিল—মৃত্যু যে ধারা বেয়ে আসছে এতে তোমার আমার মত কর্মীদের অমর করে রাখবে। ভাওনাথ আজ উপলব্ধি করতে পারে প্রকৃত কর্মীদের মৃত্যু নেই তারা চিরনবীন, চিরন্তন। মৃত্যু শুধু অলস, স্বার্থবাদীদের জন্য। মনে পড়ে জ্ঞাননগর বাগানের কথা, সাধুর সেই কুঁড়ে ঘরবাড়ি, তার একার সংসারের খুটিনাটি ভাঙা হাঁড়ি পাতিল, লোহার কড়াই হাতা আর স্তূপীকৃত ভাল মন্দ ছেঁড়া টুকরো কেতাবপত্তর আর কাগজ। ভাঙা হাঁড়ি পাতিল, কড়াই, হাতা, হয়ত রাস্তার ধারে পড়ে আছে আজও। আর কেতাব কাগজপত্তরগুলো হয়ত কেউ নিয়ে গিয়েছে অথবা সাহেব জানতে পেরে ক্ষুদ্র একটা দেশলাইয়ের আগুনেই অত বড় বড় কত কথা পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছেন। হয়ত ছাই আর দেখতে পাওয়া যায় না সেখানে এখন। বাতাসে উড়ে গেছে সব আর কিছু হয়ত মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। পুঁথিপত্তর কাগজের কথাগুলো মরেনি এখনও। সেই কথা থেকে যেন অনেক কথার জন্ম নিয়েছে। গাছ একটা কিন্তু ফল অনেক আর তা থেকেই অনেক গাছের জন্ম। কথাও তাই। ভাওনাথ সেই কথাগুলো শুনতে পাচ্ছে। মনটা সমস্ত বাঁধন ভেঙে ছুটে পালাতে চায় তার। সাধু চেয়েছিল জ্ঞাননগর বাগানটাকেও সে দলমাননগরের মত করে

জাগিয়ে তুলবে কিন্তু ভাওনাথ জানে না কতদূর কি করতে পেরেছে সে। তবে তার দৃঢ় বিশ্বাস সাধু নিশ্চয়ই বীজ রোপন করে গেছে, একদিন না একদিন তা অঙ্কুরিত হয়ে ফলে ভরে উঠবে।

জেলে যাওয়ার পুর্বে সে প্রায়ই জাননগরে সাধুর কাছে যেত। সেই সময়ে সেখানকার কয়েকটি লোকের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছিল। মনে পড়ে তাদের কথা। ভাওনাথের বিশ্বাস লোকগুলো মিছে মিছি সাধুর কাছে আসতো না, কথা কইতো না নিশ্চয়ই সাধুর কথাগুলো মাঝে মাঝে তাদের মনের কপাটে ধাক্কা দিত। হয়ত এতদিনে অনুশীলনের অভাবে তা মুছে গেছে তাদের মন থেকে। মুছে যাওয়াই স্বাভাবিক। তার নিজের বেলাতেই তো হয়েছিল তাই। কিন্তু ভাওনাথ বুঝতে পারে এবং এ বিষয়ে সে নিশ্চিত যে মনের শিকড়ে তা রয়ে যায়। সময় ও সুযোগ পেলেই মূর্ত হয়ে ওঠে আবার। মনে মনে সংকল্প করে একদিন যেতে হবে জাননগরে লোকগুলোর মনভাব জানতে। সাধু যা বলেছিল তা ঠিক। শুধু দলমাননগরের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে কাজ করলে হয়ত কোনই উপকারে আসবে না তার পরিশ্রম। শিক্ষা ও মানবত্তার বীজ সমগ্র শ্রমিকজাতির মধ্যে উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

ইতিমধ্যে মহাত্মাজী সরকারের ভেদনীতির অবশ্যম্ভাবী কুফল চিন্তা করে 'হরিজন পত্রিকা' নামক একখানি প্রত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তিনি এই পত্রিকা এবং স্বাধীনতাকামী আরো অনেক পত্রিকার মাধ্যমে ভেদনীতির কুফল আলোচনা করেন। এই সঙ্গে কংগ্রেসের প্রচারকার্যও চলতে থাকে তাঁকে সমর্থন করে। জাতিভেদ উঠিয়ে দিয়ে সমস্ত জাতিকে একটা সমন্বিত শক্তি করে গড়ে তুলতে অনুরোধ করেন। সারা ভারতে একটা সাড়া পড়ে। অনেক জায়গায় এর সুফল দেখা যায়। চা বাগানের মধ্যেও এ-খবর প্রচারিত হয়। শহর-বাজারের অনেক শিক্ষিত নেপালী, আদিবাসীরাও এই প্রচার কার্যে সহায়তা করেন। বাগানের বাবুদের মন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একদিকে ভয় আর অন্যদিকে কর্তব্য। ভয়ের মধ্য থেকেই সাহসের জন্ম হচ্ছে। সাহেবদের সামনে ভেদনীতির অনুকুলে দু'একটা কথা বলেন শেষে

সাহেব সরে গেলেই মহাত্মা বা কংগ্রেসবর্ণিত ভেদনীতির কুফল বর্ণনা করেন।

ভাওনাথ আনন্দে মেতে ওঠে। দলমাননগরের সর্বত্র এই ভেদনীতির কুফল আলোচিত হয়। সাহেব দেখতে পেলেই সব চুপচাপ থাকে। স্কুলের সমস্ত পড়ুয়াই আস্তে আস্তে এক হয়ে গেছে। নেপালী আদিবাসী একসঙ্গে মিলেমিশে বসে, গলাগলি ধরে রাস্তাঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এই জাতি সমন্বয়ের মধ্যেই যেন একটা একাত্ম, অহিংস ভাব দেখতে পায় ভাওনাথ।

এরপর সত্যই একদিন জাননগর বাগানে যায় ভাওনাথ। অনেক পরিবর্তন দেখতে পায় সেখানকার বিশেষ করে সাধুর ঘরবাড়ির। বাড়িটা যেন চেনা যায় না। ঘরের খাগড়ার দেয়ালে গোবর মাটির লেপ পড়ে শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। বাড়ির চারধারে বরুইয়ের ডালপালা, কচা ও চিতা গাছের বেড়া। যবের মত আকারের অনেক লাল সরু ফুল ফুটে আছে চিতা গাছগুলোতে। দেখতে পায় তিনটে ছেলে ছুটে এসে একটা একটা করে ঐ ফুল তুলে ভ্রমরের মত মধু পান করছে। ছেলে তিনটির কী আনন্দ। তারা যেন কত সৌভাগ্যবান যে ফুলগুলো পেয়েছে। বলাবলি করছে—আর একটু দেরি হলে আর পেতে হতো না। নিশ্চয়ই শনচর, সোমরা, কায়লা মন্তরিরা খেয়ে নিত। ঘরে লোক ছিল। কি জানি ছেলেদের গুঞ্জনে ঘর থেকে বাইরে এসে ছেলে তিনটেকে তাড়া করে বলে ওঠে—তোদের জ্বালায় আর বেড়াটা ঠিক থাকবে না। ছেলেগুলোর কানে হয়ত কথা পৌঁছেনি। তারা তার আগেই ভেগে গেছে। লোকটা বেড়ার কাছে এগিয়ে আসে। চোখ ভ্রূ কুঁচকে বলে—দেখেছ, কতগুলো ডাল ভেঙেছে। তখনও ডাল থেকে সাদা আঠা আঠা চটচটে কষ লাগে হাতে। লোকটা বেড়ার শক্ত ডালে হাত পুছতে পুছতে বলে—সব ফুলগুলো তুলে মধু খেয়ে নিয়েছে। জেঠা জেঠি কাঞ্ছা কাঞ্ছি বাজার থেকে এসে হল্লা করবে।

লোকটা নেপালী। মধ্যবয়সী। ভাওনাথ তখনও দাঁড়িয়ে। সে তাকে দেখতে পেয়ে এক নিশ্বাসে হিন্দিতে অনেকগুলো প্রশ্ন

করে বসে—কা খোঁজাড়ি কোরতা হায়, কাহা সে আয়া? তোমকো তো কইদিন নেই দেখা হায় হেয়াপর? লোকটার চোখমুখের ভাব দেখে মনে হয় কি জানি ভাওনাথকে সে একটা চোরটোর কি বদমায়েস বলে ভেবেছে।

ভাওনাথ বললে—কিছুই খুঁজছি না আমি। এই ঘরটিতে আগে একটা লোক থাকতো, নাম সাধু।

ভাওনাথের কথায় বাঁধা দিয়ে বলে ওঠে লোকটা—সে তো অনেক দিনের কথা, তিন বছরের উপর হবে। কবে পঞ্চভুতে মিশে গেছে আর আজ তার খবর নিতে এসেছ তুমি?

লোকটার কথা বলার ভাব ভঙ্গি ও চোখ মুখের চেহারা লক্ষ্য করে ভাওনাথ। কথাগুলো নিছক ব্যঙ্গ বা কথার কথা নয়। এরমধ্যে কোথাও একটা বেদনা আছে। ভাব আছে, ভাব সম্প্রসারণের ক্ষেত্র আছে।

লোকটা বললে—তুমি কি জানি তার আপনজন কেউ হবে, অনেকদিন খোঁজ খবর না পেয়ে খুঁজতে এসেছ?

ভাওনাথ চারপাশে চোখ দুটো বুলিয়ে নেয় এরমধ্যে। সে যা মনে করেছিল তা নয়। রাস্তার ধারে কোথাও কোন মেটে ভাঙা হাঁড়ি পাতিল খাপরা বা ভাঙা হাতা কড়াইয়ের চিহ্ন নেই। ছোট ছেলেমেয়েরা হয়ত খেলার জিনিস করবার জন্য নিয়ে গেছে। আর লোহার টুকরো তো কিছুতেই পড়ে থাকতে পারে না। আজকাল তো লোহা সোনা হয়ে দাঁড়িয়েছে যুদ্ধের পর থেকে। হয়ত এরমধ্যেই কোন দূরদেশে চালান হয়ে গেছে। সাধু থাকাকালীন বাড়ির চারপাশ ছিল বেশ ফাঁকা ফাঁকা, রোদ আলো বাতাস ভরা আর এখন যেন বাড়িটা কেমন ছায়াঘেরা। ঘরের তিনদিকে কলা গাছে ভরতি। তিন কাঁদি কলা ঝুলছে তিনটে গাছে। সবই কাঁচকলা। কলাগুলো তরকারি খাওয়ার মত কাঁচা নেই, কেমন শক্ত হয়ে গেছে চেহারা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। আর দু'চারদিন বাদেই পাকবে। লোকটা বেশ হিসেবী এতে সন্দেহ নেই। সংসারীও বটে। কারণ কাঁচাকলার চেয়ে পাকাকলার দাম ও চাহিদা খদ্দেরদের কাছে অনেক বেশি। বিশে

এই জাতীয় পাকাকলার। বিশেষ করে নেপালী শ্রমিকদের কাছে।

ভাওনাথ জিগ্যেস করে—আচ্ছা, বলতে পার, সাধুর কেতাব-পত্তরগুলো কে নিয়েছে?

কেতাবপত্তরের কথা শুনেই চমকে ওঠে লোকটা। কি জানি ছদ্মবেশী গোয়েন্দা ভাবে ভাওনাথকে। থতমত খেয়ে মুখটা বিকৃত করে বললে—কি জানি বাপু, ওসব খবরটবর জানি নে আমি। আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি?

ভাওনাথ বুঝতে পারে লোকটা আস্তে আস্তে এক পা দু'পা করে সরে পড়তে চায়। একটা আতঙ্কের ছাপ তার সারা মুখখানা বিবর্ণ করে তুলেছে। চোখ দুটোও কেমন যেন ক্লান্ত, নিদ্রালু। আগের মনটা যেন কোথায় সরে গেছে। তার বিকল্পে অন্য এক বিকৃত বিস্রস্ত মন কাজ করছে।

ভাওনাথ বলে—সাধু লোকটা তো খুব ভাল ছিল।

লোকটা বেড়ার চিতা গাছে ভাবের ঘোরে হাত বুলোতে বুলোতে মুখ নিচু রেখেই জবাব দেয়—কি জানি কি ছিল? লোকে তো পাগল বলতো।

আচ্ছা, এ-বাগানে তার অন্তরঙ্গ কে ছিল যে তার সঙ্গে মিশতো?

দু'চারটে ছেলে তার সঙ্গে মিশতো তবে তা নিছক পাগলা বলেই তার সাথে রসিকতা করার জন্য। হাঁ, মনে পড়েছে তার অন্তরঙ্গ একজন লোক নাকি ছিল, সে দলমাননগরে থাকতো, নাম ভাওনাথ। শুনছি, লোকটা নাকি জেল থেকে ফিরে এসে ভকত বনে গেছে।

ভাওনাথ লোকটা কেমন, তুমি কি তাকে চেন?

লোকটা বললে—আমার সঙ্গে জানাচেনা নেই তার। শুনেছি লোকটা নাকি খুব ভাল। দলমাননগরের শ্রমিকদের জন্য অনেক কিছু করেছে।

এর মধ্যে হঠাৎ মঙ্গেলে কামী এসে উপস্থিত হয়। সে অনেকদিন বাদে দেখতে পেয়ে আনন্দে চিৎকার করে ওঠে আরে ভাওনাথ যে?

মঙ্গলের কথা শুনে লোকটা যেন আকাশ থেকে পড়ে। বড় বড় চোখ করে ভাওনাথের দিকে তাকায়। মুখখানি এর মধ্যেই হাসিতে ভরে উঠেছে তার। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে ভাওনাথ ও মঙ্গলের নিকটে এগিয়ে এসে হাত দুটো জোড় করে নমস্কার জানায় ভাওনাথকে। বললে—তুমি তো আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছিলে ভাই। আমি মনে করেছিলাম কি জানি পুলিশটুলিশের গোয়েন্দা হবে তুমি। তুমি তো দেখছি আচ্ছা লোক, নামটা বললে আর আমাকে এত দুর্ভোগ ভুগতে হতো না আর ইনিয়ে বিনিয়ে সত্য মিথ্যা মিলিয়ে এত কথাও বলতে হতো না! এসো, ঘরের দাওয়ায় বসে কথা বলি।

মঙ্গলে বললে—তুমি কি ভাওনাথকে চিনতে পারনি তোরঙ্গ বাহাদুর?

চিনবো কি করে? আমি তো আর ওকে দেখিনি কোনদিন। ওর পরিচয় শুধু যেটুকু জানি তা তোমাদের মুখেই শোনা।

ভাওনাথ জিগ্যেস করে—তা পুলিশ গোয়েন্দা মনে করলে কি জন্য।

তোরঙ্গবাহাদুর বললে—ও-সে অনেক কথা। মঙ্গলেই বলবে তোমাকে।

মঙ্গলে বলতে শুরু করে—সত্যি, সে অনেক কথা ভাওনাথ। কী দুর্ভাবনার মধ্যেই জীবনটা কাটিয়েছি তিন চার মাস। সাধু জেলে যাওয়ার পর বাগানে একটা হৈ চৈ পড়ে যায়। তার কেতাবপত্তরগুলো আমরা কয়েকজনে আমাদের ঘরে নিয়ে লুকিয়ে রাখি। কয়েক টুক্‌রো ছেঁড়া কাগজ রাস্তার এধারে সেধারে বাতাসে উড়ে যায়। তার একটা টুক্‌রো বাগানের ডাক্তারবাবুর হাতে পড়ে। তিনি সেটা পড়ে দেখতে পান যে কাগজের টুক্‌রোটাতে রাশীয়ার বিপ্লবের কথা লেখা আছে। সঙ্গে সঙ্গে সেই কাগজের টুক্‌রোটা নিয়ে গিয়ে বড়সাহেবকে দেন। বড়সাহেব ছুটে আসেন এখানে। আরো কতকগুলো টুক্‌রো ঘরটার এধারে সেধারে অবাঞ্ছিত পড়ে ছিল সেগুলো খুটে খুটে কুড়িয়ে নিয়ে যান তিনি। তার পরদিনই পুলিশ এসে হাজির হয় বাগানে। অনেক

তদন্ত হয়। এই তদন্ত চলে প্রায় চারমাস ধরে। আমার মনে হয় এইজন্তই তুমি সাধুর কথা জিগ্যেস করতেই তোরঙ্গবাহাদুরের মনে আগের সেই আশঙ্কা জাগে। তারপর কেতাবগুলোও যে আমাদের কাছেই আছে।

ভাওনাথ এর বিন্দুবিসর্গও জানতো না আগে। মঙ্গলের কাছে শুনে তোরঙ্গবাহাদুরের আতঙ্কের কারণ ও তার আঁচ অনুভব করে। তবু মনে মনে আনন্দ পায় অনেক। সাধুকে এরা ভোলেনি তাহলে। কথা যদি কথার মত হয় তাহলে অনেক কথার জন্ম হয়। সাধুর কথাগুলো ছিল জীবন্ত। মানুষের রক্ত মাংসের কথা।

ভাওনাথ বললে—তোমরা দলমাননগরের মত একটা স্কুল কর না কেন? এজন্য তোমাদের একটু খাটতে হবে তবে শেষে পরিশ্রমের ফল পাবে। দুঃখ কষ্টের ভয় করলে কোনই কাজ হয় না। দুঃখ কষ্ট শোক ভোগ মৃত্যু এর হাত থেকে কি নিস্তার আছে? যে কোন কাজেই বাধা আছে। বাঁধাকে ভয় করলে যেখানকার জল সেখানেই থেকে যাবে। তাই দেখ না জলকে বাঁধ দিয়ে আটকাতে গেলে সে ফোঁসে ওঠে তারপর যখন বাঁধ ভেঙে জল অবাধ ছুটতে থাকে তখন তার কী আনন্দ। একটা সীমা-রেখাকে লঙ্ঘন করলেই আরো অনেক রেখাকে ডিঙিয়ে যাবার সাহস হবে। জীবন তো শুধু চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যেই। এই চাওয়া পাওয়া না থাকলে জীবন শূন্য।

তোরঙ্গবাহাদুর বললে—আমরা যে কিছুই বুঝিনে ভাই। এ নিয়ে অনেক আলোচনা করেছি কিন্তু কি ভাবে কি করলে ঠিক হবে তা ঠাওর করতে পারিনে। আজকে যদি সাধু থাকতো তাহলে তার পরামর্শ মত কাজ করতে পারতাম। আমরা যে মোটবাহী গাধাবোটের মত, চালালে চলি না চালালে এক জায়গায় বসে বসে ঝিমুই। নিজেদের মগজে কিছুই আসে না। একটা কথা ভাবতে গেলে অনেক কথা, ভয় দ্বন্দ্ব, সংশয় এসে হাজির হয়।

ভাওনাথ বললে—মানুষের মন সব সময়ই দুর্বলতার দিকে। দুর্বলতার কথাই আগে ভাবে সে কিন্তু এই দুর্বলতার মধ্যেই যে একটা সবল সুদৃঢ় কিছু আছে তাকে দেখতে পায় না সে।

যে এই দুর্বলতাকে ভেঙে চলতে থাকে সেই সে সবল সুদৃঢ় জিনিসটিকে দেখতে পায়। দুর্বলতা ভয় আর ঐ সবল সুদৃঢ় জিনিসটি সাহস, শক্তি আনন্দ। মানুষ মানুষকে খুন করে। কিন্তু যদি খুনের বিষয় চিন্তা করে তাহলে আর খুন করতে পারে না তারা। তবে খুন যদি হঠাৎ করে বসে একবার তাহলে সে সেই বিপদের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা ও চিন্তা করে। স্কুলটা শুরু কর তাতে যদি বিপদ আসে তারপর দেখতে পাবে তোমাদেরও মগজ খুলবে তখন চিন্তা করবে কি করে এই বিপদের হাত থেকে রেহাই পাবে।

মঙ্গলে তোরঙ্গবাহাদুরের দিকে চেয়ে বললে—ঠিকই বলেছে ভাওনাথ। এই তো প্রথম যেদিন চা গাছ কলম করি সেদিন কামদারী চাপরাসী সাহেব বাবুর কত লাঠির গুঁতো খেয়েছি। সেই গুতো খেয়েই না শিখেছি কেমন করে ঠিকভাবে কলম করতে হয়।

ভাওনাথ বললে—শুধু কলম করা কেন ভাই? সব কিছুর বেলাতেই তাই। প্রথমটায় বাধা তারপর মিঠা।

ভাওনাথ দেখতে পায় তোরঙ্গবাহাদুর আর মঙ্গলের যেন সাহস অনেক বেড়ে গেছে। চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা স্বচ্ছ সাবলীল আলো। ওরা যেন অনেক দুরে পৌঁছে গেছে। অন্ধকার জঙ্গলময় কণ্টকাকীর্ণ রাস্তা পরিষ্কার একটা সরলরেখার মত বহুদুর চলে গেছে। আলো ঝলমল করছে।

তোরঙ্গবাহাদুর বললে—তুমি মাঝে মাঝে এসে আমাদের একটু আধটু সাহস ও পরামর্শ দিলে আমরাও একটা কিছু করতে পারব নিশ্চয়ই।

নিশ্চয়ই আসবো। তোমরাও দু'একদিন যেও। শিগগিরই একদিন এসো না আমাদের স্কুলটা দেখে আসবে।

এক ফাঁকে ভাওনাথ সমস্ত দিকে চোখ দুটো বুলিয়ে নেয়। তারপর গলাটা অপেক্ষাকৃত নিচু করে বলে—চা বাগানগুলোর ওপর দিয়ে বড় একটা দুদিন যাচ্ছে এখন। শুধু চা বাগানই বা বলি কেন সমস্ত ভারতের ওপর দিয়ে। সরকার ও কারখানার

মালিক সম্প্রদায় যে ভেদনীতির ধোঁয়া তুলেছেন এতে আমাদের দেশের লোকগুলোকে সংঘবদ্ধ হতে দিচ্ছেন না। মনটাকে পৃথক করে দিচ্ছেন। তোমাদের বাগানের অবস্থা কেমন?

তোরঙ্গবাহাদুর বললে—প্রথমটায় জাতিতে জাতিতে খুব বিরোধের সৃষ্টি হয়েছিল। এখন একটু কম।

ভাওনাথ বললে—গান্ধীজী যে এর কুফল বর্ণনা করে তাঁর বাণী প্রচার করছেন এ-খবর কি তোমাদের এখানকার শ্রমিকেরা জানতে পেরেছে?

—জানবে কোথা থেকে, বলে ওঠে তোরঙ্গবাহাদুর। দূর থেকে উড়ে আসার কথার মত দু'একটা কথা শোনে বটে কিন্তু তা কানের পর্দার ভেতরে ঢোকে না তাদের।

ভাওনাথ বললে—অনেক আলোচনা করে ওদের কানের পর্দা নরম করতে হবে। সময়, সুযোগ পেলেই এ নিয়ে আলোচনা করবে ওদের সঙ্গে। তারপর দেখতে পাবে কানের পর্দা খুলে মনের পর্দায় গিয়ে দাঁড়াবে। আর এই আলোচনা থেকেই আস্তে আস্তে জানার ও শেখার একটা প্রবৃত্তির জন্ম নেবে। তখন স্কুল খোলা সম্বন্ধেও ভাবতে হবে না।

মঙ্গলে কি জানি স্কুলের কথাই ভাবছিল এতক্ষণ। সে বললে—এখানে একটা স্কুলের একান্ত প্রয়োজন। আজ একমাস আগে শুনলাম সরকার থেকে একজন বাবু এসে বড়সাহেবের কাছে একটা প্রাইমারি স্কুলের প্রস্তাব করেন কিন্তু বড়সাহেব একটা মাত্র কথাতেই তাঁর মুখ বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন—কি দরকার এই গাধাগুলোকে মানুষ করার? সমস্ত রাজ্যে একটা অশান্তি ডেকে আনা হবে। তারপর এই যে তোমরা, বাঙ্গালী বাবু সম্প্রদায় তোমাদের কথা কি একবার ভেবে দেখেছ? শ্রমিক সম্প্রদায় লেখাপড়া শিখলে আর তোমাদের পেটের ভাত করে খেতে হবে না। এই চা বাগানের কেরানীর কাজকর্ম ওদেরই একচেটিয়া হবে।

ভাওনাথ বললে—তাই তো বলছি নিজেকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। অপরে দাঁড় করিয়ে দিলে দাঁড়িয়ে থাকা যায়

পা, পড়ে যেতে হয়। ছোট শিশুর মত বার বার দাঁড়িয়ে নিজের পায়ের শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। পড়ে গেলে ব্যথা পাবে কাঁদবে তবু আবার দাঁড়াবে। পা শক্ত হবে কাঁদতে হবে না, ব্যথাও লাগবে না তখন। স্কুল খোলার ব্যবস্থা কর। আসুক না ঘাত প্রতিঘাত তাতে কি? এই ঘাত-প্রতিঘাতেই শক্ত হবে তোমরা নতুবা যেমন দুর্বল তেমনিই থাকবে। জানোই তো খেতে খেতে গলা, হাঁটতে হাঁটতে পা।

এদিকে কখন যে দিনের আলো নিভে সন্ধ্যার আগমনী শুরু হয়েছে তা টের পায়নি কেউ। সায়াহ্নের শেষ স্বর্ণরেখা কোথায় মিলিয়ে গেছে। সন্ধ্যাতারা জ্বলেছে আকাশের গায়ে। বড় সড়কের দুধারের বড় বড় রেনট্রির ছোট ঘন ডালপাতার নিচে অন্ধকার। স্টেশনে ঢং ঢং করে বেতাল ঘণ্টাবাজার শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাড়ির সময় হয়েছে।

ভাওনাথ বললে—গাড়ির সময় হয়েছে, আমি এখন চলি। তোমরা একদিন যেও।

পিছনের সমস্ত আহ্বান কোথায় যেন হারিয়ে যায়। তোরঙ্গ-বাহাদুর ও মঙ্গলেও ভাওনাথের পিছু পিছু গিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দেয় তাকে।

গাড়ি চলেছে বাতাস ও অন্ধকার ঠেলে। বাতাস ও অন্ধকার হার মেনেছে গাড়ির শক্তির কাছে। তারা ফোঁসে উঠছে রাগে। কিন্তু গাড়ির শক্তিকে প্রতিরোধ করতে পারছে না কিছুতেই। গাড়ি তাদের চোখেমুখে রাশ রাশ ধুলোবালি আর শুকনো ঝরা পাতাগুলি ছড়িয়ে উড়িয়ে চলেছে অবাধ স্বচ্ছন্দ গতিতে। মানুষের তৈরি এই গাড়ি। এ তারই শক্তি। মানুষ তাহলে কী না করতে পারে?

ভাওনাথ মনে মনে ভাবে জাননগরের গতি বদলেছে। এ মানুষেরই কৃতিত্ব। যার কেউ নেই তারই অনেক আছে। সেই অনেক পায়। সংসার হারা সন্তানহীন সাধু অনেক সংসার ও সন্তানের জন্ম দিয়েছে। এ তারই নিস্বার্থতার ফল। তোরঙ্গবাহাদুর ও মঙ্গলের মুখ দু'খানি ভেসে ওঠে ভাওনাথের চোখের সামনে।

তারা যেন তারই সামনে দাঁড়িয়ে। তাদের প্রদীপ্ত চোখমুখ, সুদৃঢ় দেহ ও ঋজু বাহু ভাওনাথের মনে অনেক নতুন নতুন পরিকল্পনা ও আশার জন্ম দেয়। স্বপ্নচোখে সে যেন দেখতে পাচ্ছে জানমগর বাগান জেগে উঠেছে। তোরঙবাহাদুরের স্কুল বসেছে। পড়ুয়াদের কোলাহল শুনতে পাচ্ছে ভাওনাথ।

কয়েক মাসের মধ্যে চা বাগানের হাওয়া অনেকটা বদলে যায়। সরকার ও বাগিচার মালিকদের ভেদনীতির প্রচারকার্য একরকম বন্ধ হয়ে যায় বটে তবে আর একটা নতুন ক্যাসাদের সম্মুখীন হতে হয় শ্রমিকগুলোকে। বাগানের মালিকরা মাদ্রাস, নাগপুর, লোহরডগা, বিলাসপুর প্রভৃতি জায়গা থেকে খৃষ্টান কুলির আমদানি করতে উঠে পড়ে লেগে যান। দেখতে দেখতে সমস্ত বাগানেই অল্পবিস্তর খৃষ্টান কুলি এসে যায়। এর মধ্যে সরকার থেকে দমনপুরে পাদরি পাঠান। প্রতি বাগানের খৃষ্টান কুলিকে সপ্তাহে একদিন তাঁর কাছে যেতে হয়। বাগানের কর্তৃপক্ষদের এ-জন্য কার্য পরিচালনায় বেশ একটু অসুবিধা ভোগ করতে হয় কারণ পাতির মরশুমে ওদের অনুপস্থিতিতে বহু লোকসান হয়। রবিবার ছুটির দিনে সকলের পক্ষে পাদ্রীর কাছে যাওয়া সম্ভবপর নয় কারণ সপ্তাহের হাটবাজার ঐ দিনেই করতে হয় তাদের। এর ফলে মালিক সম্প্রদায় পাদ্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে বাগানে বাগানে গীর্জার ব্যবস্থা করেন। গীর্জা তৈরি হওয়ার পর পাদ্রী আসেন বাগানে। তিনি খৃষ্টান শ্রমিকদের মধ্য থেকেই প্রতি বাগানের জন্য একজন করে 'প্রিচার' নিযুক্ত করেন। এই প্রিচারের উপর বাগানের সমস্ত খৃষ্টান শ্রমিকদের ভার ন্যস্ত করেন। এরা সন্ধ্যায় কাজ থেকে ফিরে এসে মেয়ে-পুরুষে গীর্জায় ধর্মগ্রন্থ পাঠ শোনে। ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও যীশু খৃষ্টের বাণী প্রচার করেন প্রিচার। পাদ্রী বাগানে আসেন মাসে দু'বার। আসার আগে বাগানের ম্যানেজারকে খবর দেন। ম্যানেজার প্রিচারকে ডেকে তাঁর আগমনবার্তা জানান। একটা দেখবার মত উপভোগ্য দৃশ্য। পাদ্রী এসে ওঠেন বড়সাহেবের কুঠিতে। প্রিচার সেনাপতির মত আগে আগে চলে আর তার

পিছু পিছু ফুলের মালা হাতে চলে মেয়ে-পুরুষ সৈনিকের দল। কুঠীর ওপর থেকে হাসিমুখে নিচেয় নেমে আসেন পাদ্রী। সকলের সঙ্গে করমর্দন করেন। মেয়েরা ফুলের মালা পরিয়ে দেয় তাঁকে। তারপর পাদ্রীকে নিয়ে গীর্জায় আসে সকলে।

এই দৃশ্য দর্শনে নেপালী ও আদিবাসী শ্রমিকের দলের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়। যা হোক দুটো ভাত করে খাচ্ছিল তাও বোধ হয় কিছু দিনের মধ্যে শিকেয় উঠবে কারণ যে পরিমাণ খৃষ্টান কুলির আমদানি হচ্ছে বাগানে তাতে হয়ত একটু ত্রুটি বিচ্যুতি পেলেই বাগান থেকে তাড়িয়ে দেবে তাদের। তারপর খৃষ্টান কুলিগুলো কোনই পাত্তা দেয় না নেপালী ও আদিবাসীদের। কথায় কথায় বলে—'আমরা রাজার জাতি'। আর সত্যি কথা, এই অল্পদিনের মধ্যেই তারা বেশ একটা স্থায়ী আসন তৈরি করে নিয়েছে। ওদের সুখদঃখ যেন সাহেবেরা সমবেদনার চোখে দেখেন। বাগানে বাগানে জঙ্গল কেটে খেলাধুলোর মাঠ তৈরি হয়। সাহেবেরা ওদের নিয়ে হকি খেলেন মাঠে।

এই খৃষ্টান কুলিরাও আদিবাসী। এদের বাপ মা আত্মীয়স্বজন অনেকেই এখনও সংসারী কিন্তু এই লোকগুলোর চলাফেরা হাবভাবে মনে হয় না যে এরা আমাদেরই জাতভাই এবং সংসারী বাপমায়ের ছেলে মেয়ে। করুণামাখা চোখে এক দৃষ্টে এদের দিকে চেয়ে থাকে ভাওনাথ। অনেক কিছু ভাবে মনে মনে। এদের মধ্যে অনেকেই সামান্য প্রলোভনে স্বামীর ঘর ছেড়ে এসে সাহেবদের দৈহিক আমোদপ্রমোদের ক্রীড়ক হয়েছে। তাদেরই ছেলে মেয়ে এই লোকগুলো। আর এদেরই বা দোষ কি? প্রলোভনটাকে সামান্যই বা বলি কি করে? কারণ মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে বেঁচে থাকার মত সমস্ত কিছুই তার দরকার। আমরা কি পেয়েছি এই সমাজের হাত থেকে? এক ভয় ছাড়া কিছুই পাইনি আমরা। ভয়ের রক্তে আমাদের জন্ম। জাতির সম্প্রসারণ বা বিস্তার না করতে পারলে জাতির সংগঠন হয় না। এদের অভাব অভিযোগ দূর না করতে পারলে জাতি এমনি করেই ক্ষীণ ও দুর্বল হয়ে পড়বে। হয়ত আস্তে আস্তে এই জাতির অস্তিত্বই থাকবে না।

এদের দেহ আছে শক্তি আছে কিন্তু মন নেই। মন বা মনে বল না থাকলে শুধু দেহের শক্তিতে কোন কাজই হয় না। আর মন না থাকলে আকাঙ্ক্ষাই বা আসবে কোথ থেকে? মনই টেনে নিয়ে চলে দেহকে, শক্তি তখন দ্বিগুণিত হয়। আকাঙ্ক্ষা হয়ত আছে কিন্তু মন যখন ভয়ে ভরা তখন আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর হয়ে উঠতে পারে না। দুনিয়ার এত যে আলো বাতাস এর কোনটাই গায়ে লাগে না এদের। তবে মালিকদের এই রূঢ়-আচরণ ও পক্ষপাতিত্বের মধ্যে একটা শুভ ইংগিত দেখতে পায় ভাওনাথ। তার মনে হয় অচিরেই এই নেপালী ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতি সংগঠন ও সংঘবদ্ধতার প্রচেষ্টা দেখা দেবে।

ইতিমধ্যে জাননগর বাগানে তোরঙ্গবাহাদুর ও মঙ্গলের প্রচেষ্টায় একটা নাইট স্কুলের গঠন কার্য চলছে। তোরঙ্গবাহাদুর ও মঙ্গলের মনের বল অনেকটা বেড়ে গেছে। ঐ সঙ্গে সাহসও। প্রথম শুরুতে ওরা মাত্র চার জনে নিজেরাই নিজেদের মত লেখাপড়া আরম্ভ করে। কোন ঘর নেই। তোরঙ্গবাহাদুরের বাড়ির বারান্দাতে বসে বসে পড়তো ওরা। আস্তে আস্তে দু'একজন ছেলে আসতে শুরু করে। তারা মনযোগ দিয়ে বসে বসে ওদের আলোচনা ও লেখাপড়া শোনে। কিছুদিনের মধ্যেই ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায়। আঠারো জনে গিয়ে দাঁড়ায়। ছোট ঘরের সামান্য বারান্দাতে আর স্থান হয় না তাই বাড়ির লাগোয়া একটা আমগাছ তলায় বসে লেখাপড়া করে। গত বছর তোরঙ্গবাহাদুরের স্ত্রী ঐ আমগাছটা কেটে ফেলে দিতে চেয়েছিল। সে স্বামীকে বলে—কি হবে এই আমগাছ রেখে? একটা আম খাওয়া যায় না, পাকার আগেই অসংখ্য পোকা জন্ম নেয় আমে। তারপর ঝুটমুট অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। বরং ওখানে অন্য কোন শাক সবজি রোপণ করলে অনেক লাভ হবে।

এর উত্তরে তোরঙ্গবাহাদুর বলে—কি হবে কেটে? থাক না গাছটা। আমগাছের নিকটে তিনটে কাঁঠাল গাছ ছিল তার সব কটাই কেটে শেষ করেছ। তোমার দেখছি বড় গাছপালা দেখলেই গা জ্বলে। বাড়ির মধ্যে একটা দুটো বড় গাছ থাকা ভাল।

গরমের সময়ে কাজ থেকে ফিরে এসে গাছের তলায় বসে শরীরটা ঠাণ্ডা করা যায়। আর এ ছাড়া ছেলেপেলে দু'টো কাঁচা আম খায়, আমরাও তো মাঝে মধ্যে টক খাই আর কাঁচা আম বিক্রি করলেও যাহোক সামান্য দু'চারটে পয়সা পাওয়া যায় তবে শাকসবজির তুলনায় লাভটা কম হয় এতে সন্দেহ নেই। এই সব কথাগুলোই তোরঙবাহাদুর হাসতে হাসতে ভাওনাথকে বলেছিল একদিন। সে বলে—যাকে রাখা যায় সেই-ই রাখে ভাওনাথ। গাছটা যদি কেটে ফেলা হতো তাহলে এখন কি হতো বলতো ?

ভাওনাথ বললে—ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়। অন্য একটা কিছু ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হতো। আর স্কুল তো গাছতলায় বেশিদিন রাখতে পারবে না। ঝড়বাদলের সময় এলেই অন্য ব্যবস্থা করতে হবে তোমাদের। তাই বলি, কিছু কিছু চাঁদা তুলে মাথা গোঁজার মত একটা কিছু ছোট ঘর তৈরি করে নেও। প্রয়োজন বোধ করলে না হয় আমাদের সমিতি থেকে কিছু টাকা পাইয়ে দেব তোমাদের।

হঠাৎ তোরঙবাহাদুর ও মঙ্গলে প্রায় একই সঙ্গে কথাটার মোড় ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলে ওঠে—আচ্ছা, এই যে বাগানের মালিকরা খৃষ্টান কুলিগুলো আনছে বাগানে বাগানে এরমধ্যে নিশ্চয়ই একটা গুঢ় রহস্য আছে মনে হয়। তোমার কি মনে হয় ভাওনাথ ?

ভাওনাথ বললে—নিশ্চয়ই আছে। এর আগে যে ভেদনীতির ধোঁয়া তুলেছিলেন সরকার ও মালিকপক্ষ এ তারই ব্যর্থতার ফল। এটি আর একটি নতুন ধোঁয়া। এই ধোঁয়াতে আছে প্রলোভন, ছলনা। এর মধ্যে আছে অপর জাতিকে ক্ষীণ করে স্বজাতিকে সুঠাম ও বলিষ্ঠ করা। আমার মনে হয়, ইংরেজ বড় চালাক জাতি। এঁরা জানেন কেমন করে রাজ্য শাসন করতে হয়। এঁরা এত দক্ষতা অর্জন করেছেন যে একটু কিছু হওয়ার বহু পুর্বেই জানতে পারেন হাওয়া কোনদিকে যাবে তখন সেই হাওয়ার গতিরোধ করতে সচেষ্ট হন। তরল পদার্থের দানা না বাঁধতেই তার মধ্যে এমন কোন ধাতব দ্রব্যের সংমিশ্রণ করেন যার ফলে আর দানা বাঁধা হয় না। এও ঠিক তাই, এঁরা বুঝতে পেরেছেন যে অচিরেই শ্রমিকদল জাতি নির্বিশেষে সঙ্ঘবদ্ধ হবে। আর এই শ্রমিকদল

সঙ্ঘবদ্ধ হলে ওঁদের মুষ্টিমেয় শক্তি কিছুতেই অগ্রগতির পথ রোধ করতে পারবে না।

মঙ্গলে বললে—তাহলে তো আমাদের উঠে পড়ে লাগা উচিত।

ভাওনাথ বললে—নিশ্চয়ই। আর এতে আমাদের দলগঠন ও প্রচারকার্যের অনেক সুবিধা হয়েছে।

তোরঙ্গবাহাদুর ও মঙ্গলে উভয়েই উৎসুক চোখে ভাওনাথের দিকে তাকায়।

ভাওনাথ ওদের মনভাব বুঝতে পারে। সে বললে—বুঝতে পারলে না। এবারে সকলেই সরাসরি সোজা ভাবে বুঝিয়ে দিতে পারবে এর কুফল। আর কথাটাও ঘোর প্যাঁচের নয়, সোজা তাই সকলেই বুঝতে পারবে। তোমাদের স্কুল পরিচালনারও সুবিধা হবে। এ উভয় নেপালী ও আদিবাসীর একই সমস্যা। এখানে সকলেই এক। তাই সঙ্ঘবদ্ধ হওয়াটা মোটেই অসম্ভব নয়। নিজেদের কথা নিজেদের মধ্যেই থাকবে, বাইরে যাবে না, গুপ্ত শত্রুতাচরণের ভয় নেই। কিছুদিন বাদেই দেখতে পাবে যে সাহেবদের এই পক্ষপাতিত্ব কেউই বরদাস্ত করবে না।

এরপর বড়দিন আসে। ২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যা থেকে দেখা যায় খৃষ্টান কুলিগুলোর তৎপরতা। গির্জার সামনে বিরাট হৈচৈ করে গেট তৈরি হচ্ছে। দক্ষিণমুখো বড় সড়কের পুব পশ্চিম লম্বালম্বি গির্জা। সামনে পুব ও পশ্চিম কোণে মস্ত বড় আকাশমুখা দুটো বোম বাঁশ পোতা হয়েছে। সমস্ত গির্জার ঘর বার কলি ফেরানো ও দরজা জানালায় রঙ দেওয়া হচ্ছে। ঘরের ভেতরটা সাদা পেষ্ট লাইমের সঙ্গে রবিনসন মার্কা নীল রঙ মিশিয়ে চুণকাম আর বাইরেটায় শুরকির গুড়ো জলের সঙ্গে মিলিয়ে ইঁটে রঙ তৈরি করে লাগাচ্ছে বাগানের চারজন রাজমিস্ত্রী। জানালা, দরজায় দিচ্ছে শালিমারের সবুজ রঙের সঙ্গে লিনসিড অয়েল মিলিয়ে। গির্জাটার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে, নতুন নতুন গন্ধ আসছে। ঠিক সন্ধ্যেটায় বড়সাহেব আসেন একবার। প্রিচার এসে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করে। বড়সাহেব খুশি হয়ে বললেন—বেশ হচ্ছে। ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় দেখা গেল গেটটা বিচিত্র পাতাপুতি ও অসংখ্য

ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে। পুব পশ্চিম লম্বালম্বি বাঁশটার মাঝখানে একখানা লাল শালু টাঙানো। শালুটার মধ্যখানে মিশমিশে কালো কালি দিয়ে আঁকা মস্ত বড় একটা ক্রশ চিহ্ন। ফুল পাতাগুলো কুঠী থেকে পাঠিয়ে দিয়েছেন বড়সাহেব।

বাগানের সমস্ত নেপালী ও আদিবাসীর মনের কপাটে একটা শব্দ হয়। দরজাটা খুলে যায়। তাদের সমস্ত মন জুড়ে স্ব স্ব ধর্মের নারায়ণ, জিতবাহন ও করমগোঁসাইয়ের পুজোমণ্ডপ মূর্ত হয়ে ওঠে। একটা অজ্ঞাত বেদনায় মুখটা বিবর্ণ হয়ে পড়ে, বেরিয়ে আসে চাপা দীর্ঘশ্বাস। তাদেরও পুজো আছে, তারাও পুজো করে। কিন্তু এদের পুজো যেন আলাদা রকমের। এতে যেমন জাঁকজমক আছে, তেমনি প্রাণ আছে। আনন্দ অনেক বেশি।

এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয় তাদের মধ্যে। ভাওনাথ বলে—এ নিয়ে দুঃখ করো কেন তোমরা? দুঃখ মানুষকে ক্ষীণ ও দুর্বল করে। আর দুঃখ পঞ্চইন্দ্রিয়ের একটা ইন্দ্রিয়ের পরিপোষক। একে প্রশ্রয় দিলে মনইন্দ্রিয় বিকল হয়।

করুণসিং বললে—দুঃখ মানুষের স্বভাব। স্বভাবকে মানুষ কোনদিনই ত্যাগ করতে পারে না, পারবেও না। তবে এই পুজোতে সাজ আছে সাড়া নেই। মনটা এখানে সাজের দিকে, সাজের মধ্যকার জিনিসের দিকে নয়।

মদনফুল ব্যঙ্গচ্ছলে হাসতে হাসতে বলে—তুমি বামুনের ছেলে তাই তোমার মন সব সময় পরমার্থের দিকে। জীবনটাকে দূরে রেখেই কথা বলছ তুমি। জীবনে চাই আনন্দ। এই জাঁকজমক সাজসজ্জার মধ্যেই আছে আনন্দ। মনে আনন্দ পেলেই চোখের দৃষ্টি দূরপ্রসারী হয়। ঐ সাজের মধ্যকার জিনিসটাকেও দেখতে পাওয়া যায় আনন্দের মধ্যে।

অম্বরবাহাদুর বললে—আমি তোমাদের ও-সব কিছু বুঝি না। আমি মোটা বুদ্ধির লোক, মোটা কথাই বুঝি। সাহেবের এই পক্ষপাতিত্ব কেন? পুজো বলতে আমি বুঝি সবই এক। ওরাও শ্রমিক, আমরাও তাই। তাহলে ওদের বেলাতে কেন তিনি টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করবেন আর আমাদের বেলাতে মুফতে

দেওয়া তো দূরের কথা পুজোর জন্য পেন্সি চাইলেও ধমক দিয়ে ওঠেন।

কোলা ও প্রেমপ্রকাশ একসঙ্গে বলে ওঠে—ঠিকই বলেছে সর্দার। এই পক্ষপাতিত্ব কিছুতেই বরদাস্ত করবো না আমরা।

কথা হচ্ছিল স্কুল ঘরে। সমস্ত স্কুলটা যেন মুহূর্তের মধ্যে গরম হয়ে ওঠে। সকলেই সমস্বরে বলে ওঠে—বরদাস্ত করবো না।

বিলাসী বসে বসে সকলের কথা শুনছিল এতক্ষণ। এবারে আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বললে—উত্তেজিত হচ্ছ কেন তোমরা? আমাদের ক্ষমতা কতটুকু একবার ভেবে দেখ। আগে সকলে মিলে সঙ্ঘবদ্ধ হও। শক্তি সঞ্চয় করলে আপনা থেকেই সব আসবে। তখন আর ম্যানেজার আমাদের কোন কথাই উপেক্ষা করতে পারবেন না।

ভাওনাথ বললে—বিলাসী মাই ঠিকই বলেছে। সঙ্ঘবদ্ধ হও, আপনা থেকেই সব কিছু হাতের ওপর আসবে। আমরা পদে পদে বুঝতে বা অনুভব করতে পারছি তবু আমরা ঠকছি। সরকার বা বাগানের ওপরওলাদের যে কোন ধোঁয়ার মধ্যেই বড়রকমের একটা কিছু স্বার্থ আছে তাঁদের। এই যে কিছুদিন আগে ভেদনীতির ধোঁয়া তুলেছিলেন তা যদি ধর্মেরই অঙ্গ হবে তাহলে সেটা ছেড়ে আবার এই নতুন কারবার কেন আর কেনই বা তাঁরা খৃষ্টান শ্রমিক এনে আদিবাসীদের লাইনে ঢুকিয়েছেন। কেনইবা তাদের জন্য পৃথক লাইন, পৃথক রাস্তাঘাট, মেলা বা জলের কলের ব্যবস্থা করেন নি। এতই যদি দরদ থাকতো আমাদের ওপর তাহলে নিশ্চয়ই এ-সবই আলাদা করে দিতেন। তাই বলি ভেদনীতির প্রশ্ন শিকেয় তুলে সঙ্ঘবদ্ধ হও, সমিতি গঠন কর। বিশ্বাস করো না এই রাজার জাতিকে। আমাদের শাস্ত্রেই আছে এ-সব কথা।

বাগানে বাগানে খৃষ্টান শ্রমিকের আমদানী করাতে নেপালী ও আদিবাসীর টনক নড়ে। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করতে থাকে। এর ফলে শ্রমিকদের জাতিবিদ্বেষ মনভাবটা অনেকাংশে শিথিল হয়। জ্ঞাননগর ছাড়া আরো দু' চারটি বাগানে নাইট স্কুল প্রতিষ্ঠা করবার কথাবার্তা চলছে। অন্ধকারের জীবগুলো যেন আলোর

রোশনি দেখতে পেয়েছে। ইতিমধ্যে দলমাননগরের আশপাশের বাগান থেকে অনেকে এসে ভাওনাথের সঙ্গে অনেক বিষয়ের আলাপ আলোচনা করে। ভাওনাথ খুশী হয় মনে মনে। স্বপ্নের দিনগুলো যেন বাস্তব জগতে ফিরে এসেছে। স্বপ্ন বলে কিছু নেই, সবই সত্য। সত্য আছে বলেই স্বপ্ন আছে। স্বপ্ন তো অন্ধকারের আশার আলো, বাস্তব বা সত্যেরই একটা ইংগিত।

ইতিমধ্যে লর্ড আরউইনের সময়ে ১৯১৯ সালে যে নতুন শাসন সংস্কার ব্যবস্থা হয় তার ফলাফল বিচার করবার জন্য ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে এক সাইমন কমিশন নিযুক্ত হয়। এই কমিশন ভারতে পুর্ণ প্রাদেশিক স্বাধীনতা দান করার অভিমত প্রকাশ করেন। তবে এই কমিশনে কোনো ভারতবাসীর স্থান না থাকায় কংগ্রেস কমিশনকে বয়কট করে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু করেন।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। ডাণ্ডী অভিযান দ্বারা লবণ আইন অমান্য করার ফলে মহাত্মাজী, আরো অনেক নেতা ও হাজার হাজার স্ত্রী পুরুষ কারাবরণ করেন। আবার এই সময়ে অন্যদিকে বাঙ্গালী যুবক সম্প্রদায়কে ক্ষেপিয়ে তোলেন মাষ্টারদা সূর্য সেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে চাঁটগা অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করে যুবক সম্প্রদায়। এই কারণে ব্রিটিশ বড় সমস্যার সম্মুখীন হন। তখন তাঁরা লোক সাধারণকে নিরস্ত করবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। এই সময়ে সরকার রাজ্য মধ্যে জনসাধারণের শিক্ষার জন্য অনেক অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুলের ব্যবস্থা করেন। চা বাগানেও এই রকম স্কুলের ব্যবস্থা করার জন্য আদেশ আসে। অনেক ম্যানেজার অনিচ্ছা সত্বেও আদেশ পালন করতে বাধ্য হন। ফলে দেখতে দেখতে প্রায় সমস্ত বাগানেই স্কুলঘর তৈরী ও শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। স্কুলঘর তৈরি হলো, শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা হলো কিন্তু দুঃখের বিষয় তা শ্রমিকদের তেমন কোন উপকারে এলো না। কারণ শিক্ষক এলেন বাঙলাভাষী একজন বাঙ্গালী, তিনি হিন্দি জানেন না। একজ শ্রমিকদের ভ নক ছেলেমেয়েই স্কুলে গেল না। দু'চারজন

যারা বাংলা, ইংরেজী ও অঙ্ক শেখার জন্য যায় তাদের দুর্দশার একশেষ হয়। তাদের প্রতি শিক্ষক মশায়ের কোন দৃষ্টি নেই, তিনি সব সময়ই বাবুদের ছেলেমেয়ে নিয়েই ব্যস্ত। তারপর গালিগালাজের অন্ত ছিল না। একটু কথা বললেই অকথ্য ভাষায় গালাগাল, এমন কি বেত্রাঘাতে গায়ের ত্বক পর্যন্ত তুলে দেন। বাবুদের ছেলেমেয়ের গায়ে হাত দেওয়া তো দূরের কথা গলার স্বরটাও চড়া করেন না। হেসে হেসে কাছে ডেকে বুঝিয়ে দেন সব। এছাড়া বাবুদের ছেলেমেয়ের অত্যাচারও কম নয়। হঠাৎ গায়ে গা কিংবা জামা কাপড়ের ছোঁওয়া লাগলে বিশ্রীরকমের দাঁত খামচি, গালাগাল দেয়। অনেকে তো শোয়ার, জানোয়ার, ধাঙড় অনেক কিছু বেমানান কথা বলে দু'ঘা দিয়েই বসে। এতে প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা টু শব্দ করবার উপায় নেই তাদের। মনের মধ্যে নীরব কান্না কেঁদে মাপ চাইতে হয়। এই নিরপরাধ ছেলেমেয়েদের মধ্যে দু'চার জন শিশু ব্যথা সহ্য করতে না পেরে ডুকরে কেঁদে ওঠে কিন্তু এর ফলে তাদের আরো দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। শিক্ষক মশায় সঙ্গে সঙ্গে নাক মুখ সিঁকটে হুংকার দিয়ে উঠে বলেন—অন্যায় করে আবার কাঁদন হচ্ছে হারামজাদা, শোয়োরের বাচ্চা! বেতটা উঁচিয়ে বলেন—দেখেছিস, চুপ না করলে আরো দু'ঘা বসিয়ে দেব আমি। এই অন্যায় অত্যাচারে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শ্রমিকদের অনেক ছেলেমেয়ে সরকারী স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে।

এ সমস্ত খবরই রাখে ভাওনাথ। এ-নিয়ে অনেক আলোচনাও হয় বাগানে। অম্বরবাহাদুর একদিন বললে—তুমি তো কোন তাতেই বাবুদের দোষ দেখতে পাও না। আমার বিশ্বাস বাবু বাবুয়ানি খারাপ না হলে তাঁদের ছেলেমেয়ে কেন এমন হবে? বাড়িতে নিশ্চয়ই এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

ভাওনাথ বললে—বহুকালের একটা সংস্কার চলে আসছে তা কি একদিনে যায়। তারপর ওঁরা যেভাবে থাকতে অভ্যস্ত তার ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারবেন কেন? আমাদের ছেলেমেয়েদের নোংরা পোষাক পরিচ্ছদের বিটকিলে গন্ধ তাঁদের বিষিয়ে তোলে।

দিনের পরিবর্তন হচ্ছে, আর কিছুদিন বাদেই দেখতে পাবে সব এক হয়ে যাবে। সকলেই একভাবে থাকবে।

এই সময়ে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট বার হয়। এই রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার জন্য বহু প্রখ্যাত ব্রিটিশ ও ভারতীয় রাজনীতিবিদদিগের নিয়ে লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা হয় কিন্তু এই বৈঠকে কংগ্রেস যোগদান করেন না। এর ফলে বিক্ষোভ দেখা যায় এবং এ নিয়ে অনেক আলোচনা চলতে থাকে। এরপর লর্ড আরউইন ভারত থেকে বিদায় নেওয়ার পূর্ব মুহূর্তে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে অনেক সলাপরামর্শ করে একটা আপোস করেন। এই আপোস মিমাংসাকেই গান্ধী আরউইন চুক্তি বলে। এই চুক্তির ফলে কংগ্রেস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকএ যোগদান করেন এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদিগের মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ব্রিটিশের সহিত কংগ্রেসের মতানৈক্য হওয়ায় কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেন এবং চরমপন্থী দল বিদেশী জিনিস বর্জন, আইন অমান্য ও অনেক ইংরেজ কর্মচারি হত্যা করে কারারুদ্ধ হন। দেশে অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলতা দেখা দেয়। এই সময়ে লর্ড উইলিংডন ভারতবাসীর অসন্তোষ দূর করবার অভিপ্রায়ে নানা প্রকার দমন ও প্রসাদননীতি অবলম্বন করেন। চা বাগানেও এই বাতাস আসে। বাগানের সাহেবেরা তাদের নীতির একটু আধটু অদলবদল করেন। তবে শোষণ বা দমন নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। ইউরোপীয়ান ক্লাবে ক্লাবে ফুটবল খেলার মাঠ তৈরী হয়। প্রতি রবিবার বিকালে খেলা হয় সেখানে। এই খেলাতে যোগদান করার জন্য প্রথমটায় আহ্বান আসে বাবুদের। বাগান থেকে ক্লাব স্থান বিশেষে তিন চার মাইল দূরে তাই খেলোয়াড়দের আসা যাওয়ার ব্যবস্থা হয় লরীতে। মাসখানেক যেতে না যেতেই খৃষ্টান শ্রমিকদেরও ডাক আসে। বাবু আর খৃষ্টান শ্রমিকগুলো হৈ হল্লা করতে করতে লরীতে ওঠে আর নেপালী ও আদিবাসী শ্রমিকেরা একটা হতাশ দৃষ্টি মেলে তাদের দিকে চেয়ে

থাকে। একের আনন্দ আর অপরের বেদনা। প্রত্যেক নেপালী ও আদিবাসীর মধ্যে একটা অভিমান ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তবে এই বেদনা, অভিমান বা বিক্ষোভ বেশিদিন ভোগ করতে হয় না তাদের কারণ তিন মাস বাদেই বড়সাহেব বাগানের মেলাতে শুনিয়ে দেন—যার খুশি সেই খেলতে যেতে পারে ক্লাবে। সমস্ত বাগানময় একটা সাড়া পড়ে। শ্রমিকগুলোর মনে হয় ওরা যেন অনেক এগিয়ে গেছে। ওদের আবেদন, বেদনা এতদিনে মালিকদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। এই খেলার মাঠেও ওদের অনেক গালাগাল ড্যাম, ব্লাডি, ফুল অনেক কিছুই শুনতে হয়েছে তবু ওরা আনন্দ পায়, জীবনের অন্য একটা স্তরের স্বাদ অনুভব করে। খেলোয়াড়ের সংখ্যা বেড়ে যায়। বাগানে বাগানে খেলার মাঠ তৈরি হয়। আমোদ প্রমোদের ক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয়। শীতকালে গুদোমের লাগোয়া প্রাঙ্গনের মধ্যে ম্যাজিক, বায়স্কোপ, পুতুল নাচ প্রভৃতি খেলা দেখানো হয়। লোকগুলোর আনন্দ ধরে না। ওদের মনে হয়, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে। এবারে ওরা মনুষ্য পদবাচ্য হবে। এই সঙ্গে সঙ্গে অনেক অজ্ঞাত চিন্তা ও কল্পনা এসে ভিড় করতে শুরু করেছে মনে। মগজটা যেন আগের চেয়ে অনেক সক্রীয় ও বলিষ্ঠ।

ম্যাজিক কিম্বা পুতুল নাচের মধ্যে তেমন কোন সরকারী বিজ্ঞপ্তি বা প্রচারতা নেই কিন্তু বায়স্কোপের মধ্যে শুধুই সরকারী কার্যকলাপের প্রশস্তি। ভাওনাথের মনের পায়রা অবাধ স্বচ্ছন্দ আকাশে ওড়ে তবুও মাঝে মাঝে এই গতির বিরতি বা মন্থরতা হয়। লোকগুলো স্বাধীনভাবে অনেকটা ভাবতে শিখেছে। তবে এই প্রসাদননীতির মধ্যে কেমন যেন একটা চঞ্চলতা বা আপেক্ষিক বেদনা আছে। স্বাধীনতাকামী কংগ্রেস ও চরমপন্থী দলের মূলোচ্ছেদ করাই সরকারের অভিপ্রায়।

ইতিমধ্যে বাগানে বাগানে শ্রমিকদের মধ্যে দু'চারজন কংগ্রেস সেবক হিসাবে সুপ্তভাবে কাজ করতে থাকেন। এদের মধ্যে দু'একজন শ্রমিকও ছিল। বাগানের সাহেবেরা এ-কথা জানতে পেরে তাঁদের ঘরে হানা দেন। গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, সুভাষচন্দ্রের

ফটো মাটিতে ছুঁড়ে ফেলেন অথবা জুতোর আঘাতে খান খান করে ভেঙে ফেলেন। ফটো তো ভাঙে না, ভাঙে তাদের বুকের পাঁজরা। তবু কথা বলবার বা প্রতিবাদ করবার শক্তি নেই। এই সময়ে খদ্দরের কাপড় জামা ও টুপি পরার রেওয়াজ চলে। অনেকেরই ইচ্ছা হয় খদ্দরের কাপড় জামা ও টুপি পরে কিন্তু বাগানের সাহেবদের ভয়ে ইচ্ছা দমন করে রাখতে হয়। ইচ্ছা দমন করা মানেই মনের যন্ত্রণা বাড়ানো।

রুকুণসিং ভাওনাথও সকলকে বলে—এ শুধু মনের যন্ত্রণা বাড়ানো নয়। মনকে হত্যা করা। মন না থাকলে সব অন্ধকার। মন সুন্দর, মন জীবন। সামান্য ভয়ে আমরা সুন্দরকে হত্যা করছি।

ভাওনাথ বলে—মন কিম্বা সুন্দর মরে না। সে লুকিয়ে থাকে সকলের মধ্যে। হাওয়া বদলের অপেক্ষা করে। যে হাওয়া একদিন দুর্গন্ধ ও আবর্জনা নিয়ে আসে আবার সেই হাওয়াই আর একদিন এগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে যায় অন্য কোথাও। মনই ইচ্ছা, ইচ্ছাই মন। এই ইচ্ছা বা মনের জন্ম ঐ হাওয়ার মধ্যে। হাওয়া যখন আছে ইচ্ছাও আছে। হাওয়ার সঙ্গেই ইচ্ছা ঘুরছে, পাক খাচ্ছে। অঙ্কুর গাছে নয়, গাছেরই একটা ইংগিত বা আভাস মাত্র। এই অঙ্কুর থেকেই গাছ হবে আর এই অঙ্কুরও সময়ের অপেক্ষা করে। তার ওপরে অনেক ঝড় জল বৃষ্টি-বাদল ও পোকা-মাকড়ের অত্যাচার হয় তবু তার ইচ্ছা বা মন থাকে এবং সেই জন্যই একদিন সে একটা ফলবান বৃক্ষে পরিণত হয়।

অম্বরবাহাদুর বললে—কিন্তু আমাদের মত এই শ্রমিকজাতির ওপরেই যেন ঝড় জলের ঝাপটা জোরালো। আমাদের জীবনটাই ঐরকম।

ভাওনাথ বললে—সকলের জীবনেই কম বেশি ঝড়জল আছে। ঝড়জল না থাকলে তো সুন্দর, অসুন্দর কিছুই উপলব্ধি করতে পারতাম না। জীবনটা এক ঘেয়ে হতো।

এরমধ্যে হঠাৎ চায়ের বাজারে ফাটল লাগে। চায়ের দাম

কমে অর্ধেকে দাঁড়ায়। ভাল চা ছাড়া খারাপ চায়ের চাহিদা মোটেই থাকে না। এর আগে যুদ্ধের সময় থেকে এই পর্যন্ত সমস্ত বাগানেই পরিমাণের দিকে লক্ষ্য ছিল. এর ফলে বেপরোয়া চা তৈরি হয়। গাছের বুড়ো শক্ত পাতা ও ডাণ্টিগুলোরও চা করা হয়। বাজারে অপরিয্যাপ্ত পরিমাণ চা মজুত থেকে যায়। সমস্ত বাগানেই কোম্পানী থেকে হুকুম আসে ভাল চায়ের দিকে দিতে, বাগানের ম্যানেজারেরা যেন কখনও পরিমাণের দিকে না দেন। এই ভাল চা তৈরি করতে হলে নরম পাতা ও ডাণ্টির প্রয়োজন। তার মানেই দু'টি পাতা, একটি কুড়ি। এই দুটি পাতা একটি কুড়ি তোলা বড় শক্ত। হাত এবং দৃষ্টি দুটো জিনিসকেই বিশেষ সতর্ক রাখতে হয়। আবার এই পাতির ওজনও অতিশয় কম। সময় মন ও মেজাজ লাগে বেশি কিন্তু পারিশ্রমিক নেই বললেই চলে। এরপর হাত, মন ও মেজাজ কোন সময়ে অসতর্ক হয়ে ঠিকমত ভাবে পাতি তুলতে না পারলে কামদারি, চাপরাসী ও সাহেববাবুদের গালাগালের অন্ত নেই, অনেক ক্ষেত্রে হাজিরাই কাটা যায়। পাতি তোলার কড়াকড়িতে এবং ওজন কম হওয়াতে পাতির উপরি পাওনাটা শুন্যের কোঠায় দাঁড়ায়। ফলে, আয় কমে যায় শ্রমিকদের। অথচ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্তরের দাম সোনার চেয়েও বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জন্য বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় শ্রমিকমহলে কিন্তু টু শব্দ করার উপায় নেই। ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সুদিনের আশায় দিন গোণে সকলে। এদিকে যে যা অল্প মূল্যের দু'একখানি গয়না তৈরি করেছিল তা সবই বাগানের মাড়োয়ারীর দোকানে অপরিমিত সুদে বন্ধক পড়ে। দু'তিন মাসের মধ্যে চায়ের বাজারে চরম সমস্যা দেখা দেয়। চারদিকে হাহাকার। প্রতিদিনই চিঠিপত্তর আসতে থাকে খরচ কমতি করার জন্য। বিলেত থেকে রোলার শুকলাই, চা কাটাই, শর্টিং মেসিন, বয়েলার, ইঞ্জিন এলো কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা বাগানে গুদোমে অথবা গুদোমের সামনে ঢিপি করা থাকলো, স্থাপন করা হয়ে ওঠে না। গুদোম ঘর, বাবুবাসা, হাসপাতাল যেখানে যা হচ্ছিল তা তেমনিভাবে অসমাপ্ত পড়ে রইলো।

মজফরপুর দারভাঙ্গার ঠিকাদার ও রাজমিস্ত্রীরা দেশে চলে যায়। বাসা কম ছিল বলে অবিবাহিত বাবুরা মেস করে থাকতো। এটাকে মেসবাসা বলা হয়। এই মেসবাসার বাবুদের মধ্যে দু'একজন নতুন বিয়ে করেছে। বাসা তৈরি হচ্ছে আর এক আধ মাসের মধ্যে তারা অন্য বাসায় যাবে, নিজের মত ঘর সংসার বাঁধবে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাবে। তারা বড় মুষড়ে পড়েছে। দুটি প্রাণ দুই দিকে, কত দূরে তবু তাদের এক কান্না। সে কান্না শোনার লোক নেই। চাকরি থাকবে কি থাকবে না সে চিন্তা থেকে তারা অনেক দূরে। মাঝেমাঝে মনে করে এরকম চাকরি না থাকলেই ভাল। কোম্পানী থেকে খবর এলো—খরচ কমাও, ষ্টাফ কমাও। কুলি রিক্রুটিং বন্ধ হয়ে গেল। সর্দারদের মধ্যে হা হুতাশের বাতাস বইতে থাকে। কান্নাকাটি পড়ে যায় বাবু-মহলে। বড়বাবুর কদর বেড়েছে। সকলেই তার পিছনে পিছনে লেজাড়ীর মত লেগে থাকে, হুকুম তামিল করে। বড়গিন্নির আদরও বেড়ে গেছে। সকাল বিকেল সব সময়ই বাড়িতে ভিড় লেগে আছে মেয়েদের। বড়গিন্নির মগজ যেন বেশি খুলে গেছে। তাঁর মত বুদ্ধিমতী আর দ্বিতীয়টি নেই বাগানে। যত খুঁটিনাটি হাঁড়ির খবর জানতে পারছেন রোজ। গম্ভীর ভাবে পরামর্শ ও আশ্বাস দেন সকলকেই। মুখ শুকনো করে বলেন—দেখি কি করতে পারি? উনি হতাশ হয়ে পড়েছেন ভাবতে ভাবতে। সব সময়ই দুঃখ করেন, বলেন—ভগবান যে কি করবেন, এদের অবস্থা যে কি হবে কে জানে। আমি তাই তোমাদের কথা বলেছি, বলেছি যে করেই হোক তোমাদের বাঁচাতে। এই বাঁধাধরা কথা ক'টি সকলকেই বলেন তিনি। কামদারি, চাপরাসীদেরও অবস্থা সঙ্গীন। মুন্সীর পোয়াবারো। তার বাড়িতেও কামদারি, চাপরাসীর ভিড়। মেলাতে কাজকর্মের খুব সুবিধা হয়েছে। কোথাও কোন ফাঁকি নেই। সাহেববাবুর কাছে খারাপ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে হয় না।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় বড়সাহেব বড়বাবু ও মুন্সীর মধ্যে পরামর্শ হয়। কারে কারে ছাঁটাই করা যায় এ সমস্ত আলোচনাই হয় তাদের মধ্যে।

সাহেবদের ক্লাবেও প্রায়ই মিটিং বসে এ-নিয়ে। কোম্পানীর কড়া কড়া চিঠির উত্তর ও জবাবদিহি করতে প্রাণান্ত। খরচের একটু এদিক ওদিক হলে আর রক্ষা নেই। সকলের মুখেই ঐ এক কথা। বাবু ও কামদারি চাপরাসী ছাঁটাই ভিন্ন অন্য উপায় নেই।

এই সময়ে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস জোর মাথা চাগিয়ে ওঠেন। কোম্পানী ও সাহেবেরা বাবু ও কামদারি চাপরাসী ছাঁটাইএর যে প্রস্তাব তোলেন তাতে বিক্ষোভ প্রকাশ করেন ট্রেড ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীরা। এঁরা প্রস্তাব করেন সাহেবেরা মোটা মাইনে ও কমিশন পান তখন তাঁদের বেতন কমিয়ে দেওয়া হোক্। সমস্ত চা বাগানেই এ কথা রটে যায়। সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক, কামদারি চাপরাসীর উত্তেজনা বাড়ে। আশপাশের অনেক বাগান থেকেও অনেক লোক আসে ভাওনাথের কাছে। ভাওনাথ ধীর স্থির চিত্তে সকলের কথা শোনে। উত্তেজিত লোকগুলোকে হঠকারিতা সম্বন্ধে সাবধান করে দেয়। বলে সময়ে চাকা ঘুরবে, একটু অপেক্ষা কর, দেখই না কি হয় ?

বিলাসী, অম্বরবাহাদুর, করুণসিং এবং আরো অনেকেই ভাওনাথকে জিগ্যেস করে, আচ্ছা, সত্যিই কি কোম্পানীর লোকসান হচ্ছে আজকাল ?

ভাওনাথ এ-কথা বহু আগেই চিন্তা করেছে। অনেকদিন কাগজ কলম পেন্সিল নিয়ে মোটামুটি যতটা সম্ভব হিসাব করে দেখেছে। সে বললে—আমি দলমাননগর, জ্ঞাননগর ও আরো দু চারটে বাগানের আয় ব্যয়ের একটা হিসাব করে দেখেছি লোকসান কিছুই হচ্ছে না তবে আগের মত লাভ হচ্ছে না।

করুণসিং আশ্চর্য হয়ে বললে—আমি তো বুঝতে পারছিনে, কি করে হিসাব করলে তুমি ?

ঠিক হিসাব নয়। কত চা হয়েছে খবরটা সংগ্রহ করেছি। তারপর প্রতি পাউণ্ডের একটা গড়পড়তা দাম কষে নিয়ে আয়টা বার করেছি। আর ব্যয়ের অঙ্কটা নিয়েছি অফিসের বাবুদের নিকট থেকে।

অম্বরবাহাদুর জিগ্যেস করে—তোমাকে তা দিলে ওঁরা ?

দেবেন না কেন? সমস্যা যখন এক হয় তখন বনের বাঘ আর গৃহপালিত বিড়াল এক, মাসী আর বোনঝি সম্বন্ধ।

বিলাসী এতক্ষণ নীরব ছিল। এবারে বললে—তাহলে এই সব অবাঞ্ছিত ধোঁয়া তুলেছেন কেন সাহেব, কোম্পানী?

ভাওনাথ বললে—জানোই তো লোভের অন্ত নেই। আর খেতে খেতে গলা বেড়ে গেছে, এখন আর অল্পেতে গলা ভেজে না।

অমরবাহাদুর উত্তেজিত কণ্ঠে বলে ওঠে—তাহলে তো আমাদের প্রতিবাদ করা উচিত।

—এখনও যখন কিছু পাকাপাকি স্থির হয়নি তখন প্রতিবাদ জানিয়ে কোন ফল নেই বললে ভাওনাথ। আর বাগানে সর্বত্র যখন একটা সাড়া পড়েছে তখন হয়ত শেষ পর্যন্ত ছাঁটাইওটাই কিছুই হবে না।

এদিকে দুই তিন সপ্তাহের মধ্যেই বাগানের অনেক পরিবর্তন ঘটে। সাহেবেরা আসন্ন গুরুতর পরিস্থিতির সম্ভাবনায় আঁতকে ওঠেন। মিটিং বসে ক্লাবে। এতে ঠিক হয় যে তাঁরা সকলে মিলে যে যাঁর কোম্পানীকে লিখবেন। তাঁরা লিখলেন—বাগানের বর্তমান পরিস্থিতি বিচার করে দেখতে পাই যে বাবু, কামদারি বা চাপরাসী ছাঁটাই সম্ভবপর নয়। এতে গোলযোগের সৃষ্টি হবে বাগানে। তাঁরা প্রস্তাব করেন—কোম্পানীর যখন একান্তই দুর্দিন তখন মাসিক বেতনভোগীদের শতকরা দশ টাকা মাইনে কমিয়ে দেওয়া হোক।

এরপর সমস্ত কোম্পানীই এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বাগানও অনেকটা শান্ত হয়। কিন্তু দুঃখের অবসান হয় না। খাওয়া-পরা ঠিক মত হচ্ছে না। দিনগত পাপক্ষয়। সকলেরই মুখ শুকনো। বিশেষ করে দুপুর বেলাটাতে। মা বাবা ছেলে-মেয়েগুলোর মুখের দিকে চেয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। কচি ছেলে-মেয়েগুলোর টলটলে চোখ স্তিমিতপ্রায়, মুখ শুকিয়ে পোড়া বেগুনের মত চিমসে হয়ে যায়। ভাজাওলা পথের দিকে চেয়ে থাকে। অনেক ছেলেমেয়ে আসে। সতৃষ্ণ নয়নে চেয়ে থাকে ভাজা মটর, বাদাম, ফুলুরি বেগুনিগুলোর দিকে। কারো কারো মুখে একটা

শব্দ হয়, ঢোক গিলে শুকনো গলাটা নরম করে। ছেলেগুলোর রাস্তাঘাটের খেলাধুলো কমে গেছে।

ভাওনাথ মনে মনে ভাবে এই তো আমাদের জীবন। সে অবাক হয়, চিন্তার মধ্যে তলিয়ে পড়ে—কেন এরা বেঁচে থাকে, কেনই বা বেঁচে থাকার জন্য এই সংগ্রাম। কী আনন্দ আছে এইরকম বেঁচে থাকার মধ্যে। সারাদিনের কঠোর অমানুষিক পরিশ্রম। তার বিনিময়ে নিতান্ত সাধারণ সারশূন্য অন্ন খাওয়া-পরা। ছেলেমেয়ে বুড়োগুড়ো সারবেঁধে কাজে যায় সকালে। ভাওনাথের মনে হয় এইমাত্র যেন পৃথিবীর বুক থেকে বেরিয়ে এলো অসংখ্য কীট, পোকা। কি জন্য এলো? শুধু ছুটো খেতে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে অনেক ছবি, অনেক স্মৃতি। স্মৃতিগুলো যেন উপহাস করছে ভাওনাথকে।

এই সময়ে স্কুলের অবস্থাও অনেকটা খারাপ হয়। কারণ পড়ুয়ারা যে যা চাঁদা দিত মাসে তারা আর তা ঠিকমত দিয়ে উঠতে পারে না। কেতাবপত্তর কেনাকাটা কমে যায় পয়সাকড়ির টানাটানিতে। শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠক বসে বিলাসীর বাড়িতে। এই বৈঠকে ভাওনাথ উপস্থিত সকলকে বলে—তোমরা তো সবাই জানো যে পড়ুয়ারা আজকাল ঠিকমত স্কুলের চাঁদা দিয়ে উঠতে পারে না। এদিকে আগের উদ্বৃত্ত টাকা পয়সা যা ছিল তা প্রায় নিঃশেষিত হয়েছে। এখন যা হোক একটা ব্যবস্থা করা দরকার আমাদের।

কোলা বললে—এতে কি হয়েছে? কেতাব কাগজপত্তর যা আনা হতো তা আগের মতই আনা হবে। বলেই অম্বরবাহাদুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—কি বলো সর্দার?

অম্বরবাহাদুর বললে—তা তো বুঝলাম। কিন্তু ম্যাও ধরে কে? সকলেরই তো অভাব।

বিলাসী বললে—অভাব তো চিরকালই থাকবে। এই অভাবের মধ্য দিয়েই স্বভাবকে পেতে হবে। ভাওনাথের কাছে জানতে পারলাম যতদিন এই অবস্থা থাকে বাগানের ততদিন নাকি প্রতি মাসে পঁচিশ ছাব্বিশ টাকার ঘাটতি হবে। এই টাকা যে করে

হোক আমাদের উঠাতে হবে। সমস্ত টাকা তো একজনের পক্ষে দেওয়া সম্ভবপর নয় তাই আমার মনে হয় যারা সত্যিই স্কুলটাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে তারাই আরো কিছু কিছু দিয়ে স্কুলটাকে আগের মতই চালু রাখুক। ইচ্ছা মত সকলেই, অবশ্য যার ক্ষমতা আছে তার কথাই বলছি, কিছু কিছু দিলে এই ঘাটতির পুরণ হবে। আমি আড়াই টাকা তিনটাকা দিতে রাজী আছি।

অম্বরবাহাদুর বললে—আচ্ছা আমিও আড়াই কি তিন টাকা দেব।

এরপর প্রেমপ্রকাশ, করুণসিং, মন্তরে, ভাওনাথ, মদনফুল আরো দু'একজন অনুরূপ সাহায্য করতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু কোলা নিরুত্তর থাকে। কোলার ছেলে বারে বারে তার বাবার মুখের দিকে তাকায়। তাকে নিরুত্তর থাকতে দেখে কেমন একটা বিরক্তি অনুভব করে সে।

কোলা ছেলের হাবভাব লক্ষ্য করে বললে, আচ্ছা আমিও কিছু দেব তবে অতটা পারব না কারণ তোমরা তো জানো আজকাল আয় অনেক কমে গেছে আমার। ঠীকা নেই, তার ওপর সর্দারী কমিশনও অনেক কম পাই।

সর্দার ঠীকাদারের আয় যে কমে গেছে তা সকলেই জানে কারণ আজকাল বাগানে এক হাজরির বেশি কাজ হয় না। সর্দারের কমিশন তো যত হাজরি তত পয়সা। তারপর ঠীকা তো একদম বন্ধ। করুণসিং বললে—তা হলেও তুমি কত দিতে পারবে সেটা জানা দরকার কারণ যে করেই হোক ঘাটতি পুরণ করতেই হবে আমাদের।

কোলা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললে—আচ্ছা, আমি না হয় একটা টাকা দেব।

যাহোক এতে করে অনেকটা ঘাটতি পুরণ হয়। তবু সকলেই মনে মনে খুশী হয় কারণ এই অভাব অনটনের মধ্যেও পড়াশুনা চলছে, মনের ভাবধারার পরিবর্তন হচ্ছে। এর মধ্যে অনেক বাগানেই স্কুল হয়েছে। অনেকেই নিজেদের [illegible] চিন্তা করে।

সূর্য-করোজ্জ্বল-আলোকে স্নান করে ওঠে। মনের কপাটে বাইরের বাতাস এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। খালি পেটে যেন সাধনা বেশি জমাট বাঁধে। চিন্তাশক্তির উৎকর্ষতা বাড়ে। অনেক আলোচনা হয়। এই আলোচনার মাধ্যমে চিন্তার স্তরে স্তরে জীবনের অনেক দিকের রূপ ফুটে ওঠে। সমস্ত জীবনের নলচে খোল বদলি করে নতুন একটা পটভূমি তৈরি করবার পরিকল্পনা করে। যে পটভূমির ওপর এই দুনিয়ার আর আর মানুষ দাঁড়িয়ে আছে তারাও সেই পটভূমির ওপর দাঁড়িয়ে বলতে চায়—তোমাতে আমাতে কোন প্রভেদ নেই। এই দুদিনের মধ্যেও সুদিনের আলোকরশ্মিতে তাদের খালি পেট ভরে ওঠে।

এই অবস্থার মধ্যে পুরো চারটি বছর কেটে যায় মজুরদের। তারপর আর এক দিনের জন্ম হয়। এই দিন নিয়ে আসে আর এক আলো বাতাস। সমস্ত বাগান হেসে ওঠে। শিরীষ ধাঁকড়ের শুকনো মুটিগুলো ঝরে গিয়ে নতুন পাতা গজায়। তারপর হলদে হলদে ফুলে গাছ ভরে ওঠে। চায়ের চাহিদা বাড়ে। পরিত্যক্ত অনেক চৌপল পরিষ্কার ও মার্জিত করা হয়। আবার হাজরি ডবলি কাজ শুরু হয় বাগানে বাগানে। সাহেব, বাবু, কামদারি চাপরাসী যাদের মাইনে কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল আবার তা পুনর্বর্তিত হয়।

ছয়

আলো আর অন্ধকার নিয়েই দিন। মানুষের জীবনও ঠিক তাই। মানুষের সমস্ত জীবনটাকে টুকরো টুকরো করে চোখ মেলে দেখলে দেখতে পাওয়া যায় একদিকে দুস্তর ধু ধু মরু আর অন্যদিকে বহুদূর বিস্তীর্ণ ছায়া স্নিগ্ধ তরুবীথি, একদিক থেকে আসছে মরুভূমির উত্তপ্ত হাওয়া আর অপর দিক থেকে আসছে বসন্তের স্নিগ্ধ সুগন্ধ ফুলেল হাওয়া।

সাত আট বছর কাটে বসন্তের শস্য-শ্যামল ছায়া ও গন্ধে। মনটা গড়ে ওঠে অন্য ছাঁচে। এর মধ্যে হঠাৎ দুস্তর মরুর গরম হাওয়া এসে সেই শস্য-শ্যামল ছায়া, গন্ধ হারিয়ে যায়।- মানুষ তখন অনন্যোপায়, দুর্গম মরুপথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়। জীবন হাফিয়ে ওঠে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর। মাস হিসাবে বাংলার শরৎকাল। কিন্তু শরৎসম্ভার নেই। তার সমস্ত সম্পদ যেন কোথায় কোন কালবৈশাখীর উড়ন্ত ধুলোবালির মধ্যে কোনঠাসা হয়ে পড়ে আছে।

দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। ইংলণ্ড আর জার্মানীর মধ্যে। এতে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। ভারতের পক্ষ হয়ে ইংরেজ জার্মানীর সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করলে ভারতের নেতৃবর্গ জোর প্রতিবাদ করেন। এই সময়ে ইংরেজ যুদ্ধ-শেষে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারতবাসীকে যুদ্ধে যোগদান করতে সম্মত করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই দাবী অগ্রাহ্য করায়, মহাত্মাজী আবার সত্যাগ্রহ শুরু করেন। এই রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য পার্লামেণ্ট স্যার ষ্টাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতে পাঠান। কিন্তু ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দানে স্বীকৃত না হাওয়ায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি 'ভারত ছাড়' আন্দোলন আরম্ভ করেন। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট তখন কংগ্রেস

প্রতিষ্ঠানসমূহকে অবৈধ বলে ঘোষণা করে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতি নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করেন। এতে ভারতবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। এই বিক্ষোভকেই 'আগষ্ট বিপ্লব' বলা হয়।

এই সময়ে চা বাগানগুলোতেও অনেক ঘটনা ঘটে। শ্রমিকের দলও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এই সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে এই নীতি দমনের জন্ম অসম্ভবভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন বাগানের ম্যানেজার ও মালিকসম্প্রদায়। ইতিমধ্যে অনেক শ্রমিকের মধ্যে গান্ধীটুপির প্রচলন হয়। মালিকসম্প্রদায় ও ম্যানেজারেরা এতে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এমন কি অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে শ্রমিকদের মাথা থেকে টুপি নিয়ে গোল্লা পাকিয়ে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা বাড়ে কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে পেটের ভয়ে সত্তাকে অন্তদিকে ঠেলে ফেলে রাখে। এ ছাড়া শ্রমিকদের অনেকের ঘরে হানা দেন সাহেবরা। অনেকের ঘরেই গান্ধীর ফটো ছিল সেগুলোকে নিয়ে এসে টুকরো টুকরো করে মাটিতে ফেলে জুতোর আঘাত দেন। বুক ফেটে যায় শ্রমিকদের কিন্তু টু শব্দ করবার উপায় নেই। অনেক কষ্টের উপার্জিত আট আনা দশ আনার ছোট একটা ফটো তাদের কাছে লাখ টাকার সামিল। না খেয়ে না পরে কেনা এই ফটো। গায়ের রক্ত ও মনের স্বপ্নের এই ফটো। তারা প্রায়ই আলোচনা করে—দেহটাকে বিক্রি করেছি কিন্তু মনটাকে তো বিক্রি করিনি। তবে কেন এমন হয়?

ভাওনাথ সবাইকে বলে—মনের সাগরে যখন ঢেউ এসেছে তখন তাকে ধরে রাখতে পারবে না কেউ। সে তিল তিল করে তার আপন গন্তব্য পথে চলতেই থাকবে। তোমরা সকলেই জান—লুব্ধ শাসক যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে তখন ভুলে যায় যে শাসিতের সহানুভূতি ছাড়া তার জয়যাত্রা অসম্ভব। আর তার এই ক্ষিপ্ততাই শাসিতের স্বাতন্ত্র্যতা উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। একবার মনের দিকে চেয়ে দেখ। আমাদের আগের মনটা ছিল একটা নিশ্চল জড় নিকষ অন্ধকার পিণ্ড কিন্তু আজকার মনে ঐ অন্ধকারের মধ্যে অনেক আলোর ঝিলকি দেখা দিয়েছে। মনের

মধ্যে আর এক মন বা মনন জন্ম নিয়েছে। আমরা ধাপে ধাপে এগিয়ে চলেছি নতুন মনের আলোকের ধারা বেয়ে।

ভাওনাথের এই সমস্ত সারগর্ভ কথাতেও শ্রমিকদের মনের আগুন নিভে না। তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। ভাওনাথ তাদের মনের গতির রাস টেনে ধরে নানা দেশ বিদেশের কথা তোলে। লোকগুলো কিছুটা শান্ত হয়। ভাওনাথ বলে—ফটো ভাঙছে সাহেবেরা তাতে কি ক্ষতি হয়েছে আমাদের। মনের ফ্রেমে যে ফটো একবার বাঁধা পড়েছে তাকে তো ভাঙতে পারবে না কেউ বরং আমার মনে হয় আরো জমাট হয়ে বাঁধা পড়ছে। মনের মধ্যে প্রবল সাড়া জেগেছে। আর মনের সাড়াই তো সবচেয়ে বড় বা কার্যকরী।

শাসকদের নির্মমতা ও শাসিতের দুর্দশার মধ্যেও আশা দেখতে পায় ভাওনাথ। দিন দিন স্কুলের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। গভীর নৈরাশ্য ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে হাসি আছে। তারা হাসে, খেলে আবার দীর্ঘশ্বাসও ফেলে। এই দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে স্বস্তি আছে, আরাম আছে। ভারী মনটা হালকা হয়, মুখটা ফুলের মত হেসে ওঠে। দুরাগত নতুন আলো বাতাসের গন্ধ পায়। সমস্ত বাগানগুলোতে খবর রটে যায় যে শ্রমিকদের মধ্য থেকে একজন সভ্য নেওয়া হবে সে চা বাগিচার শ্রমিকদের সমস্ত আবেদন, নিবেদন, দুঃখদৈন্য অভাব অভিযোগ মন্ত্রীসভায় উত্থাপন করবে। সকলেই ভাওনাথকে অভিনন্দন জানায়। তাদের বিশ্বাস ভাওনাথই তাদের মধ্যে একমাত্র উপযুক্ত এবং তারা নিশ্চিত ভাবেই ধরে নেয় যে এ বিষয়ে কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে না আর করলেও তা ধোপে টিকবে না। কিন্তু যন্ত্রের কাঠি যে কে কখন কি ভাবে ঘুরাচ্ছে এবং তার পরিণতিই বা কি তা তাদের সহজ সরল মগজে আসেনি। যাদুকর কাঠি ঘুরিয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতের রসগোল্লা কোথায় উধাও হয়ে একটা কুইনাইন ট্যাবলেটে পরিণত হয়। সমস্ত মুখটা তিক্ত হয়ে যায়। মনটা ও।

সমস্ত বাগানের মালিক ও ম্যানেজার সম্প্রদায় এক শিখণ্ডি খাড়া করেন। নির্বাচনী সভায় হঠাৎ দেখা গেল সেই অজ্ঞাত কুলশীল

নিরক্ষর শালকুমারই বিরাট শাল মহীরূহরূপে নির্বাচিত হয়ে গেল। সেই লেংটিপরা কালো পাথরের মত নিশ্চল লোকটাকে আর চেনা যায় না। পরিধানে লেংটির পরিবর্তে প্যাণ্ট। পায়ে জোতা। বহুকালের রুক্ষ তেলবিহীন এলোমেলো চুলগুলোতে তেল পড়েছে। চিরুণী দিয়ে সেগুলো যথাসম্ভব বিন্যস্ত বা সংযত করা হয়েছে। তবু অভ্যাস ত্যাগ করতে পারেনি চুল। এর কতকগুলো কাঁকে কাঁকে লৌহশলাকার মত আকাশমুখী দাঁড়িয়ে আছে।

সমস্ত চা বাগানগুলোতে একটা নৈরাশ্যের ছায়াপাত হয়। সকলের মুখেই এক কথা—ঐ [illegible] শালকুমার আর কি করতে পারবে তাদের জন্যে। এর চেয়ে আসন শূন্য থাকাই ভাল ছিল কারণ এতে তো [illegible]র ভোটসংখ্যা বাড়বে।

ভাওনাথ বললে—কথাটা ঠিক। তবে শালকুমার সভ্য হওয়াতে আখেরে ভালোই হলো আমাদের। শ্রমিকদের তরফ থেকে একজন সভ্য তো হলো। পরবর্তী নির্বাচনে ভোল বদলে যাবে। তারপর সেও তো শ্রমিক, আমার বিশ্বাস নিশ্চয়ই আমাদের অভাব অভিযোগ, দুঃখদৈন্য তার মনের দুয়ারে আঘাত হানবে।

কতকটা আশা আর হতাশা। এই দোমনা দোটানা মন নিয়ে কাজ করে তারা। এরমধ্যে যুদ্ধ জোরতালে আরম্ভ হয়। সমস্ত পৃথিবী কেঁপে ওঠে। বিদেশের জাহাজ চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সাহেব মহলে কান্নাকাটি পড়ে। অনেকের স্বপ্নসৌধ ভেঙে চুরমার হয়। শুধু স্মৃতিমন্থনের বেদনা ও দীর্ঘশ্বাসে সারা মনটা পাম্পকরা বলের মত কেঁপে ওঠে। সাত সমুদ্র তেরো নদীর পারের অনেক কান্না এসে ভিড় করে ওদের মনে। আমেরিকা থেকে অনেক আমেরিকান ও যুদ্ধ সরঞ্জামে সারা ভারতবর্ষ ভরতি হয়ে যায়। নদীর পাড়ে, জঙ্গলের মধ্যে অনেক তাঁবু খাটিয়ে বসেন তাঁরা। এরাজ্য যেন বিট্রিশ বা ভারতবাসীর নয়, তাঁদেরই। এই রকম চালে থাকেন তাঁরা। কোন জিনিস পত্তরেই অভাব নেই তাঁদের। অনেক বড় বড় [illegible] পরিবারের জিনিসপত্তর ও সাজ সরঞ্জামে ভরতি তাঁবু। অনেক বড় বড় স্থায়ী পরিবারের ঘরেও এত ঐশ্বর্য,

বিদি জিনিসপত্তর দেখতে পাওয়া যায় না। আমোদ প্রমোদেরও অভাব নেই, তাঁদের জীবন যে গোলাবারুদ ও সঙ্গীনের মুখে এ কথা যেন তাঁরা জানেন না। বাগানের মধ্যেও অনেক মিলিটারী ঘাটী বসে। তৈরি শুরু হয় বিমানঘাটী। অনেক বনজঙ্গল কেটে যাতায়াতের পাকা রাস্তা। জিভ্‌ ও মিলিটারী গাড়িতে গাড়িতে ভরে যায় চা বাগানের রাস্তাঘাট, বিমানঘাটী। বাগানগুলোর উপরে আকাশে বাতাসে উড়তে থাকে অসংখ্য উড়োজাহাজ। বিমানঘাটীর গুদোম ঘর রসদ ও মালমসলায় ভরতি হয়ে যায়। শ্রমিকরা উড়ো জাহাজের শব্দে চমকে ওঠে। মেলাতে হাতের কাজ ফেলে উপরের দিকে হাঁ করে অবাকদৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। অনেকে তো পা পা করে পিছিয়ে যায়—কি জানি মাথার ওপর না পড়ে। একদিকে ভয় আর অন্য দিকে বিস্ময়। মাঝে মাঝে চিন্তা হয়, নিশ্চল হয়ে ভাবে। মানুষেরই তো তৈরি এ-সব। তাহলে মানুষ কি না করতে পারে? উৎসাহ বাড়ে, উচ্চ আকাঙ্খায় মন বিচলিত হয়। জন্ম নেয় একটা শক্তি, দৃঢ়তা।

মিলিটারীদের জন্য যে পরিমাণ পাকা ঘর বাড়ি, রাস্তাঘাট, গুদোম অফিস তৈরি হতে শুরু হয় তাতে অসংখ্য লোকের প্রয়োজন। বহুদুর বিস্তৃত ভুরষা নদীর পুর্ব তীরভূমিতে দিনরাত মেয়ে পুরুষ শ্রমিকদের কাজ চলছে। তাদের কাজ ছোট বড় সমস্ত রকম পাথর ও বালু সংগ্রহ করে ঢিপি দেওয়া। সর্বজয়ী মিলিটারী ট্রাক আসছে সোঁ সোঁ ভোঁ ভোঁ শব্দ করে। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত ঢিপিকরা পাথর বালির জায়গা শূন্য করে গাড়ি চলে যায়। আবার বালি পাথরের ঢিপি তৈরি হয়—আবার ট্রাক এসে নিয়ে যায়। ভুতের মত কাজ চলছে, মনে হয় কোথাও কোন অদৃশ্য হাত আছে এতে। বিকেলে ঠিক সন্ধ্যার পুর্ব মুহূর্তেও যেখানে কোন ঘরবাড়ির অথবা মানুষের পদচিহ্ন ছিল না শুধু জঙ্গল আর জঙ্গল আর বন্যপশুর বিকট চীৎকারে সমস্ত ছিল তা ভোর না হতেই দেখা যায় লোকে ভরতি হয়ে গেছে। জঙ্গল তো দুরের কথা একটা কুটো কি খড় খাগড়া পর্যন্ত নেই। সেখানে চলছে চুণ বালি সুরকি পাথরের কাজ। তৈরি হয়েছে ঘরবাড়ি, পাম্প বসেছে জলের কলের অথবা

বালি পাথর খুঁড়ে কুয়ো তৈরি হয়েছে। জঙ্গলের মধ্যদিয়ে আঁকাবাঁকা পথ তৈরি করা হয়েছে যাতায়াতের জন্তে।

সাত সাতটা সাঁতালী, শালকুমোর গারো ও অন্ত অন্ত সমস্ত বস্তির মেচ ও গারো মেয়ে পুরুষ দিনরাত সমানে কাজ করছে। এখানে টাকার কোন দাম নেই, দাম কাজের।

চা বাগানের অনেক শ্রমিকেরই এ দিকে নজর পড়ে। তুলনা-মূলক ভাবে এদের কাজের গুরুত্ব ও পারিশ্রমিকের সঙ্গে তাদের বাগানের কাজের তুলনা করে। এদের কাজের চেয়ে তাদের কাজও কম শক্ত নয় কিন্তু পারিশ্রমিক এই তুলনায় অত্যন্ত কম। কাজের তুলনায় লোক অনেক কম তাই সরকার থেকে হুকুম আসে যাতে করে বাগান থেকে যতটা সম্ভব সাহেব, বাবু ও শ্রমিক দিয়ে এই পরিকল্পনায় সাহায্য করেন ম্যানেজার। প্রতি বাগান থেকেই নানা জাতীয় অসংখ্য মেয়ে পুরুষ শ্রমিক, বাবু ও সাহেব এসে যোগ দেয় এরোড্রাম তৈরির কাজে। অনেক শ্রমিকের মুখেই হাসি দেখা দেয় কিন্তু কান্নার একটা সুর ভেসে ওঠে বাবু ও সাহেবদের চোখ মুখে। শত্রু এসে পড়েছে আসামের মুখে। আসামের মণিপুর, কোহিমা, ইম্ফল অঞ্চলগুলি শত্রুপক্ষের গোলাবারুদের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আঁধারি হয়ে যায়। লিডো রোড প্রজেক্টের কাজ শুরু হয়। অসংখ্য সাহেব, বাবু, শ্রমিকের প্রয়োজন সেখানে। প্রতি বাগান থেকে ছু' একজন সাহেব, ছু' চারজন বাবু আর যতটা সম্ভব শ্রমিক পাঠানোর হুকুম আসে উপর থেকে। সাহেব, বাবুরা অনেকে রওনা হলো কিন্তু শ্রমিকের দল সেখানে যেতে রাজী হয় না। এই সময়ে সরকার থেকে আদেশ আসে—যারা লিডো রোড প্রজেক্টে যোগদান করবে তাদের যদি কাজে যোগ দিয়ে কোন গুরুতর আঘাত বশত অঙ্গহানি বা অসুখবিসুখে পঙ্গু হয় তাহলে তারা তাদের জীবিতকাল পর্যন্ত সরকার থেকে 'পেনসন্' পাবে আর যদি কেউ যে কোন কারণেই মারা যাক্ না কেন তার স্ত্রী অথবা ছেলেমেয়েও পেনসন পাবে।

এই সময় থেকেই ওয়ার্কমেন্স য়্যাক্ট বলবত হয় চা বাগানে যদিও এই য়্যাক্ট পাস হয়েছিল আরো আগে। এছাড়া মেটারনিটি

বেনেফিট দেওয়ারও ব্যবস্থা হয় এই সময়ে। এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে জানতে পেরে বাগানের শ্রমিক সম্প্রদায়ের মনে বেশ খানিকটা আশ্বাস ও স্বাধীনতার স্বাদ পায়। তারা যেন এক ধাপ উপরের স্তরে উঠেছে। অনেক অপূর্ণ শুকনো, চিমসে মরা মরা সাধ সহজ, সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতিতে বেড়ে ওঠে। এ যেন পূর্ণ জীবন। এখানে মৃত্যু নেই, মৃত্যুর ভয় নেই। এতদিন সাহেবদের কাছ থেকে যে নির্মমতা, রুক্ষতা পেয়ে এসেছে তা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। একটা নতুন দিন, নতুন মানুষ, নতুন জগতের সৃষ্টি হয়েছে। লিডো রোড প্রজেক্টে, কোহিমা, ইম্ফল মণিপুর অঞ্চলে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তারা যে অভিনন্দন পেয়েছে সে তাদের জীবনে একটা স্বর্ণ দিন। সেই সোনালী আলোতে তারা জীবনের অন্য একটা রূপ দেখতে পেয়েছিল, তারা পাহাড় ভেঙে রাস্তা তৈরি করে দিনরাত। পাহাড়ের কোলে জঙ্গলের মধ্যে তাবুতে শুয়ে অনেক স্বপ্ন দেখে। অনেক জীবন, অনেক আলো, অনেক সোনাদানা। জীবনের অফুরন্ত কল্লোল, সুখ স্বচ্ছন্দ। গাড়ি ছাড়ার আগে সাহেব মেম সকলে তাদের সঙ্গে করমর্দন করেছিলেন। তাঁদের সেই হাতের গন্ধ তখনও তারা নাকে পাচ্ছে। ঐ একটা মুহূর্তে সব জগতটা যেন এক হয়ে গিয়েছিল, মানুষে মানুষে বিভেদ বা প্রভেদ ছিল না। মানুষ যে সবার উপরে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয় তারা।

এরমধ্যে যুদ্ধ আরো ঘোরালো হয়ে আসে মেঘে মেঘে। আসামের পাহাড় পর্বত কেঁপে ওঠে। অনেক জায়গা ফেটে যায়। আবার কোন কোন স্থানে ভেঙে পড়ে। বনের গাছপালা ভেঙে মুচড়ে যায়। কোথাও বা পুড়ে পরিষ্কার হয়ে যায়। ছাই উড়ে আসে বাতাসে বাতাসে। শত্রুপক্ষ আরো অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। আরো অনেক লোকের প্রয়োজন সেখানে। রাস্তাঘাটের কাজ আরো দ্রুততর হওয়া দরকার। বাগান থেকে প্রচুর শ্রমিক সরবরাহ করা হচ্ছে। বাগানের কার্য পরিচালনা করা একরকম অসম্ভব হয়ে ওঠে। কুলি রিক্রুটিং খুব জোরতালে চলতে থাকে। প্রচার কার্যে বা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আরো অনেক সুযোগ সুবিধার

কথা। অসুখ বিসুখ হলে হাজরি দেওয়া হবে। বাগানের কিম্বা গুদামের কাজ করার সময় যদি কেউ আহত বা আঘাত পায় তারা যতদিন পর্যন্ত কাজের উপযুক্ত না হবে ততদিন ওয়াকসম্যান কমপেনসেশন য়্যাক্ট অনুযায়ী টাকা পাবে। বাগানের সমস্ত পতিত জমি-জায়গা শ্রমিকদের চাষআবাদের জন্য বণ্টন করে দেওয়া হবে। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে মেটারনিটি এলাউন্স দেওয়া হবে। এ ছাড়া বাগানের মেলাতে মেলাতে ক্রেস খোলা হবে। সেখানে মেয়েরা তাদের কোলের ছেলেমেয়ে রেখে নির্বিবাদে কাজ করতে পারবে। ছেলেমেয়েদের দেখাশুনার ব্যবস্থা করা হবে। বারুদের ধোঁয়া গায়ে মাখতে মাখতে দূরের আলোর দিকে পা বাড়িয়ে আসে শ্রমিকের দল।

ধোঁয়াটে গন্ধের মধ্যেও কস্তুরীর মত একটা কিছুর গন্ধ আসছে নাকে। বাগানের শ্রমিকগুলো উৎসাহী হয়ে ওঠে। কর্মময় জীবনের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে নিজেদের। সারাদিন বাগানের কঠোর পরিশ্রম তারপর সন্ধ্যা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত চাঁদনী ওড়না বিছানো রূপোর জমিতে সোনা ফলানোর কাজ চলে।

এরপর বছর না ঘুরতেই বাগানের অন্যরূপ দেখা দেয়। ধোঁয়াটে-ঘোলা আলোয় চোখ স্তিমিত হয়ে আসে শ্রমিকদের। ধান, চাল, চিনি, লবণ, জামা কাপড়ের অভাব দেখা দেয়। সারা বাজার ঘুরলেও একটুকরো কাপড় বা একদানা ধান চাল কি লবণ চিনি পাওয়া যায় না। সরকার থেকে সমস্ত জিনিসপত্তর কণ্ট্রোলড করা হয়। বাগানে বাগানে বিরাট গুদোম ঘর তৈরি হলো। সরকারী এজেন্টরা ধান চাল কাপড় জামা বাগানে বাগানে হিসাব মত দিতে থাকেন। মহাজনদের আগেকার গুদামজাত পচা দুর্গন্ধযুক্ত ধান চালগুলো এসে বাগানের গুদোম ভরতি হলো। সপ্তাহে সপ্তাহে মাথা পিছু সাড়ে তিন সের চাল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তিন চার মাস যেতে না যেতেই এই পচা দুর্গন্ধযুক্ত চালেরও অভাব হয় তখন শুরু হয় দুই সের চাল আর দেড় সের আটা দেওয়া। এরপর দু'তিন মাস না পেরোতেই চাল ও আটারও অভাব হয়। তখন শুরু হয় দুই সের চাল, এক সের আটা ও আধা সের

'মাইলো' দেওয়া। এই মাইলোর নাম এর আগে কেউ শোনেনি কোনদিন। একটা বিক্ষোভের বা অসন্তোষের সৃষ্টি হয় এ নিয়ে। কি করে খেতে হয় এই মাইলো এ খবরও জানা নেই শ্রমিকদের। যারা দেশে থাকতো আগে তারা ভুরো ও চিনে দেখেছে এবং জানতো কি পদ্ধতিতে তা ব্যবহার করতে হয়। এদের অনেকে বললো—এ নিশ্চয়ই ঐ জাতীয় একটা কিছু এবং ঐভাবেই খেতে হয়। ভাতের মতই রান্না করে খায় ওরা। স্বাদ নেই, রস নেই কেমন ছোবড়া ছোবড়া অসার জিনিস। গলার নিচেয় যেতে চায় না, গলা শুকিয়ে যায়। ঢোকে ঢোকে জল খায় আর দুটো মাইলো ভাত। এমনি করেই দিন গুজরান হয় ওদের। কাপড় এলো তাও পরিমাণে এত কম যে সকলে পায় না। শেষে ঘর পিছু এক আধ টুকরো দেওয়া হয়। চিনি লবণ এলো। তাও সকলে পেল না। ঘর পিছু আধা পোয়া করে বাঁটা হয়। অথচ বাজারে এ সমস্ত জিনিসেরই রাতে কারবার চলছে। চিনির অভাব ততটা কাহিল করেনি তাদের কিন্তু লবণের অভাবটাই মারাত্মকভাবে অনুভব করে। কঠোর পরিশ্রমে ঘামের সঙ্গে শরীরের সমস্ত লবণ জল হয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, দুর্বল হয়ে কার্যক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আর কিছুদিন এইভাবে চললে হয়ত অনেকেই রাতকানা হয়ে যাবে। মাঝে মাঝে গভীর নিশুতি রাতে মোটর লরীর আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। রাতে ভুতের নৃত্য চলতে থাকে। গাড়ি কোথা থেকে কোথায় আসে, আবার কোথায় চলে যায় এ-খবর রাখে না কেউ। তবে অনেকেই জানে তা কিছু কিছু চিনি লবণের বস্তা নাবিয়ে দিয়ে লরী সোঁ সোঁ শব্দ করে চলে যায় পাহাড়মুখো। পাহাড়টা জেগে থাকে। পাহাড়ের গাছপালা পাতাপুত্তি নড়ে ওঠে। ঝরণার জয় গান শুনতে পাওয়া যায়। পাহাড় থেকে দলে দলে ভুত নেমে আসে আর মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত চিনি লবণের বস্তা কোথায় উধাও হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে খালি লরী আবার ভরতি হয়ে যায় শাল ও করঞ্জ পাতায় মোড়া ভুটানের খাঁটি পাই-এ ও ভরসা মাখনে। সাপের মত এঁকে বেঁকে বনের বুক কাঁপিয়ে লরী ফিরে আসে আবার। সোঁ সোঁ একটা ক্যারক্যাচ

শব্দ করে লরীটা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে পড়ে। লোকগুলোর যেন সর্বক্ষণ সমস্তই জানা আছে। নিমিষের মধ্যে মাখন যেন কোথায় চলে যায়। দোকানে নয়, ঘরে নয়—কে জানে কোথায় যায়। পুলিশ চোখবোজা পাহারা দেয়। কিছুই দেখতে পায় না। অথচ সমস্ত ব্যাপারই কড়ায়-গণ্ডায় জানে। নিদ্রালু চোখে অনেক রঙিন ছবি, হাসি। নিকষ কয়লা কালো রাতের অন্ধকারেও দিনের অনেক আলো। সাহেববাবুরা সকলেই এ-খবর জানেন। অনেক শ্রমিক এ-রিপোর্ট তাঁদের কাছে বহুবার পেশ করেছে। সকলেই বলেন—শীঘ্রই এই রাতে চোরাকারবার বন্ধ করার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু কোথায় যেন কি কল কাঠি ঘোরে আর তাঁরা পুতুলের মত চুপচাপ থেকে হাসতে থাকেন। এরমধ্যে আবার দেশলাইয়েরও অভাব হয়। শলাইয়ের অভাবে কষ্কট বিড়ি খাওয়া একরকম বন্ধ হয়ে যায়। শ্রমক্লান্ত দেহ, মন ও মেজাজ দিন দিন তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। ঘুপিঘাপে শ্রমিকদের আলাপ আলোচনা চলে। সকলেই ক্ষেপে ওঠে মহাজনদের ওপর।

মদনকুল বলে—দোকান থেকে সব বের করে নিয়ে এসে বড় সাহেবকে একবার দেখাও সকলে। আমাদের কাজ আমাদেরই করতে হবে আর কেউ করে দেবে না জেনে রেখো।

অনেকে বলে—কি দরকার সাহেবকে দেখানোর। তার চেয়ে সব ভাগাভাগি করে নিলেই হবে।

ভাওনাথ ও বিলাসী সকলকেই ক্ষান্ত করতে চেষ্টা করে। সে বলে—এর চেয়ে দোকানদারদের কাছে গিয়ে সকলে মিলে তাদের শাসিয়ে দেওয়া ভাল।

শ্রমিকদের এই দুঃখ দুর্দশার মধ্যেও ভাওনাথ, বিলাসী, অমরবাহাদুর মদনকুল ও করুণসিংএর একটা স্বস্তি আছে। তারা বুঝতে পারে এর মধ্য দিয়েই তাদের একটা নির্মম অথচ সরস গঠন কার্য চলছে। শ্রমিকদের সাহস বাড়ছে, চিনতে পারছে নিজেকে, দেশকে ও জাতিকে।

ভাওনাথ আশা করেনি এতটা হবে। সত্যিই এ নিয়ে রোজ রাতে ঝটলা হয়। ভীরু মনের রক্তও গরম হয়ে ওঠে। তারপর

একদিন সন্ধ্যায় প্রায় তিন চারশো মেয়ে জমা হয় বাজারের নিকট বড় সড়কে। তাদের সবল পদক্ষেপে রাস্তার পাহাড়ী মোটা বালি আর শক্ত নিরেট কুচিপাথর ছুটতে থাকে। রাস্তায় সেই বুড়ো অশ্বথ গাছটা তার অসংখ্য হাত নাড়ছে। রাতকানা পাখিগুলো একটানা উড়ে যাচ্ছে শুন্যে শুন্যে। তাদের পাখার ঝাপটা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। পাখিগুলোর কাণ্ড দেখে অনেকে হাসে, বলাবলি করে—পাখিগুলো কী ভীতু।

ওরা এগিয়ে যায় মহাজনের দোকানের দিকে। দোকানের লোকগুলো ভীরুচোখে শ্রমিকদের দিকে তাকায়। ভুড়িওলা মহাজন ছিল উপরে দোতলায়। কুৎকুতে ছোট চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে যায় তার। হল্লা শুরু হয়ে গেছে। চারদিক থেকে শোনা যাচ্ছে—ঐ যে ভুড়িওলা রক্তচোষা আসছে। অনেক রক্ত খেয়েছে আমাদের, আমাদের পুর্বপুরুষদের। অনেকে বলে—এগিয়ে এসো এদিকে—ভুড়ি ফুড়ে রক্তটা বের করে নেই।

ভাওনাথ বিলাসী ও করুণসিং সবাইকে শান্ত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু জনতা কি শান্ত হয়। অকথ্য গালিগালাজের বাণ ছুটে আসছে। মহাজনের মাথায় ছিল পাগড়ি। একজন তাকে একটা ধাক্কা মেরে মাথার পাগড়িটা উড়িয়ে দেয়। পায়ের লাথিতে লাথিতে পাগড়িটা কোথায় হারিয়ে যায়।

মহাজন ভীত সন্ত্রস্ত অস্পষ্ট ভাষায় ভাওনাথকে জিগ্যেস করে—ব্যাপার কি?

ভাওনাথ বললে—অনেক খেয়েছ এদের। এবারে এদের কিছু দেও। এরা যে খেতে পাচ্ছে না। চাল নেই, কাপড়জামা নেই, লবণ, চিনি বা দেশলাইএর কোনটাই নেই।

মহাজন কাঁদো কাঁদো স্বরে বললে—আমি কোথায় পাব এ-সব? এ-সবই তো সরকার কণ্ট্রোল্ করেছে।

অনেকেই বলে ওঠে—ন্যাকা সাজতে হবে না। এবারে ভুঁড়ি কেটে বের করবো সব। শীগগির করে ভালোয় ভালোয় বের কর জিনিসগুলো।

শ্রমিকদের কাণ্ডকারখানা দেখে মহাজনের বা দু'চারজন কর্মচারি

তারা তো ঘরের এক পাশে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। একটা কথা নেই মুখে। বাড়ির মেয়ে ছেলেগুলো ঘরের দরজা, জানলা ফাঁক করে ভীত সন্ত্রস্ত উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে আছে। অনেক ভাবে চেষ্টা করছে দেখার জন্য সমস্ত ব্যাপারটা কিন্তু ক্ষিপ্ত লোকগুলোর বেশির ভাগই তখন ঘরের মধ্যে ঢুকে গেছে। তাই আসল ব্যাপার কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। অন্যান্য দোকানদারগুলো এরমধ্যে অনেকেই দোকান পাট বন্ধ করে বাতি নিভিয়ে ঠায় কাঠের মত বসে আছে। দু'একটা ছেলেমেয়ে অল্প একটু আধটু জানলা খুলে দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু বাপমায়ের নির্বাক শাসানি ও চোখ রাঙানিতে তাদের সমস্ত উৎসাহ ও কৌতুহল নিভে যায়।

দু'চারজন শ্রমিক ঘরে ঢুকে লোহার সিন্দুকের দিকে লোলুপ দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। সিন্দুকের দিকে চেয়ে ওরা যেন আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ওরা জানে ওদেরই গায়ের রক্ত আর সম্পদে ভরতি ঐ সিন্দুকটা। ওদেরই ছেলেমেয়েকে নিরাভরণ বা রিক্ত করে ঐ সিন্দুকটার পেট ভরতি হয়েছে।

শ্রমিকদের মধ্য থেকে একজন চিৎকার করে ওঠে—তাকিয়ে দেখছিস কি ? সিন্দুকটা গুড়িয়ে ভেঙে ফেল।

অনেকেরই অনেক কথা মনে পড়ে। মনটা টনটনিয়ে ওঠে। বিষের জ্বালায় দাঁত কটমট করতে থাকে।

ভাওনাথেরও মনে পড়ে অনেক কথা। কিন্তু তা ভাববার অবসর নেই তার। সে ক্ষিপ্ত উত্তেজিত জনতাকে বশে আনতে চেষ্টা করছে। ঘটনা যে এরূপ বিস্তার লাভ করবে এ ধারণা তার ছিল না। তার মনে ভয় ও অস্বস্তি এসে জমা বেঁধেছে তবুও উত্তেজনার তাড়নায় মাঝে মাঝে ভয় ও অস্বস্তি ভুলে গিয়ে জোর অথচ শান্ত গলায় ক্ষিপ্তপ্রায় কথা কাটাকাটি করছে মহাজনের সঙ্গে। অথচ নজর জনতার দিকে।

এরমধ্যে কতকগুলো লোক দেশলাইয়ের পেটি, চিনি ও আটাময়দার বস্তা খুলে ফেলে। কাঠের পাটাতন করা দোকানের মেঝে আটাময়দা চিনিতে ভরে যায়। কয়েকজন কিছু দেশলাই নিয়ে চিনি আটাময়দা ছড়াতে ছড়াতে দোকান থেকে

বাইরে বেরিয়ে আসে। ভাওনাথ চোখরাঙা করে বারণ করে তাদের।

হয়ত আরো অনেক কিছু ঘটতো কিন্তু ইতিমধ্যে বাগানের ম্যানেজার সাহেব ও পুলিশ এসে পড়ায় ভীরু জনতা খরগসের মত ছুটে পালায়।

পুলিশের সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটি হয় ভাওনাথের। পুলিশ এজন্য তাকেই দায়ী করে।

ভাওনাথ জবাব দেয়—দায়ী সত্যিই আমি। তবে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত যে এই যে কয়মাস ধরে লবণ, চিনি, আটা ময়দা চালান হচ্ছে ভুটানে সে খবর কি পুলিশে রাখেন না। অথচ প্রতিদিনই দেখা যায় পুলিশ ঘুরছে রাস্তাঘাটে, আসছে এই মহাজনের ঘরে, বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে, গল্প ও হাসি তামাসা করছে তার সঙ্গে। এই প্রতিদিন রাতে মাল আসছে গাড়ি গাড়ি, তা কোথা থেকে কোথায় আসে, কোথায় যায় সে খবর কি পুলিশে রাখেন না?

ভাওনাথের তাজা টাটকা জোরালো কথা শুনে পুলিশ অফিসারের রাগ হয়। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে ওঠেন—তোমরা বড় বাড়াবাড় শুরু করেছ, দাঁড়াও তোমাদের সায়েস্তা করতে হবে।

ভাওনাথ একটু হেসে বলে—ভয় দেখিয়ে শাসনের দিন চলে গেছে। মানুষ এখন মানুষকে জানতে পেরেছে একথা ভুলে যাবেন না।

পুলিশ অফিসার হয়ত ভাওনাথকে গ্রেপ্তার করতেন কিন্তু এই যুদ্ধের সময়ে দেশের পরিস্থিতি বিচার করে ক্ষান্ত হন। তিনি গলাটা অপেক্ষাকৃত নরম করে বললেন—তোমাদের জন্য তো সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধাই দেওয়া হচ্ছে। কমদামে চাল ডাল, তেল লবণ সব কিছু। এই বাজারে এর চেয়ে বেশি কি আশা করা যায় একবার ভেবে দেখ। দেশে লোক সংখ্যা কত বেড়েছে। তারপর যারা দেশরক্ষার জন্য কাজ করছে তাদের যে অমানুষিক পরিশ্রম হচ্ছে—সেই সঙ্গে সেই রকম আহারও প্রয়োজন। এই

জন্মই দেশে খাদ্যের অভাব হয়েছে। এটা সাময়িক, যুদ্ধ বাদেই আর এসব সমস্যা থাকবে না।

ভাওনাথ বললে—দেশে যে ধান চাল তেল লবণ নেই তা কেমন করে স্বীকার করি। তাহলে এই কালোবাজারের জিনিসগুলো কোথা থেকে আসছে ?

এজন্য পুলিশ যতটা করতে পারে তার চেয়ে বেশি করতে পারে জনসাধারণ। জনসাধারণই তো এই কাজ করছে। দেশের লোকগুলো সাচ্চা হলে এতটা হতো না।

পুলিশ অফিসারের এ-কথার ও উপযুক্ত জবাব দিতে পারতো ভাওনাথ কিন্তু কথা বাড়িয়ে শান্ত আবহাওয়াকে তিক্ত বা ঝোড়ো করে তুলতে ইচ্ছা হয় না তার।

অম্বরবাহাদুর, বিলাসী, মদনফুল, পদমমায়া, করুণসিং এবং আরো অনেকে উদবিগ্ন হয়ে উঠেছিল। তারা ধারণা করেছিল পুলিশ অফিসার হয়ত ভাওনাথকে গ্রেপ্তার করবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসারের শান্ত নরম গলার কথা শুনে সে ঘোর কেটে যায়। একটা জয়ের উল্লাস ফুটে ওঠে তাদের মুখে।

ভাওনাথও মনে মনে খুবই আনন্দিত হয়েছে। তবে সেই আনন্দ সে কাথায়-বার্তায় ভাবে ইঙ্গিতে কারো জানতে দেয় না। তার মনে হয়—যে ঘটনা মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেল তাতে ভাবনা চিন্তার বেশ কিছু ছিল এবং সে-যে চিন্তিত না হয়েছিল তাও নয়—তবে যে সাহসের পরিচয় তারা আজ দিয়েছে এতে বুঝা যায় যে তারা স্পষ্ট করেই বুঝতে পেরেছে তারা তুচ্ছ হলেও তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে বাগানের সকলেই পরাভূত। এই বোধই তাদের মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে নেবে। এরা মানুষ হবে। তার চোখের সামনে অনেক ভাবী অবশ্যম্ভাবী ছবি ভেসে ওঠে। অনেক দুঃখ, বেদনা, দুর্দশা ও দুর্ভীক্ষের ছবি মনটাকে কেমন দুর্বল করে তোলে আবার পরক্ষণেই দেহ ও মনে অপরিমিত শক্তি অনুভব করে। না, তারা মানুষ। তাদের শক্তি আছে, মনোবল আছে তারা সব কিছু সহ্য করতে পারে। এ আর কতটুকু এর

চেয়ে অনেক বেশি সহ্য করেছে তারা। এই সহনশীলতাই তাদের শক্তি দিয়েছে, মনের বল দিয়েছে।

বাগানের সকলের মনই এই রাতটাতে চাঞ্চল্যের মধ্যে কাটে। অনেক চিন্তা, স্বপ্ন তাদের চোখের পাতাকে বুজতে দেয়নি।

ভাওনাথ বিলাসীকে হাসতে হাসতে জিগ্যেস করে—আজকের ঘটনা দেখে তোমার কি মনে হয়?

বিলাসীর মনের সংশয় দ্বন্দ্ব তখনও যেন তার মনের অলিগলিতে উঁকিঝুকি মারছিল। সে মদনফুলকে মিহি গলায় আস্তে বললে—দেখ তো বাইরে কেউ আছে নাকি?

মদনফুল অত সব বুঝতে চায় না। বেশি বুঝলে বা বিবেচনা করতে গেলে সব কিছুই যেন বেতাল হয়ে যায়। সে মুখ ঝাঁড়ি দিয়ে বলে ওঠে—সব তাতেই ভয় তোমাদের।

বিলাসী একটু হাসলো মদনফুলের কথায়। কোন প্রতিবাদ করলে না। এই মেয়েটিকে নিয়ে সব সময়ই কেমন যেন ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে হয়। ভয় নেই, ভাবনা নেই, ভীষণ বেপরোয়া। তবু তার মধ্যে একটা বিরাট আত্মার আহ্বান শুনতে পাওয়া যায়। আত্মাটা যেন শব্দ হয়ে বেরিয়ে আসে। দৃঢ়তা আছে, আত্মবিশ্বাস আছে।

বিলাসী ভাওনাথকে বললে—আমার তো মনে হয় এবারে ফুল ফুটবে। মনের পাঁপড়িগুলো শুকোয় না। আর একটু শিশির জল পেলেই সম্পূর্ণভাবে ফুটে উঠবে।

অনেক ফুলের গন্ধ পায় নাকে ভাওনাথ। সত্যিই ফুল ফুটেছে। ঘরখানি গন্ধে ভরপুর। ফুলের রূপ রস গন্ধে ডুবে থাকে সারারাত। ঘুমের বিন্দুমাত্র ছায়া নেই। ঘুম যেন কায়া হয়ে চোখের পাতায় ভাসছে। আকাশে চাঁদ হাসছে।

সকালে কাজে যায় ভাওনাথ। কাজে মন বসছে না। মনটা যেন অনেক দূরে চোখের আড়ালে আড়ালে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সকালের রোদ এসে সারা বাগানটাতে মাখামাখি করছে। পাহাড় থেকে বাতাস আসছে। শিরীষের কচি সবুজ সুঁটি হেলছে, দুলছে, বাজছে। বাগানের পাশের পরিত্যক্ত চা গাছগুলোতে

ফুল [illegible]। ফুল হাসছে, গান গাইছে। অনেক গান, অনেক কথা, ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছে ভাওনাথ।

এরমধ্যে কোনদিক দিয়ে কি আসছে, কি ঘটছে তার কোন খবর রাখে না শ্রমিকেরা। তাদের মন ভরাট হচ্ছে। অথচ খেলার মাঠ কেটে ট্রেঞ্চ তৈরি করা হয়েছে। অফিসে রেডিও এসেছে। বাগানের মুন্সী, সর্দার, চাপরাসী, কামদারী সকলকেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় রেডিও শোনার জন্য অনুরোধ করেছেন বড়সাহেব। বলেছেন—তোমরা যুদ্ধের কোন সংবাদ জানতে পার না তাই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। খবর শুনতে অনেকেই আসে। প্রথমটায় তারা মনে করে—এ তাদের একটা জয়। তারা যে মনুষ্যপদবাচ্য এ-কথা মালিকেরা জানতে পেরেছেন এখন। মনটা আনন্দে নেচে ওঠে, উৎসাহ বাড়ে, ভয়ভীতি কমে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই এই একতরফা খবর তাদের পছন্দ হয় না। এরমধ্যে কোন কারসাজি আছে তা বুঝতে তাদের দেরি হয় না।

তখনো লিডো রোডের কাজ চলছে পুরোদমে। কুলি চালান হচ্ছে বাগান থেকে। অথচ আগে যারা গিয়েছে অনেকদিন হয় তাদের কোন খোঁজখবর পাওয়া যাচ্ছে না। মা বাপ, ছেলে মেয়ে বউ সকলেই উদবিগ্ন হয়ে উঠেছে। এদিকে দেখতে পাওয়া যায় সাহেববাবুদের মুখ শুকিয়ে গেছে। ফাটল লেগেছে তা বুঝতে পারে শ্রমিকেরা কিন্তু তা কোথায় তা টের পায় না। এরমধ্যে দু'তিনজন শ্রমিক আর একজন বাবু ফিরে আসে লিডো রোড থেকে। এদের মুখে বাগানের সকলেই জানতে পারে যে লিডো রোডের নিকটেই বোমা ছোঁড়াছুড়ি হচ্ছে, রাস্তাঘাট মানুষের হাঁড় মাংসে ভরতি। বার্মাতেও প্রবল গুলি ও বোমা বর্ষণ হচ্ছে। সেখান থেকে বাঙ্গালীরা সর্বস্ব ছেড়ে পালিয়ে আসছে। দুর্গম পাহাড়ী পথে ঝড়, জঙ্গল জল মাথায় করে লোকগুলো মরি বাঁচি করে পাথরের গুঁতো খেয়ে জংলি কাঁটা ভরা বিষাক্ত লতাপাতার বিষ মেখে ছুটে আসছে। পথেই তাদের অনেকের শেষ হচ্ছে আবার অনেকে অর্ধমৃত অবস্থায় এসে মাটিতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। তাই এরা প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছে। এ

সংবাদে কান্নাকাটি শুরু হয় অনেক ঘরে। আর যারা সব ছেড়ে ছুড়ে শুধু প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে তাদের ঘরে চলছে একটা বাঁচার আনন্দ। অনাগত বিষাদের ছায়া তাদের মন থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

লোকগুলো পালিয়ে এসেছে এই খবর পেয়ে বড়সাহেব চটেমটে লাল হয়ে ওঠেন। এদের ডেকে পাঠান অফিসে। বাবুটির চাকরি যায়। হাতে একটি পয়সা ছিল না তখন, আর আর বাবুরা মিলে চাঁদা করে তার বাড়ি যাওয়ার গাড়ি ভাড়াটা সংগ্রহ করে। বাবুটির দীর্ঘশ্বাস রয়ে গেল চা গাছে, মাটিতে পাথরে, বালিতে। শ্রমিক ক'জনের আর চাকরি গেল না কারণ তখন বাগানে শ্রমিকের বড় অভাব। যুদ্ধের জন্য নানাপ্রকার নতুন এবং অনিবার্য কাজের উদ্ভব হয়েছে। ওয়াগনের অভাব দেখা দেয়। সমস্ত ওয়াগন পাঠান হচ্ছে আসামমুখো অনেকরকম জিনিস ভরতি করে। ফলে কয়লা আসছে না বাগানে। সমস্ত বাগানই উঠেপড়ে লাগে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে। আসপাশের রিজার্ভ ফরেষ্টের সমস্ত অকাঠ কুকাঠ কাটাতে ফরেষ্ট ফাঁকা হয়ে যায়। বাগান থেকে উঁচু দামে কাঠ কেনার ফলে কাঠেরও দাম অগ্নিমূল্য হয়। তা ছাড়া নিকটের জঙ্গলে কোথাও কাথাও কাঠ নেই। এতে শ্রমিকেরা বড়ই মুস্কিলে পড়ে। সপ্তাহে একদিন তো ছুটি, ঐদিনে কাপড় জামা কাচাকাচি হাটবাজার সব করতে হয়। তাহলে সময় কই যে অত দূরে গিয়ে কাঠ নিয়ে আসে। আগে পোড়া কয়লার গাদির খরানি থেকে দু'চার টুক্‌রো আধ পোড়া কয়লা কুড়িয়ে নিত এখন তাও বন্ধ হয়ে গেছে। ম্যানেজার সাহেব সে-গুলো কুলি দিয়ে সংগ্রহ করে কুঠিতে ব্যবহার করছেন। কয়লা যে জায়গায় বরাবর প্রতি বৎসর রাখা হতো সেখানটাতে আর মাটি নেই। জায়গাতে কয়লার স্তর পড়েছে। মজুররা ঐগুলো চাঁচা-ছোলা করে অথবা খুড়ে নিয়ে এসে গোবর মাটি মিলিয়ে গুলি তৈরি করতে শুরু করে। ম্যানেজার সাহেব জানতে পেরে তাও বন্ধ করে দেন। ফলে চাল ধান তেল লবণ কাপড় জামার সঙ্গে জ্বালানী কাঠের দুর্ভীক্ষ দেখা দেয়। ঘরে চাল

থাকলে কাঠ নেই, কাঠ থাকলে চাল নেই এমনি করে নানাপ্রকার দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়ে দিনক্ষয় হতে থাকে তাদের। দুর্ভোগ ও অসুবিধা সব চেয়ে বেশি হয় যাদের ঘরে জোয়ান বেটাছেলে নেই।

ভাওনাথের চোখের সামনে জঙ্গলের পাশের কবরখানা ভেসে ওঠে। একটুও জায়গা নেই সেখানে। সমস্ত জায়গাটাই যেন মাটির ঢিপিতে ঢিপিতে ভরতি হয়ে গেছে। কান্না পায় লোক-গুলোর জন্য। তার গলা দিয়ে অন্ন সরতে চায় না। সকলে বলে—ভাওনাথ, তুমি বড় শুকিয়ে যাচ্ছ।

বিলাসী বলে—তুই যে খাওয়াদাওয়া ছেড়ে দিলি? অনেক দিন বিলাসী তাকে এ-কথা বলেছে কিন্তু কোন জবাব দেয়নি ভাওনাথ। আজ আর নিজেকে বেঁধে রাখতে পারে না সে। সে বললে—দেখছ তো বাগানের লোকগুলো কিভাবে দিন কাটাচ্ছে।

বিলাসী বললে—এ-নিয়ে ভেবে, না খেয়েদেয়ে শরীরপাত করার কোন অর্থ হয় না। এমনি করে দিনক্ষয় করতে করতে আবার দিন আসবে।

ভাওনাথ বললে—এতো দিনক্ষয় নয় আয়ুক্ষয়। তিল তিল করে মানুষ চলেছে একবার ভেবে দেখেছ?

বিলাসী বললে—সবই তো বুঝি, কিন্তু উপায় কি?

আমি সেই উপায়েরই অপেক্ষা করছি, বললে ভাওনাথ।

মদনফুল দাঁড়িয়ে ছিল ওদের কাছে। সে বললে—উপায়ের জন্য ভাবতে হবে না কারো। জানো, পেট খালি হলে বুদ্ধি, শক্তি ও সাহস বাড়ে। ঐ খালি পেট থেকে উপায় জন্ম নেবে। তার অঙ্কুর হচ্ছে। দেখছ না, লোকগুলো ভাবছে।

বিলাসী একটু হাসে। ভাওনাথের দিকে চেয়ে স্নেহমাখা চোখ দুটো মদনফুলের পানে ঘুরিয়ে নেয়।

ভাওনাথ বললে—মদনফুল যা বলেছে তা হেসে উড়িয়ে দেওয়ার কথা নয়। আমারও বিশ্বাস, ভাই।

এরপর দেখা গেল সত্যিই নেপালী, আদিবাসী আর মাদ্রাজী খৃষ্টান মজুরগুলো ঘনিষ্টতর হয়েছে। প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছে যে তারা একই সম্প্রদায়ের লোক। তাদের সবারই কাজ করে
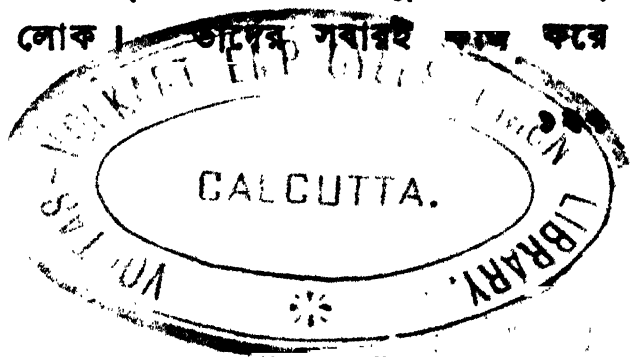
খেতে হয়, মালিকের হুকুম তামিল করতে হয়। আগেই মহাজনের দোকানে হানা দেওয়ার সময় বুঝতে পেরেছে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দিয়ে অসাধ্য সাধন করা যায়। তারা জানে, সাহেব বাবুদের কোন জ্বালানী কাঠের অভাব নেই। তাহলে তাদেরই বা থাকবে কেন? সকলেই তো কোম্পানীর চাকর। সকলে মিলে অফিসে বড় সাহেবের কাছে গিয়ে হাজির হয়। তাদের দাবী পেশ করে।

বড়সাহেব প্রথমে রাজী হননি। তারপর অনেক কথা কাটাকাটি ও নজির দেখানোর পর তিনি বুড়ো অকর্মণ্য ও যে বাড়িতে পুরুষ নেই তাদের জন্য এক গাড়ি করে জ্বালানী কাঠ দিতে স্বীকার করেন।

এতে অনেকে রাজী হয় না। শেষে অম্বরবাহাদুর ও ভাওনাথ সকলকে বুঝিয়ে বলে যে একে চা চালান প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে ওয়াগানের অভাবে এবং খিদিরপুর ডক্ ও টি, টি শেড ভরতি হয়ে গেছে চায়ের বাক্সে। চা চালান হতে পারছে না বিদেশে। সমস্ত পথ বন্ধ। টাকা পয়সার টানাটানি চলছে এক্ষেত্রে আপাতত আমাদের এতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

ভাওনাথের ইচ্ছা নয় যে একদিনে এক লাফে গাছের ডগায় উঠতে চেষ্টা করে। এতে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ষোল আনা। তাই সে ধাপ ধাপ করে উঠতে চায়। শ্রমিক সম্প্রদায়ের এই একতা দেখে সত্যই ভাওনাথ খুব খুশী হয়েছে। লোকগুলোর বহু সুপ্ত আশা, মানুষ হওয়ার স্পৃহা, মনের বল ও সাহস বেড়েছে। লিডো রোড প্রোজেক্টে যাওয়ার দরুণ স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল আবার নতুন পড়ুয়া এসে তাদের শূন্য স্থান পূরণ করেছে।

এদিকে যুদ্ধ আরো ঘন হয়ে আসে। আতঙ্কের রেখাপাত হয় বাবুদের চোখে মুখে। অনেক সাহেবদেরও। যুদ্ধ যেরকম ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছে তাতে শীঘ্র বিরতির আশা নেই। দেশে ছুটীতে যেতে পারবেন কিনা সে বিষয় সন্দেহ ও চিন্তার। হয়ত তাদেরও শেষ পর্যন্ত যুদ্ধে যোগদান করতে হবে। বাবুরা অনেকে স্ত্রী পুত্র ছেলে মেয়ে ও মালপত্তর পাঠিয়ে দিচ্ছেন দেশে। বিপদ

ঘাড়ে এসে চাপলে তখন আর তাদের নিয়ে পালাবার সময় থাকবে না। গাড়িঘোড়াও বন্ধ হয়ে যাবে। হয়ত সারা রাস্তাটাই ঘুরে ঘুরে পালিয়ে হেঁটে মারতে হবে, অনেক বাঘ ভালুক, চোর ডাকাত নদীনালার সম্মুখীন হতে হবে। শ্রমিকেরা আর কোথায় যাবে তাদের পূর্বপুরুষের ভিটে তো আগেই বিক্রি করে এসেছে কিম্বা জমিদার গ্রাস করেছে। তাদের হাহুতাশ আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর অন্য উপায় নেই। কেউ বা বলে—মড়ার আবার মরণে ভয় কি ? কিন্তু যেই একটু রোদ তাদের গায়ে লেগেছে তা যেন স্বাদে গন্ধে তাদের মনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে চায়। তারা বাঁচতে চায়। মৃত্যুকে অস্বীকার করে।

একই সম্প্রদায়ের লোকের ঘাড়ে যখন একইপ্রকার ঝুঁকি বা বিপদ চাপে তখন তারা পরস্পরের ঘনত্ব চায়। বাবুদের মধ্যেও এতদিন যে রেষারেষি বা মন কষাকষি ছিল তা আর নেই। প্রত্যেকেই দেখা যায় অন্তরঙ্গ হয়ে পথ চলে, ফিস ফিস করে কথা বলে। সন্ধ্যা হলেই সকলে এক বাড়িতে বসে গল্পগুজব ও সলাপরামর্শ করে। বোঝা যায় তাদের মনের দূরত্ব কেটে গেছে। এই যুদ্ধের সময় থেকেই খবরের কাগজ ও পুঁথিপত্তর পাঠে তারা বেশি মনযোগী হয়। এর আগে অনেকেরই তেমন একটা আকর্ষণ ছিল না পুঁথিপত্তরের ওপর। ম্যানেজার সাহেব অনেক পুঁথিপত্তর এনে দেন তাদের। তবে এতে ব্রিটিশ ও আমেরিকানদের গুণগান ছাড়া আর কিছুই নেই। এই মেলামেশার মাধ্যমেই তাদের সামাজিকবোধ এবং দলপাকানো দানা বাঁধতে থাকে।

বাবুদের কাজ বেড়েছে। টুশব্দ করবার জো নেই তবু। যে দুই একজন বাবু লিডো রোড প্রোজেক্টে কাজ করতে গেছে তাদের কাজও ঐ সমস্ত বাবুদের করতে হয়। তাদের জায়গায় অন্য কোন নতুন লোক নেওয়া হয়নি। সাহেবেরা বড় পলিসিবাজ। তারা বাবুদের কাজের গুরুভার বুঝতে না দেওয়ার জন্য পুঁথিপত্তর এনে দিয়েছে। লিডো রোড প্রোজেক্ট যাত্রীদের পরিত্যক্ত বাসায় সকলে মিলে কাগজ পুঁথিপত্তর পড়াশুনা ও গল্পগুজব করবার জন্য ছেড়ে

দিয়েছেন। একটা রেডিওও দিয়েছেন। বাগানে বাগানে বেড়াতে যাওয়ার জন্ম লরী দিচ্ছেন।

এই সব ঈর্ষা ও অসন্তোষের কারণ হয়ে দাঁড়ায় শ্রমিকদের। এতে বাবুদের উপরও ক্ষুণ্ণ হয়ে ওঠে তারা। প্রতিহিংসা জাগে। অনেক জটলা, সলাপরামর্শ হয় কি করে বাবুদের জব্দ করা যায়। রবিবার হাটের দিনে বাবুরা থলে হাতে বাজারে বাজার করতে যায়। শাক সবজি তরিতরকারিতে থলেটা ভর্তি করে একটা মজুরের হাতে দিয়ে তার বাসায় পৌঁছে দিতে বলতো। এজন্ম তারা একটা বিড়ি কিম্বা সিগারেট পেত। এতেই তারা খুশী। গর্ব অনুভব করতো মনে মনে। শুধু বিড়িতেই যে এতটা খুশী হতো তা নয়। খুশী হওয়ার মুখ্য কারণ, বাবু তাকে পছন্দ করে হেসে কথা বলে। তাদের মুখের হাসি ও কথা শুনতে পেলেই ধন্য হতো। মনে করতো বাবু তাকে নিজের থেকে আলাদা করে দেখে না।

এরপর হঠাৎ একদিন দেখা যায় বাবুরা সকলেই যে যার বাজার থলে বয়ে নিয়ে আসছে আপন আপন বাড়িতে। একটা মজুরও এগিয়ে যায় নি তাদের হাত থেকে থলে নিতে, বলেনি আপনি বয়ে নিয়ে যাবেন কেন, দিন আমার কাছে আমি পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। বাবুরা সকলেই অবাক হয়, কারণ হাতড়িয়ে বেড়ায়, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে ম্লান চোখে তাকায়। মজুরগুলো কেমন যেন এড়িয়ে চলছে তাদের। দেখতে পেলেই পাশকেটে সরে যাচ্ছে। একটা সেলাম নেই, কথা নেই। ডাকলেও যেন কানে শুনতে পাচ্ছে না। সমস্ত বাজারটাই যেন কেমন বধির হয়ে গেছে।

এতে ভাওনাথ তেমন কোন আপত্তি করেনি। সে সকলকে বলে—তোমরা যখন অভাবগ্রস্ত, খেটেখাওয়া লোক তখন যদি দুটো পয়সা পাও মোট কিম্বা থলে বয়ে তাহলে তা করবে তবে মুফতে করবে কেন?

অম্বরবাহাদুর বললে—ভাল দেখেছ, ওরা আবার পয়সা দেবে? যারা ছোবড়া চুষে রস খায় তারা পয়সা দেবে। খাটবো আমরা, কাজ করবো আমরা, ঋণ শুধবো আমরা আর আপদে বিপদে দু'টো

টাকা পেসৃকি আনতে গেলেই হাত পাতে যারা তাদের আবার মন আছে দিল আছে।

মদনকুল বললে—সত্যি কথা বলেছে সর্দার। এদের দিল বলতে কিছু নেই এরা অমানুষ, অসৎ। দেখেছ না, রেলে বিনা টিকিটে লোক আসে কতো। তারা কিন্তু পয়সা দেয় চেকারকে। সে যাই দিক না কেন। দেয় তো কিছু না কিছু। শেষে আবার ঐ পয়সা ভাগাভাগি হয়।

করুণসিং হেসে বললে—চোরে চোরে মাসতুতো ভাই।

মদনকুল বললে—ঠিক বলেছ করুণসিং—চোরে চোরে মাসতুতো ভাই। তবে এটা ঠিক যে এরাই আমাদের লোভী ও অসৎ করছে।

এরমধ্যে রেশন গুদোমে ইঁদুর লাগে। অসংখ্য অগুণতি ইঁদুর। চাল ধান গমের মাইলোর বস্তা কেটে বস্তা খালি করে দিয়েছে। মেঝেময় গর্ত। মাটির ঢিপি তৈরি করেছে। মাটি আর জিনিসপত্তরে মিশে একাকার হয়েছে। এই সঙ্গে মিশেছে ইঁদুর আরসোলা ছু চোর নাদি। এমনিতেই পচা দুর্গন্ধযুক্ত জিনিস পত্তর তার ওপর এই সমস্ত নোংরা জিনিস মিশে একান্তই ব্যবহারের অনুপযুক্ত ও বিষময় করে তোলে। এই মাটি ও মলমূত্র দিয়ে ইঁদুর ও ছু চোর খাওয়ার ও নষ্ট করার যে ক্ষয়ক্ষতি সেটা পুরণ হচ্ছে। ওজনের সমতা একই আছে। এতে মালিকের কোন ক্ষতি নেই। তবে সব চেয়ে সুবিধা হয়েছে আর এক শ্রেণীর লোকের যারা এই রেশনের মধ্যে চাকরি করেন। ইঁদুর ছু চোর ক্ষয়ক্ষতির অজুহাত দেখিয়ে বেশ মোটা হাতে কামিয়ে নেয়। এতে ইন্ধন জোগায় বাগানের মহাজনেরা। তাদের চিমসিলাগা পেটেও অনেক চর্বি লাগে। যত দুঃখকষ্ট হয়েছে শ্রমিকদের। একে দুর্গন্ধময় রেশন হাজার ধুয়েও গন্ধ দুর করা যায় না। বার বার ধোওয়াতে অনেক দানা নষ্ট হয় তার পর কুলা দিয়ে ঝাড়াঝাড়ি করে মাটি, ইঁদুর ও পোকার নাদি বাদ দিলে সাড়ে তিন সের রেশন গিয়ে দাঁড়ায় পৌনে তিন সের। ভাতের গ্রাস হাতে করে চোখের জল ফেলে আগে তারপর অতি কষ্টে গলার মধ্যে ফেলে দেয়। জলের

মত ঢোক গিলে খায়, চিবতে পারে না। বমি হয়ে সব বেরিয়ে যাবে। পেট ভরে না। মনটা চোখের জলে ঢাক হয়ে ওঠে।

সব কিছুরই একটা সীমা আছে। জলকেও এক জায়গায় গিয়ে থামতে হয়। বাতাসকেও। এই থামার মধ্যেই আবার একটা চলার ইঙ্গিত আছে। ঘাত প্রতিঘাতেই এই থামা আবার ঘাত প্রতিঘাত থেকেই প্রতিযোগিতার জন্ম। বেপরোয়া দুর্বার হয়ে ওঠে চলা। আর এক শক্তি জন্ম নেয় তখন।

শ্রমিকদের অনেক জটলা হয় রাস্তা ঘাটে, বাগানে, মেলায় ঘরে বাড়িতে। ম্যানেজারের কানে এসংবাদ পৌঁছে কিন্তু তাতে তিনি জ্রূক্ষেপ করেন নি। তারপর একদিন রেশন বিতরণের দিনে সমস্ত মজুর দাঁড়িয়ে থাকে, রেশন ঝোঁকে না কেউ। খবর পেয়ে ম্যানেজার এলেন। শ্রমিকের দল তাঁকে বললে—রেশন ঝেড়েপুছে পরিষ্কার করে না দিলে তারা নেবে না আর কাজেও যাবে না। এ-নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটি হয়। শেষ পর্যন্ত ম্যানেজার সাহেব প্রতিশ্রুতি দেন যে পরবর্তি দিন থেকে রেশন পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।

এরপর অনেকগুলো বিড়াল সংগ্রহ করা হয়। সারা দিনরাত বিড়ালগুলোকে আটকে রাখা হতো গুদোমে। ফলে বিড়ালগুলো অপরিমিত চাল ও মাংস আহার করে গুদোমের যেখানে সেখানে দলা দলা মাংস ও চাল বমি করে রেখে দিত, মলমূত্র ত্যাগ করতো চালের বস্তায়। এতে দুর্গন্ধময় হয়ে ওঠে রেশন। ঐ সঙ্গে সমস্ত গুদোম ঘরটা।

ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে নানাপ্রকার র‍্যাটকিলার পাউডার, পেষ্ট ও ট্রাপ আসে। ইঁদুরগুলো যেন আর আগের মত বোকা নেই। মানুষের বুদ্ধি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাদেরও বুদ্ধি বেড়েছে। দু'একদিন দু'চারটে ধরা পড়লো, মরলো তার পরেই যেমন আহার আর ট্রাপ তেমনিই পড়ে থাকতো। একটা ইঁদুরও তার ধারেকিনারে আসতো না। তখন ম্যানেজারের কি খেয়াল হয় তিনি বাগানের বাঁশঝাড়ি ও জঙ্গল থেকে কয়েকজন সাঁওতাল মজুর দিয়ে চারটি জ্যান্ত বোড়ো সাপ ধরে আনার ব্যবস্থা করেন।

সাপধরার জন্য প্রতি সাপ পিছু তিনি দশ টাকা বকশিস দেন তাদের। বোড়ো ক'টাকে গুদোমের মধ্যে ছেড়ে দেন। এতে ইঁদুর ছুঁচোর উৎপাত অনেকটা কমে বটে কিন্তু সাপের গায়ের আঁশের ও মলমূত্রের গন্ধে হপ্তা খানেকের মধ্যেই রেশন গুদোমের দরজা খোলা অসাধ্য হয়ে ওঠে। দরজা খোলা মাত্র এমন একটা বিটকেলে গন্ধ এসে নাকে ঢুকতো যে তা পেটের সমস্ত নাড়িভুড়ি পাকিয়ে খিঁচকে বমি ঠেলে উঠতো। এরপর শুরু হয় গুদোম থেকে সমস্ত রেশন বের করে রোদে দেওয়া। এ-কাজও মজুরদের করতে হয়। গামছা দিয়ে নাক মুখ বেঁধে কাজ করে আর প্রায়ই থু থু ফেলে। শেষ পর্যন্ত গুদোম মেরামত করা হয়। র‍্যাটপ্রুফ।

এই সময়ে ছাতারও খুব অভাব হয়। কোথাও ছাতা মিলে না। যদিও বা পাওয়া যায় সোনার দরে তোলায় তোলায় বিক্রি হয় বললে চলে। এদিকে বর্ষার অবিরত জল টুপটুপ ঝুপঝুপ করে আকাশ থেকে ঝরছে। অবিশ্রান্ত অবিরাম বৃষ্টি। সূর্য নেই। সারাদিন জলে ভিজে আর কাজ করতে পারছে না শ্রমিকদল। হাতেপায়ে ঝিম ধরে আসছে। তবু তারা কাজ করে। কত বর্ষণ মাথার ওপর দিয়ে স্রোত বয়ে যাচ্ছে তাতে ভ্রুক্ষেপ নেই। গুদোমে অনেক চাল ধান আটা মাইলোর বস্তা রয়েছে। ভাওনাথ, অম্বর-বাহাদুর, প্রেমপ্রকাশ, করুণসিং ও মদনফুল ম্যানেজারের কাছে গিয়ে দরবার করে যাতে তিনি প্রত্যেক শ্রমিককে একটা করে বস্তা দেন।

ম্যানেজার এতে আপত্তি করেন। তিনি বলেন—ঐ সমস্ত বস্তা আবার পাঠাতে হবে চালের জন্য। অথচ শ্রমিকের দল দেখতে পায় এই বস্তার যতটা চাল ধানের জন্য পাঠান হয় তার চেয়ে অনেক বেশি বিক্রি করা হচ্ছে বাজারে।

ভাওনাথ বললে—ইঁদুরে কাটা অনেক বস্তাই তো রয়েছে গুদোমে। ঐগুলো দিলেই তো হয়।

—ঐ বস্তাগুলিও পাঠানো হবে। মেরামত করা হবে।

হপ্তা দুই যেতে না যেতেই দেখা গেল—ঘরে ঘরে রোগী। শুনতে পাওয়া যায় কোঁকানি, কাতরানি হ্যাচপ্যাচ ও খুক খুক শব্দ। দাবাইখানাতে ওষুধ নেই।

এরপর কোম্পানী থেকে ছাতা আসে। কেউ পেল, কেউ পেল না আবার কেউ বা পয়সা অভাবে কিনতে পারলো না। অসুখের জন্য নাগা বসেছে কিন্তু ডাক্তারবাবু রিপোর্ট দিয়েছে— তেমন কিছু নয়, ইচ্ছে করলে কাজ করতে পারে তাই রেশন পায়নি। একজনের রেশনেই দুটি কি তিনটি পেটের ক্ষুধা নিবৃত্তি করেছে। নিবৃত্তি ঠিক নয় সে যেন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা আগুনে একটা শুক্‌নো খড় কি খাগড়ার কুটো। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ছোট ছেলে মেয়েগুলো অবিরাম কাঁদছে। মায়ের বুকের দুধ শুকিয়ে গেছে।

অম্বরবাহাদুর, করুণসিং মদনকুল ও আরো অনেকে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। প্রতিদিনই স্কুল বসে সন্ধ্যায় কিন্তু আজকাল পড়াশুনার কথা খুবই কম হয়। শুধু বেদনা, দীর্ঘশ্বাস ও দুঃখের কথা চলে পরস্পরের মধ্যে। অনেকে বলে—হাত থাকতে হাত নেই, পা থাকতে পা নেই আমরা সেই ধরনের এক জীব। পেট জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে।

ভাওনাথ বলে—জ্বলে পুড়ে খার হলেই তো জিনিসের আসল রূপ ফুটে উঠবে। উপরের মালিন্য কেটে যাবে। ভাওনাথের এই কথাগুলোর মধ্যে যে দুঃখ বেদনা সহানুভূতির ইংগিত আছে তা সকলেই বুঝতে পারে। তবু তার মুখে চোখে চেহারায় যেন একটা খুশী খুশী ভাব উপচে পড়ে। মনে হয় কিসের যেন একটা আভাস পেয়েছে, হয়ত দেখতে পেয়েছে জ্বলেপুড়ে খার হওয়া প্রাণের তলানিতে একটা উজ্জ্বলতর কিছুর ঝলসানি।

এর পর যুদ্ধের বিরতি হয়। লিডো রোড, হাসিমারা এয়ার ফিল্ডের লোকগুলো আবার বাগানে ফিরে এলো। বাগানে বাগানে লোক ধরে না। বাসস্থানের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। লোকগুলো গাদাগাদি করে থাকে। অনেকে রাত হলে নরম গুদোমে এসে দোতালার পাটাতনের ওপর অথবা নিচেরতালায় মেঝেতে পড়ে ঘুমোয়। লোক সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রেশনেরও অভাব দেখা দেয়। প্রতি বছর বৎসরের শুরুতে লোক সংখ্যার একটা হিসাব দিতে হয়। এই হিসাব অনেক আগেই সরকারের

কাছে দাখিল করা হয়েছে। সেই অনুপাতেই রেশন আসছে বাগানে বাগানে। কাজকর্মের ও রেশন বিতরণের ও জব্বর কড়াকড়ি আরম্ভ হয়। যে কোন কারণেই হোক নাগা বসলে রেশন কাটা হয় তারপর পর পর এক হপ্তা নাগা হলে নোটিশ জারি করেন ম্যানেজার। এতে প্রকাশ থাকে আর এক হপ্তা নাগা বসলেই বাগান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে তাদের। প্রতি বাগানেই প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক হয়েছে। এতো লোকের দরকার নেই তাই মালিকসম্প্রদায় খুব কড়াকড়ি কষাকষি শুরু করেন। নানাপ্রকার চোখরাঙানি ও শাসানিতে মজুররা আরো বিরক্ত ও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। একে আধপেটা খাওয়া তারপর এই অত্যাচার, অবিচার। বুড়োরা যারা ছোটবেলায় দেশ ছেড়ে এখানে এসে যুগের পর যুগ তাদের দেহের সমস্ত রক্ত দিয়ে তৈরি করেছে এই সোনার খনি তারা ভাবতে পারে না যে এমনটি হতে পারে কোনদিন। মনে পড়ে সেই শস্যশ্যামল ক্ষেত, কুঁড়ে ঘর অনেক পথ, অনেক ছোট ছোট পাহাড়। ঐ সব কিছুর মধ্যে দীনতা থাকলেও হীনতা ছিল না। এখানকার পাহাড়ে দীনতা নেই আর অনেক উঁচু হলে কি হবে এ যেন অনেক নিচু। ছেলেদের যাদের জন্ম এই দেশে তারা এ-সমস্ত কল্পনা করতে পারে না। তবু বুড়োদের দীর্ঘশ্বাস তাদের গায়ে লাগে। কল্পনার চোখে সেই আদিম ভূখণ্ডের ছবি দেখতে চেষ্টা করে।

এই দুঃখ বিক্ষোপের মধ্যে আর এক অভাবিত সমস্যা হাজির হয়। যে সমস্ত লোক লিডো রোডে কাজ করতে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অনেকে আর ফিরতে পারেনি। কোথায় কোন পাহাড়ের কোলে, জলে জঙ্গলে হারিয়ে গেছে। যে লোকগুলো মারা গিয়েছে সেখানে তাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা মাসে মাসে আট দশ টাকা পায় সরকার থেকে। কিন্তু কোথায় কি গলদ হয়েছে তারা জানে না হঠাৎ অনেকেরই সেই টাকা আসা বন্ধ হয়ে যায়। এই ক'টা টাকার মধ্যেই তারা তাদের জীবনের অনেক সম্পদ খুঁজে পেয়েছিল। হারানোকে ভুলে গিয়েছিল। মনে করতে পারে নি আবার একদিন সেই পুরনো সুর বেজে উঠবে। টাকা বন্ধ হয়ে

খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সুর বেজে ওঠে। অনেক আনন্দ বেদনার মধ্যে বিভীষিকা দেখতে পায়। গোলাবারুদ, শেয়াল শকুনের শব্দ ও গন্ধ। ধোঁয়াতে সবকিছুই অস্পষ্ট। তবু আবছা আবছা দেখতে পায় মাথার খুলি উড়ে গেছে, বুকের মধ্যে গুলি বিঁধেছে। ধড়ে প্রাণ আছে, ছটফট করছে। তারপর নিস্পন্দ, অসাড় দেহ। শিয়াল শকুনের দাঁত খামচি, চিঁ চিঁ হুক্কা হুয়া শব্দ সমস্ত নিস্তব্ধ পাহাড় ও জঙ্গলটাকে একটা বিকট শব্দময় করে তুলেছে।

সাত

ভাওনাথ দেখতে পায় মন পুড়ছে, বন জ্বলছে। সমস্ত জঙ্গল জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। এ-আগুন নিভবার নয়। এ যেন আগুন নয় ফুল ঝরে পড়ছে স্বর্গ থেকে। কুলি কামিনদের ঘৃণ্য দেহদানের কালো দাগ মুছে যাচ্ছে। পাহাড়ের গায়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। নরক জ্বলছে। পাপীরা পুড়ে পুড়ে মরছে। এরই মধ্যে দেখতে পায় ভাওনাথ, মরা চা শিরীষের গাছে নতুন নতুন ডাল পাতা গজিয়েছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে অগুণতি চিরসবুজ ঘাসের গালিচা তৈরি হয়েছে।

ইতিমধ্যে তিল তিল করে মেঘ জমে পাহাড়ে। তারপর একদিন ঢল নামে। সমস্ত পাহাড় ডিঙিয়ে বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সোঁ সোঁ শব্দে জল নেমে আসে নিচে। নিচের চা শিরীষের গাছগুলো নেয়ে ওঠে সেই জলে। পাহাড় কাঁপতে থাকে। শিলে শিলে চিড় খাওয়া পাহাড়টা ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে কি যেন ভাবছে। হয়ত আর মাথা তুলতে পারবে না।

গুর্খা শ্রমিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মেতে উঠেছে দার্জিলিং কাবিয়াঙ চা বাগানের শ্রমিক সম্প্রদায়। তাদের হৈচৈ শোনা যাচ্ছে। তারা নেমে এসেছে সুখনা শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি অঞ্চলে। দলের নেতা নরসিংবাহাদুর এসে ডেরা পাতলেন আলিপুর দুয়ারে। আলিপুর জলপাইগুড়ি অঞ্চলের সমস্ত বাগানের শ্রমিক তাঁর দর্শন উদ্দেশ্যে এসে হাজির হয় সেখানে। নরসিংবাহাদুরের দৃঢ় দীপ্ত কথা সকলের অশান্ত মনে একটা অবাধ চঞ্চল শান্তির ঢেউ খেলতে থাকে। তাদের মনে হয় যুগে যুগে এমনি করে অবতারের জন্ম হয়। এঁরা আসেন অন্যায় অত্যাচার অবিচার ও ধ্বংসের মুখ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে।

এরপর গুর্খা সংঘকে কেন্দ্র করে প্রতি বাগানে বাগানে এই সংঘের সাবকমিটি গঠন হয়। দলমাননগরেও একটা সাবকমিটি তৈরি হলো। ভাওনাথ, অম্বরবাহাদুর, করুণসিং, মদনফুল ও কোলা এই সমিতির স্থানীয় কর্মসচিব নির্বাচিত হয়। উপরে উপদেষ্টা হিসাবে থাকেন নরসিংবাহাদুর। তিনিই সর্বেসর্বা এবং তাঁর পরামর্শ মতই কাজ চলবে।

আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে ইম্ফল পতনের সংবাদ যুদ্ধের সময়ে জানতে পারেনি কেউ। আজাদ হিন্দ ফৌজ যে কি তাও জানতো না শ্রমিকেরা। কিন্তু যুদ্ধ বিরতির পর যখন মজুরের দল লিডো ডিমাপুর রোড থেকে ফিরে আসে তখন তাদের কাছেই শুনতে পায় এই ফৌজের আত্মকাহিনী। এই সময়ে নেপালী জ্যোতিষী ও পণ্ডিতমণ্ডলী নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জন্ম ইতিহাস নিয়ে মাথা ঘামাতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেন, যে কৃষ্ণ সেই রাম সেইই নেতাজী। আগের দিনের নারায়ণের চক্র ছিল এখন যুগের পরিবর্তনে চক্র নেই, সেই চক্র এখন রূপায়িত হয়েছে ফৌজে। নেতাজীর এই ফৌজই নারায়ণের চক্র। নারায়ণের চক্রের মত নেতাজীও এই ফৌজ নিয়ে সমস্ত দেশ, জাতি ও মানব সমাজকে ধ্বংস, অন্যায় অবিচার ও অত্যাচার থেকে রক্ষা করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

সমস্ত বাগানের শ্রমিকদের ধারণা হয় নরসিংবাহাদুরও নেতাজীর মত একজন অবতার। এবারে নেতাজী নামটির পরম মাহাত্ম্য খুঁজে পায় তারা। এরপর কয়েক দিনের মধ্যেই দেখা গেল নরসিংবাহাদুরও লোকের মুখে মুখেই নেতাজী বনে গিয়েছেন।

এই সংঘের সঙ্গে দলমাননগরের সমিতিকে সংযুক্ত করায় অনেকেরই আপত্তি ছিল। বিশেষ করে অম্বরবাহাদুর, পদমমায়া, বিলাসী, করুণসিং ও মদনফুলের। তারা ভাওনাথকে বলে—তোমার চেয়ে নরসিংবাহাদুরের এমন কি বেশি অভিজ্ঞতা আছে। সে কি জেল খেটেছে কোনদিন, ছিল কি কোন বিপ্লবীর সঙ্গে। জেলও খাটেনি, কোন বিপ্লবীর সঙ্গে কাজও করেনি। নরসিংএর অভিজ্ঞতা শুধু পুঁথিপত্তরের।

ভাওনাথ ওদের সবাইকে বুঝিয়ে বলে—সমিতিকে বিস্তৃত ও বৃহত্তর করে গড়ে তুলতে না পারলে শ্রমিকদের কোনই উপকারে আসবে না।

মদনকুল বললে—কেন, আমরা তো এগিয়ে চলেছি দিনের পর দিন। সমস্ত বাগানেই একটা জাগরণ দেখা দিয়েছে। লোকের ভয় ভীতি কমে গেছে। নিজেকে চিনতে ও জানতে পারছে এবারে।

অম্বরবাহাদুর বললে—কি দরকার বাইরের লোককে ঘরে ঢুকোনোর ? আর সে কিই বা জানে বাগানের শ্রমিকদের বিষয়, চিন্তা, দুঃখ, বেদনা ?

করুণসিং বললে—ঠিক কথাই বলেছে সর্দার আর মদনকুল। বাগানের শ্রমিকদের ভালমন্দ দুঃখ কষ্টের কিছুই জানে না সে। বাগানে কাজও করেনি কোনদিন। আর সত্যিই তো সকলের মনেই একটা সাড়া জেগেছে। তুফান নিশ্চয়ই উঠবে একদিন।

ভাওনাথ একান্ত চুপ থাকে। সকলের কথাই কান দিয়ে শুনছে, মন দিয়ে বিচার করছে। মনটা কখন উঁচু পাহাড় শৃঙ্গে উঠে যাচ্ছে, আবার নেমে যাচ্ছে কোথায় কোন পাহাড়ের কোলে। হারিয়ে যাচ্ছে কোথাও !

পদমমায়া বললে—'আমার মনে অজানা অচেনা ভালোর চেয়ে জানাচেনার মন্দ ভাল। গায়ে যার আঁচড় লাগেনি সে আঁচড়ের যন্ত্রণা বুঝতে পারে না।'

মদনকুলের সমস্ত মনের কথা আর রোধ করে রাখতে পারেনি। স্পষ্ট করেই বলে ওঠে—মন মেজাজ দিয়ে দুঃখ কষ্ট সয়ে যা তৈরি করেছি আমরা তা অপরের হাতে ছেড়ে দিতে আমার মন কিছুতেই চায় না। বিরক্তি ও রূঢ় স্বরে বলে—কেন, আমরা কি মানুষ নই, আমাদের কি শক্তি নেই। আমরা এতদিন ধরে মন বেঁধেছি আমাদের শক্তির অভাব নেই। নিজের ভুলে মরাতেও একটা সুখ আছে, শান্তি আছে কিন্তু অপরের ভুলে মরলে তাতে দুঃখ পরিতাপ আর বেদনা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। নিজের ভুলে

প্রতিযোগিতা ও উৎসাহ বাড়ে আবার ওঠে কিন্তু অপরের ভুলে নিলয়গামী হতে হয়। আর উঠতে হয় না।

ভাওনাথ মদনফুলের কথা শুনে বিলাসীর দিকে তাকায়। বিলাসীর ঠোঁটে অল্প হাসি। ভাওনাথ বুঝতে পারে মদনফুলের কথাগুলো যেন সমর্থন করছে বিলাসী। ভাওনাথ তার ছেলে। নিজের পেটে না ধরলেও তবু সে তার ছেলে। এরমধ্যে একটুও ভেজাল নেই। ভাওনাথ জানে, মা চায় তার ছেলে বড় হোক। তাই ছেলে বড় হলে ছেলের চেয়ে মায়েই গর্ব অনুভব করে বেশি। ভাওনাথ এক দৃষ্টে বিলাসীকে লক্ষ্য করছিল। তার মনে হয় বিলাসী আরো অন্য কিছু ভাবছে। চোখে মুখে যেন অনেক ভাষা ও কথার ঢেউ খেলছে। এতে বেদনা আনন্দ দুইই আছে। বেদনা কি তা সে জানে। আনন্দ কি তা সে জানে না তবে একটা কিছু অনুমান করে নেয়। হয়ত তা বিশ্বাস কিম্বা ঐরকম একটা কিছু হবে। ভাওনাথের বুদ্ধি বিবেচনা দুইই আছে। সে তার সত্তাকে জানে। নিশ্চয়ই ভুল পথে পা দেবে না। তবে সে যাই বুঝুক, বিলাসীর মুখ থেকে কিছু শুনতে চায়। কিন্তু বিলাসী নিশ্চপ।

কোলা বসে ছিল ভাওনাথের পাশে। সে বলে ওঠে—আমার মনে হয় আমাদের সমিতিকে 'গুর্খা শ্রমিক সংঘের' সঙ্গে যুক্ত করাই ভাল কারণ তা না হলে কে জানে কখন ঘাড়ের ওপর কোন বিপদ আসে আর সঙ্গে সঙ্গে ভাওনাথ ও আমাদের ঘাড় মুচড়ে যাবে। ভাওনাথের জন্যই আমার যত ভয়। কারণ ওর উপরেই তো রোষ গিয়ে পড়বে তখন।

কোলার কথাতে অনেকেরই মুখে চোখে বিরক্তভাব দেখা দেয়। চোখমুখ কুঁচকে যায়। আবার অনেকে বিদ্রূপের হাসি হেসে ওঠে।

করুণসিং রুক্ষস্বরে বলে—ভাওনাথ সে ভয় করে না। আর এই ভয় থাকলে সে এতদুর এগিয়ে আসতে পারতো না। তোমার এ-কথার অর্থ এই যে ভাওনাথ ভীরু।

কোলা বললে—তুমি ভুল বুঝেছ করুণসিং। ভাওনাথ ভীরু

-কথা বলিনি আমি। আমি বলেছি, তার জন্যই আমাদের ভয়।

করুণসিং এবারে কথাটা বুঝতে পারে। তবু গজগজ করতে করতে বললে—তার জন্য তোমার আমার মাথা ঘামাতে হবে না। ভয় তোমার থাকতে পারে কিন্তু আমাদের নেই আর যাকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলা হচ্ছে তারও নেই। কথাটা অস্পষ্টভাবে বললে করুণসিং তবু তা অনেকের কানের পর্দাতেই পেঁৗছে। কোলা, ভাওনাথ বিলাসীও শুনতে পেয়েছে। করুণসিং বলে—মার পোড়ে না মাসির পোড়ে।

ভাওনাথ ও বিলাসী দু'জনেই রাগতভাবে করুণসিংএর দিকে তাকায়।

কোলা কি যেন বলতে যাচ্ছিল। ভাওনাথ তা বুঝতে পেরে আগে থেকেই বলতে শুরু করে। সে বললে—ভয় অভয়ের কোন প্রশ্ন নেই। আমার মনে হয় গুর্খা সংঘের সঙ্গে যোগ দেওয়াই শ্রেয় কারণ এতে সপ্তাহে যে একটা করে ঘরোয়া মিটিং বসবে সমস্ত বাগানের প্রতিনিধিদের নিয়ে তাতে আমরা পরস্পর সবাইকে চিনতে পারবো। আর এই জানাচেনা পরিচয়ের মধ্য দিয়েই একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠবে। এছাড়া বিভিন্ন বাগানের বিভিন্ন কার্যপদ্ধতির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে, পরস্পরের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে প্রত্যেকের ত্রুটি বিচ্যুতি ধরা পড়বে। বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। পাশের বাগানেই কি ঘটছে তার খবর জানতে পারিনে আমরা। এতে সেই সুযোগ পাবে। জ্ঞান, বুদ্ধি বাড়বে, মগজ খুলবে, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ হবে। তারপর বাইরের লোকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার আর একটা মূল্যবান দিক আছে। যে কোন সমিতির কর্ম-পরিচালনা সুষ্ঠুভাবে করতে হলে দেখতে পাই বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন। অনেক কালি কলম কাগজপত্তর খরচ করতে হয়। সে সব কে করবে—আমরা তো প্রতিদিন আমাদের পেটের খোরাক জোগাতেই ব্যস্ত।

ভাওনাথের কথা শুনে বিলাসী যেন তার সমস্ত মায়া

মোহ মমতা কাটিয়ে ওঠে। সে বললে—যোগ দেওয়াই ভাল।

অম্বরবাহাদুর বললে—তা তো বুঝলাম, যোগ দেওয়া ভাল। কিন্তু ওদের সঙ্গে যদি মতানৈক্য ঘটে তাহলে আমরা কোথায় দাঁড়াব তখন?

বিলাসী বললে—আমাদের মন মেজাজ হাতিয়াড় তো আমাদের হাতেই রইলো। তা তো আর আমরা দিয়ে দিচ্ছিনে তাদের।

রাজনীতিক্ষেত্রে মতানৈক্য অনিবার্য। তবে তা স্থায়ী হয় না বললে ভাওনাথ। আর যদি সত্যই কোন গুরুত্বপুর্ণ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয় তাতেও লাভটুছাড়া ক্ষতি হবে না। তর্কবিতর্কের মধ্য দিয়ে ন্যায়ের পথ পরিষ্কার হয়ে যাবে।

এরপর মাসখানেকের মধ্যেই সমস্ত বাগানগুলোতে একটা সজীবতার সাড়া পড়ে যায়। নরসিংবাহাদুরের নামে জয় জয়কার চলছে। তিনি যেদিন বাগানে আসেন সেদিন যেন বাগান অন্য রূপ ধারণ করে। 'নেতাজীকা জয়' ধ্বনিতে ধ্বনিতে সমস্ত বাগান মুখর হয়ে ওঠে। নেতাজীকে জয়মাল্য পরিয়ে মেয়ে-পুরুষ শ্রমিকের দল সগর্বে পথ চলে। তাদের পদক্ষেপে পথের ধুলোবালি উড়তে থাকে শূন্যে শূন্যে। গাছপালা পাহাড়, মাটি, বন সব কিছু কেঁপে ওঠে। জয়ধ্বনি পাহাড়ের গায়ে গিয়ে আঘাত হানে। সেই জয়ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে আবার ফিরে আসে তাদের কাছে। তারা জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে—জয়, নেতাজীকা জয়।

ইতিমধ্যে নরসিংবাহাদুর শ্রমিকদের দু' একটা ছোটখাটো সমস্যার সমাধান করেছেন। যাদের মাসহারা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাদের অ নকেই আবার পেতে শুরু করেছে। ধান দেওয়া হচ্ছিল। সারাদিনরাত ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি হচ্ছে, একটুও রোদ নেই, ধান শুকিয়ে চাল করতে পারছে না অথচ কাজে যেতেই হবে কারণ পাতি শক্ত হয়ে যাচ্ছে সাহেবের কড়া হুকুম। এ ছাড়াও কাজে যাওয়ার আর একটা তাগিদ আছে তাদের নিজেদের তরফ

থেকে। কাজে না গেলে নাগা তো হবেই তা ছাড়া পরবর্তি সপ্তাহে রেশন পাবে না। গুদোমে চাল থাকা সত্বেও ধান দিচ্ছেন সাহেব। শ্রমিকেরা আপত্তি করেছিল কিন্তু বড়সাহেব কিছুতেই রাজী হননি চাল দিতে। কারণ ধান যত বেশিদিন গুদোমে মজুত থাকবে লোকসানের হারও সেই মাত্রায় বেড়ে যাবে দিন দিন অথচ চালের অতটা লোকসান হবে না বরং বর্ষাতে চাল গুদোমে থাকলে চালের ওজন বাড়বে। এই সমস্যারও সমাধান করে দিয়েছেন নরসিং-বাহাদুর। তিনি বাগানে বাগানে সাহেবদের কাছে গিয়ে অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা ধান কোন মিলে দিয়ে ভাঙিয়ে নেন। সাহেবেরা এতে আপত্তি করে বলেন—এ সম্ভবপর নয় কারণ ধান মিলে দিয়ে ভাঙিয়ে আনতে হলে সময়ের প্রয়োজন। এতে যে সময় লাগবে এই সময়ে চাল দিলে ধান চাল হয়ে আসার আগেই গুদোমে একদানাও চাল থাকবে না। শেষে অনেক তর্কবিতর্কের পর নরসিংবাহাদুর বলেন—তা হলে ধান বর্ষা কমে গেলে দেবেন। এখন চাল দেন। আর তা যদি না দেন তাহলে ধান ভাঙিয়ে চাল তৈরি করার জন্য শ্রমিকদের দুদিন করে ছুটি দেন। তবে এই ছুটির বেতন দিতে হবে তাদের আর পরবর্তি সপ্তাহের রেশনও কাটা চলবে না।

নরসিংবাহাদুর কথাগুলো বেশ দৃঢ় ও রুক্ষভাবেই বলেছিলেন। সাহেবেরা তাঁর দৃঢ়তা দেখে একটু ভয় পান। যা হয় একটা কিছু না করলে গোলমালের সম্ভাবনা আছে। অন্য সময় হলে হয়ত ভয় পেতেন না কিন্তু বর্তমানে সময়টা বড় খারাপ। প্রচুর পরিমাণে বারিপাতের ফলে পাতি উঠেছে লকলকিয়ে। সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত বাগানের পাতি টিপতে না পারলে পাতি কেটে ফেলে দিতে হবে। এতে বহু টাকার ক্ষতি হবে বাগানের। তা ছাড়া নিজেদেরও ক্ষতি। কমিশনের অঙ্কটা কমে যাবে। এ নিয়ে আলোচনা হয় ক্লাবে ক্লাবে। শেষ পর্যন্ত এঁরা নরসিংবাহাদুরের দ্বিতীয় প্রস্তাবটি মেনে নেন।

এই সময় থেকেই নরসিংবাহাদুরের কদর বাড়ে সাহেব মহলে। সাহেবেরা যে মনেপ্রাণে তাঁকে ভাল বাসতো তা বোধ হয় ঠিক নয়

তবে মুখে সমাদর দেখাতে পশ্চাদপদ হতো না। এই নরসিং-বাহাদুরকে প্রথম প্রথম সাহেবদের সামনে গিয়ে আবেদনকারীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে হতো অনেকক্ষণ। সাহেবরা কাজের অছিলায় টেবিলের অকেজো কাগজপত্তর নাড়তে চাড়তে থাকতেন, চোখ উঠোতেন না কাগজ থেকে তারপর অনেকক্ষণ বাদে মুখ তুলে গম্ভীর ভাবে জিগ্যেস করতেন—কি চাই। দাড়িয়ে দাঁড়িয়েই নরসিংবাহাদুরকে কথা বলতে হতো। সাহেবেরা কথা না বললে নয় তাই দু' একটা হাঁ, কি না করেই জবাব শেষ করতেন। কেমন যেন গা-জ্বালা বিরক্তভাবে উত্তর দিতেন। আর আজকাল নরসিং-বাহাদুর অফিসে এলেই হাতের সমস্ত কাজ ফেলে সাহেবেরা তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। হ্যাণ্ডসেক্ কুশলবার্তার বিনিময় হয়। হাসিতে হাসিতে ভরে উঠতো অফিস ঘর। মুখোমুখি চেয়ারে বসে অনেক কথা হয়। কি কথা হয় তা কিছুই বুঝতে পারেনা শ্রমিকেরা। তবে তারা নিশ্চিত ভাবেই ধরে নেয়—কথাগুলো তাদেরই নিয়ে। তাদের দুঃখ বেদনার কাহিনীই বলেন নরসিংবাহাদুর। মনে মনে গর্ব অনুভব করে শ্রমিকের দল। শরতের শিশির ধোওয়া মাটি ঘাসের মত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সমস্ত বাগানগুলো। দূরের আকাশ থেকে রোদ নেমে এসেছে তাদের সমস্ত দেহে। আশা আকাঙ্ক্ষা উৎসাহমাখা ফুটন্ত কুঁড়ির মত রোদ। উদ্দিপ্ত করে তুলেছে মনটা। অনেক গান ও সুরলহরির তন্ময়তায় মধ্যে দিয়ে তারা চলে যায় অনেক, অনেক দূরে। পাহাড়টা যেন অনেক নরম হয়েছে, বনের বাঘ ভালুক লেজ গুটিয়ে গুহান্তরালে ঢুকে যাচ্ছে।

স্কুলের সামনে ছোট একটি ফুলের বাগান। সেদিন স্কুল ঘরে ঢোকার আগেই ভাওনাথের নজরে পড়ে একটা গোলাপ ফুল। ফুলটি ফুটি ফুটি করছে। ভাওনাথ একদৃষ্টে ফুল দেখছে।

ইরমধ্যে অম্বরবাহাদুর, করুণসিং ও মদনফুল গিয়ে হাজির হয় সেখানে। ভাওনাথকে ঐরকম ভাবে দেখতে পেয়ে অম্বরবাহাদুর জিগ্যেস করে—কি দেখছ এখানে?

ফুল, বললে ভাওনাথ।

অম্বরবাহাদুর হেসে বললে—তোমার দেখছি, বুড়ো বয়সে বেশ রসবোধ হয়েছে। একটা মেয়েটেয়ে দেখবো নাকি ?

ভাওনাথের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি দেখা দেয়। সে বললে—ফুলটির মধ্যে যেন মানুষের জীবনের সমস্ত রূপ ফুটে উঠছে। এই ফুলটি কদিন আগে এমন কি কালও দেখেছি ছিল একটা কুঁড়ি। আজ ফুটন্ত। তার জীবনটা এতদিন কুঁড়ির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সে কিছুই দেখতে পায়নি এ-জগতের। জানতেও পারেনি কিছু। আজ ফুটে উঠছে। সব জানতে চায়, বুঝতে চায়। চোখ খুলেছে। কালও এর কেমন একটা ঘেসো ঘেসো গন্ধ ছিল কিন্তু আজ ফোটার মুখেই দেখ কেমন সুন্দর গন্ধ দিচ্ছে। কাল দেখতে পাবে আশপাশের সমস্ত জায়গাটা গন্ধময় করে তুলবে। ওর সমস্ত জীবনটার বিকাশ হবে। মানুষের জীবনও এই রকম কুঁড়ির মধ্যে এক অন্ধশালায় আবদ্ধ থাকে তারপর রোদ জল হাওয়া বাতাস পেয়ে ফুটে ওঠে। জীবনের সমস্ত রূপটা দেখতে পায়। জগতটাকেও।

করুণসিং বললে—এবারে দেওয়ালঘেরা অন্ধশালার কপাট খুলছে। অনেক মানুষ মুক্তি পাবে। দেওয়াল তৈরি মানুষের, ভগবানের নয় তাই মানুষেই আবার এ দেওয়াল ভাঙবে।

অম্বরবাহাদুর বললে—যাই বলো, নেতাজী কিন্তু কাজের মত কাজ করছেন।

মদনফুল বললে—কাজ করছেন বলে আমরা যদি হাত গুটিয়ে বসে থাকি তাহলে দেখতে পাবে নেতাজীর অস্তিত্ব লোপ পেয়ে গেছে।

স্কুলঘরে বড় হট্টগোল হচ্ছিল পড়ুয়াদের। অম্বরবাহাদুর বললে—নাও, ও-সব কথা রেখে দাও এখন। স্কুলে বড় গোলমাল হচ্ছে, স্কুলে চলো সবাই।

গুর্খা সংঘের একমাত্র আলিপুর দুয়ার হেড্ অফিস ছাড়া নিজস্ব ঘর বলতে কিছু নেই কোন বাগানে। প্রতি বাগানেই সভ্যদের ঘরোয়া বৈঠক বসে বাগানের সভাপতি বা অন্য কোন সহকর্মীর বাড়ীতে। আলিপুরে সংঘের ঘরটা খুব ছোট। ছোট একটা

একপায়ে বারান্দা। ঘরের মধ্যে বিশ বাইশ জনের ওপর লোকের স্থান হয় না। তাও গাদাগাদি ঠাসাঠাসি বসলে। নরসিংবাহাদুর এই ঘরেই থাকেন একজন চেলা নিয়ে। নাম—বালকসিং। তবে নরসিংবাহাদুরকে এক রবিবার ছাড়া বড় একটা অন্য বারে পাওয়া যায় না কারণ অন্য বারে তিনি বাগানে বাগানে শাখা সমিতির কাজকর্ম ও শ্রমিকদের দুঃখ বেদনা অভিযোগ অনুযোগ জানবার জন্য বাইরে বাইরে থাকেন।

রবিবারে সমস্ত বাগানের প্রতিনিধি ও সংঘের সভ্যগণ উপস্থিত হলে ঘরে আর ঠাঁই হতো না তখন ঘরের লাগোয়া খোলা মাঠের মধ্যে বসেই কথাবার্তা হতো সকলের। তারপর সন্ধ্যা হলে লোকের ভিড় হালকা হতো। শুধু বাগানের প্রতিনিধিরা থেকে যেত অনেক রাত পর্যন্ত। ঘরোয়া বৈঠক বসতো ঘরে।

এরমধ্যে একদিন নরসিংবাহাদুর সমস্ত বাগানের প্রতিনিধিদের নিকটে একটা কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর্স খুলবার প্রস্তাব দেন। তিনি সকলকে বুঝিয়ে বলেন—এই ষ্টোর্সে আমরা মজুরদের জন্য সস্তা দরে ডিসপোজ্যালের জিনিসপত্তরগুলো কিনে মজুত করবো। তারপর বাজারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম দামে সেইগুলো মজুরদের কাছে বিক্রী করা হবে। এতে তাদের অনেক সুবিধা হবে আর এ-ছাড়া সামান্য অল্প কিছু একটা যা লাভ থাকবে তা সংঘের ফাণ্ডে মজুত রাখা হবে।

এরমধ্যে প্রতি রবিবারের বৈঠকের আলোচনা, কথাবার্তা ও আচার ব্যবহারে প্রায় সমস্ত বাগানের প্রতিনিধিরাই বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল ভাওনাথের ওপর। নরসিংবাহাদুরের এই প্রস্তাবে সকলেই ভাওনাথের মুখের দিকে তাকায়। তাদের ধারণা ছিল ভাওনাথই প্রথম জবাব দেবে। কিন্তু ভাওনাথ নীরব থাকে অনেকক্ষণ। কি যেন ভাবছিল। সমস্ত কাজেরই দুটো দিক আছে। একটা সু অপরটি কু হয়ত নরসিংবাহাদুরের প্রস্তাবের এই দুটো দিকেরই বিচার বিবেচনা করছিল সে। কিন্তু এই প্রস্তাবের মধ্যে কু বলে যে কিছু থাকতে পারে এ-ধারণা তাদের মগজের বাইরে। এতো সরল সুন্দর প্রস্তাব। এরমধ্যে কোন ঘোরপ্যাঁচ

বা আবিলতা নেই। সকলেরই ঠোঁট নড়ছে। হ্যাঁ, কথাটা ঠোঁটের ডগায় এসে নড়াচড়া করছে। একটা অস্বস্তি অনুভব করছে সকলে। ঠোঁটটা আর চেপে রাখতে পারছে না। হঠাৎ মাঝের-ভাবরি বাগানের বালকসিং বলে ওঠে—এতে আপত্তির কি আছে, এতো খুব ভাল কথা। সহজ, সরল। চিন্তা ভাবনার কিছুই নেই। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঠোঁটগুলো বালকসিংকে সায় দিয়ে 'হ্যাঁ' বলে ওঠে।

ভাওনাথ সকলের মুখের দিকে একবারটা তাকিয়ে আবার মুখ নিচু করে নীরবে কি যেন ভাবতে থাকে।

ভাওনাথকে নির্বাক থাকতে দেখে নরসিংবাহাদুর জিগ্যেস করেন—তোমার কি মত ভাওনাথ।

ভাওনাথ মুখটি উঁচু করে নরসিংবাহাদুরের দিকে চেয়ে বললে—প্রস্তাবটি আমার কাছে যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না। এর একটা খারাপ দিক আছে—সেই খারাপ দিকটাই যুক্তি ও চিন্তা সাপেক্ষ। এই প্রস্তাবটি কার্যে পরিণত করতে হলে বহু টাকা পয়সার প্রয়োজন। এই টাকা পয়সা সংগ্রহ করা চারটিখানি কথা নয়। হয়ত এই টাকা সংগ্রহ হতে পারে কিন্তু আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে টাকাটা জনসাধারণের। এই গরিব জনসাধারণের টাকা নিয়ে যদি কোন ক্রমে তা নষ্ট হয় তাহলে আপসোসের অন্ত থাকবে না। সংঘের উপরেও কোন আস্থা থাকবে না। এর ফলে শেষে হয়ত সংঘটির অস্তিত্ব লোপ পাবে। কেনাকাটা বিক্রীবাটা করার জন্তও ভাল ও সৎলোকের প্রয়োজন।

নরসিংবাহাদুর বললে—কেনাকাটা, হিসেবপত্তর ও টাকা পয়সার আদানপ্রদান এ-সবই আমি করবো তবে বিক্রীবাটাটা বালকসিং করবে।

এই দোকান নিয়ে আপনি ব্যস্ত থাকলে সংঘের কাজের নিশ্চয়ই ক্ষতি হবে আমার মনে হয়, বললে ভাওনাথ। দেখুন, যা ভাল বোঝেন, করুন।

নরসিংবাহাদুর একটু হেসে বললে— সংঘের ক্ষতি করে কখনই দোকান নিয়ে মেতে থাকবো না। সংঘের কাজ ঠিক মত করে তারপর দোকান।

এরপর প্রায় কুড়ি হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয় বাগান বাগান থেকে। কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স ষ্টার্ট হয়েছে। মালপত্তরে নরসিংবাহাদুরের আলিপুরের ছোট ঘরটি একটা গুদোমে পরিণত হয়েছে। মালপত্তর কেনাকাটা করা, হিসাবপত্তর রাখা টাকা পয়সার দেনা: পাওনা সবই নরসিংবাহাদুরের হাতে, বালকসিং কেবলমাত্র বিক্রী করে। দোকানের জন্য সংঘের কাজেরও কোন ক্ষতি হচ্ছে না। নরসিংবাহাদুর অমানুষিক পরিশ্রম করছেন। বাগানের সকলেই অবাক হয়।

মাস তিনেকের মধ্যেই দেখা গেল। কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর্স বেশ ভালভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। এরই মধ্যে ডিসপোজ্যালের মাল অপ্রত্যাশিত সস্তা দরে কিনে প্রচুর লাভ হয়েছে। সংঘের ফাণ্ডে টাকা বাড়ছে আবার সেই সঙ্গে শ্রমিকেরাও বেশ সুবিধা দরে মাল পাচ্ছে। বাগানের দোকানদারগুলোর দিকে অনেকেই কটাক্ষ হানে। দু'চারটে মন্তব্যও করতে ছাড়ে না। রক্তচোষার দল কী রক্তটাই না খেয়েছে আমাদের! জুচ্চোর, বদমায়স! আরো অনেক কিছু।

ইতিমধ্যে কখন থেকে যে মাটির তলায় ফাটল ধরেছে তা কেউ জানে না। সমস্ত জল কোথায় যেন হারিয়ে গিয়ে মাটি নিরস, শক্ত হয়ে উঠছে। বাগানে বাগানে সাহেব বাবুরা নরসিংবাহাদুরের নামে কুৎসা রটাতে শুরু করেছেন বিশেষ করে আদিবাসীদের কাছে। তাঁরা বলেন—এ সংঘ তোমাদের নয়, এ সংঘ নেপালীদের। এতে তোমাদের কোনই লাভ হবে না বরং ক্ষতি হবে ষোল আনা কারণ তোমাদের টাকা পয়সা নিয়েই তারা বড় ও শক্তিশালী করবে নেপালী সমাজকে। সংঘের নাম দেখেই তো বুঝতে পার তোমরা। গুর্খা সংঘ নাম কেন? তোমাদের উচিত এই সংঘ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্য কোন সংঘ তৈরি করা।

সাহেব বাবুদের কথায় কেমন খটকা লাগে আদিবাসীদের। সত্যই তো তারা এ-বিষয় ভেবে দেখেনি আগে। তবে নরসিং-বাহাদুর যে ঠিকমত নিঃস্বার্থভাবে কাজ করছেন একথা অস্বীকার করতে পারে না। এরই মধ্যে অনেক সমস্যার সমাধান করে

দিয়েছেন তিনি। আদিবাসীর স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে নেপালীকে শক্তিশালী করার মত কোন কাজ নরসিংবাহাদুর করেছেন বলে স্মরণ করতে পারে না। সুতরাং এটা সাহেব বাবুদেরই একটা ধাপ্পাবাজি বলে নিশ্চিত ধরে নেয়।

এরমধ্যে শাসন পরিষদের সভ্য নির্বাচনের সময় উপস্থিত হয়। নরসিংবাহাদুরের ইচ্ছা তিনি এতে মংরার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এতে সকলেরই একমত। কোন আপত্তি উপস্থাপিত হয় না এই প্রস্তাবে। কারণ ইতিমধ্যে সকলেই মংরার ওপর অসন্তুষ্ট হয়েছে। সে কোনই কাজ করেনি শ্রমিকদের জন্য বরং ষোল আনা বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সাহেবদের সবল ও বলিষ্ঠ করেছে তাদের পক্ষে হাত উঁচিয়ে। একটা কথাও বলতে পারেনি পরিষদকক্ষে। বোঝেও না কিছু।

এরপর নির্বাচনে নরসিংবাহাদুর পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন। মংরাকে শিখণ্ডি খাঁড়া করে সাহেবেরা নরসিংবাহাদুরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করান কিন্তু তাতে কোনই সুফল হয় না। এবারে সকলেই বুঝতে পারে সাহেববাবুরা কেন 'গুর্খা সংঘের' নামে আপত্তি তুলে এই অবাঞ্ছিত আন্দোলনের সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সকলেই হাসে, গর্ব অনুভব করে মনে মনে, ভাবে তারা আর আগের মত বোকা নেই।

নরসিংবাহাদুর পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হওয়ার পর দেখা যায় যে সাহেবেদের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা আরো নিবিড় হচ্ছে দিন দিন। সাহেবদের সঙ্গে এইরকম মেলামেশা, এক টেবিলে বসে চা পান আর গল্পগুজব করা প্রথম প্রথম শ্রমিকদের কাছে ভালোই লেগেছিল কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত তার ঘনিষ্টতা বাড়ছে সাহেবদের সঙ্গে অথচ তারা যেন কেমন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে তাঁর থেকে। তাঁর দর্শন ও সঙ্গলাভ আজকাল প্রায়ই তাদের ভাগ্যে জোটে না। এরকমটা অনেকেই তাদের মন ও মেজাজের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারছে না। মনে করে—কোথাও কোন ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। তবে কোথায়, কেমন করে বা কি জন্য তা তারা বুঝতে পারে না।

বিলাসী, অম্বরবাহাদুর, মদনফুল ও করুণসিংএর কেমন সন্দেহ

হয় নরসিংবাহাদুরের ওপর। তারা নরসিংবাহাদুরকে স্বার্থপর বলে ভাবতে থাকে। তাদের বিশ্বাস নরসিংবাহাদুর নিজেকে সমৃদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই এই পথ ধরেছিল। এ নিয়ে অনেক আলোচনা হয় নিজেদের মধ্যে। অন্য অন্য বাগানের শ্রমিকদের মধ্যেও আলোচনা চলছে। তাদের মনেও সন্দেহের দোল দিচ্ছে।

ভাওনাথের মনেও আঁচ লেগেছে। মাঝে মাঝে বিরক্ত ও বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে নরসিবাহাদুরের ওপর। সে নরসিংবাহাদুরকে বলে—সাহেবদের সঙ্গে এত মেলামেশা কি ঠিক হচ্ছে। বেশি অন্তরঙ্গতা হলেই দেখা যায় যে অনেক সময় অনেক গোপন কথাও ফাঁস হয়ে যায়।

নরসিংবাহাদুর বললে—আমি পরিষদের একজন সদস্য। আমাকে দু'পক্ষেরই কথা শুনতে হবে। আমি যে সবারই। কেবল মাত্র শ্রমিকদের এক তরফা কথা শুনে কোন কাজ করলে চলবে না। মানুষ চায় অনেক কিন্তু ন্যায়ত পায় কতটুকু।

নরসিংবাহাদুর কথাগুলো হেসে হেসে বললেও তার মধ্যে কেমন যেন একটা রুক্ষতা আছে ভাওনাথ বুঝতে পারে তা। আগের মত স্বাভাবিক নয়। ভাওনাথের সন্দেহ আরো দৃঢ়তর হয়। চিন্তার ধারা বেয়ে অনেক দূরে চলে যায়। অনেক খুঁটিনাটি ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়ে। এইগুলো যেন আগে চোখে দেখতে পায়নি সে। দেখতে যে পায়নি তা ঠিক নয়। দেখতে সে পেয়েছিল তবে প্রগাঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাই সেগুলোর দাগ কাটতে দেয়নি মনে। মনটাই বড়কে ছোট, ছোটকে বড় করে। চিন্তা তাতে ইন্ধন জোগায়।

এরপর চার মাসের মধ্যেই দেখা গেল যে কো-অপারেটিভ স্টোর্স কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। নরসিংবাহাদুরের ঘর বাড়ানো হয়েছে। তবু ঘরে তেমন একটা মালপত্তর নেই। মালপত্তরের পরিবর্তে সেখানে আসবাব পত্তরের বাহার বেড়েছে। চেয়ার টেবিল টুল বেঞ্চে ঘরখানা ভরতি। বাগান বাগান থেকে শ্রমিকরা যায় কাপড় জামা কিনতে কিন্তু খালি হাতে নিরাশ মনে ফিরে আসে। মাঝের থেকে অযথা টাকা পয়সা খোয়া গেল অ'সা যাওয়ার গাড়ি

ভাড়াতে। ঐ টাকাটা থাকলে বরং একবেলার খোরাক হতো। লোকগুলো বিরক্ত হয়ে ওঠে। বাগানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বেশ রুক্ষভাবেই আলোচনা করে। এ যেন প্রতিনিধিদেরই দোষ। তাদের অনেকের বিশ্বাস যে এই প্রতিনিধির দল আর নরসিংবাহাদুর মিলেই ষ্টোর্সের টাকাগুলো লুটে খেয়েছে। প্রতিনিধির দল শক্তিশালী হলে কি হবে সমষ্টির কাছে তাদের শক্তি আর কতটুকু। মহাঝামেলার মধ্যে পড়ে তারা। সমস্ত বাগানের প্রতিনিধিদের একটা বৈঠক বসে। বৈঠক বসে দলমাননগরের স্কুল ঘরে। বৈঠকে সকলেই এই বিষয়ের সমস্ত ভিতরের গলদ জানবার জন্য ভাওনাথকে অনুরোধ করে।

এদিকে আদিবাসীদের মধ্যে বলতে শোনা যায় যে সাহেব-বাবুরা ঠিক কথাই বলেছিলেন—এই সংঘ আদিবাসীর জন্য নয়, এ শুধু নেপালীদের জন্য তাই সংঘের নাম 'গুর্খা সংঘ'। এই সম্বন্ধে তাদের আর বিন্দুমাত্র সংশয় থাকে না। তাদের ইচ্ছা তারা যেমন ছিল তেমনি থাকবে। ভাওনাথই একমাত্র লোক যে যথার্থ নিস্বার্থ এবং নিরুপেক্ষ ভাবে সমস্ত শ্রমিকের দুঃখ বেদনা মনে প্রাণে অনুভব করে। অনেকে ভাওনাথকে বলে 'গুর্খা সংঘ' চুরমার করে ভেঙে দিয়ে একটা 'আদিবাসী সংঘ' গড়ে তোল। অন্যান্য বাগানের আদিবাসীরাও ভাওনাথকে ঐ একই অনুরোধ জানায়।

এরপর একদিন কো-অপারেটিভ্ ষ্টোর্সের হিসাব নিকাশ হয়। নরসিংবাহাদুর অনেক রকম গোজামিল দেওয়া সত্বেও প্রায় সাত হাজার টাকার হিসাব মিলাতে পারেন না। সময় নেন। বলেন অনেক কাজ, নিরিবিলি বসে হিসাবটা দেখতে সময় করতে পারছেন না। দিনের পর দিন যায় কিন্তু হিসাব দেখার সময় আর হয়না। লোকগুলো প্রায়ই গিয়ে ফিরে আসে। তারা বুঝতে পারে হিসাব আর মিলবে না, সময়ও হবে না নরসিংবাহাদুরের। এ নিয়ে অনেকেই দু'একটা আগুনে কথার ঢিলও তাঁর গায়ে ছোঁড়ে।

এরমধ্যে চা বাগানের বাবুরাও একটা সমিতি গঠন করেছেন। সমিতির নাম 'ভারত চা বাগান কর্মচারী সমিতি'। শুধু একটা

মাত্র বাগান নিয়ে এই সমিতি গঠন করা সম্ভবপর নয় কারণ একটা বাগানে আর ক'জন বাবু আছেন। বড়জোর ষোল সতের জন। তাই এই সমিতি গঠন হয় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি বাগানের বাবু নিয়ে। এজন্য সাহেবেরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন। অনেক বাগানে তো সাহেবেরা আরো বেশি কড়াকড়ি করতে থাকেন বাবুদের ওপর। অকেজো, অপ্রয়োজনীয় অনেক কাজের ফিরিস্তি তৈরি করে বাবুদের উৎপীড়ন করতে শুরু করেন। গালিগালাজের মাত্রাও বেড়ে যায়। সুযোগ সুবিধাও কমিয়ে দেন। মাঝে মধ্যে এখানে সেখানে যাওয়ার জন্য আগে লরী দিতেন বাবুদের। বন্ধ করে দেন তা। অনেক বাগানের বাজার অনেক দূরে। তাই লরী দিতেন সাহেবেরা। এতে সাহেব ও বাবুদের বাজার আসতো কিন্তু তাও বন্ধ করে দেন। হাঁটা ছাড়া উপায় নেই অথচ হেঁটে যেতে বেশ সময় লাগে। তারপর ফিরে আসার সময় মালের থলে পুটলিপত্তর নিয়ে বাগানে ফিরতে গলদঘর্ম হতে হয়। সমিতির মিটিং বসে প্রায়ই। এই মিটিংএ যানবাহন ছাড়া অনেক বাগানের বাবুদেরই যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ মিটিং বসে সাধারণত চা বাগানের এলাকার বাইরে। তাই বেশ খানিক দূর। অন্য যানবাহনও নেই যে তাতে যান। রেল গাড়িতে যাওয়া যায় কিন্তু ফেরার সময় রাতে আর গাড়ি পাওয়া যায় না। সকলেই বুঝতে পারে সমিতিটাকে বানচাল করে দেওয়ার জন্যই সাহেবদের এই প্রচেষ্টা। এই সমিতির গঠন সময়ে প্রথমটায় বাবুদের মধ্য থেকেই সেক্রেটারী, চেয়ারম্যান, কেশিয়ার ও কার্যপরিচালক সভ্য নির্বাচিত হয়। সেক্রেটারীকে আর বেশি দিন এই পদে থাকতে হয় না। পাঁচ ছয় মাসের মধ্যেই তাঁকে বাধ্যতামূলক ভাবে আসামের একটা বাগানে বদলি করে দেন কোম্পানী। পরবর্তি সেক্রেটারী বাগানের সাহেবের হুমকি কড়াকড়ি ও কাজের চাপে আর বাগানে তিষ্ঠতে পারেন না। এই সময়ে দুটি বাগানে দুইজন বাবুকে বরখাস্ত করেন সাহেবেরা। এদের নিয়ে হুলুস্থূল পড়ে যায় বাগানে। ভয়ে কাঁপতে থাকেন—কখন কার চাকরি যায়। বাবুরা অনেকেই কলকাতা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জায়গায় ছুটে বেড়াতে

থাকেন। শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করেন—সমিতির সমস্ত কার্য-পরিচালনার জন্য তাঁরা একজন বিশেষ রাজনীতি অভিজ্ঞকে নিযুক্ত করবেন। তা না হলে তাঁদের মগজে আর কুলোচ্ছে না।

ভাওনাথের অনেক দিন বাদে আবার নিরঞ্জনবাবুর কথা মনে পড়ে। সত্যিই, বাইরের লোক না থাকলে সমিতি চালানো দুঃসাধ্য। নরসিংবাহাদুরের তাঁবেদারে থাকলে সমিতির মান অক্ষুণ্ণ থাকবে না। কি করা যায় ভেবে কুলকিনারা পায় না সে। কিন্তু সমস্ত বাগানের লোকগুলো তাকেই কাজ চালিয়ে যেতে বলছে। সে কি সম্ভব? নিরঞ্জনবাবু লোকটা থাকলে না হয় কিছুটা সম্ভব হতো। লোকটার মগজ ছিল। নিস্বার্থও বটে। হয়ত এতদিনে বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। কার্যক্ষমতাও কমে গেছে। বয়স তো আর কম হয় নি। একটু ভেবে নিজের মনেই হেসে ওঠে। তার নিজেরই তো ষাটের ওপর হলো।

এতদিন বয়সের কথা মনেই আসেনি। বাপ মায়ের কথা মনে পড়ে। একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ভয়, মৃত্যুর ভয়। মৃত্যু যেন ঘনিয়ে আসছে। পাহাড়ের আলো নিভে আসছে। একটুক্ষণ বাদেই হয়ত অন্ধকার এসে ঘিরে ফেলবে। এই ঘর বাড়ি গাছপালা লোকজন সব কিছু হারিয়ে যাবে। আমার, আমার বন্ধ হয়ে যাবে। আমার আমিকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক মহাশক্তিশালী আমি তার আসন পেতে বসবে। আমাকে মরতে দেবে না সে। আমার হাতে তার অনেক কাজ। আর সে তো বাপ মায়ের বয়স ডিঙিয়ে গেছে অনেক আগেই।

না, নিরঞ্জনবাবু তেমন একটা বুড়ো হন নি। তিনি তো তার চেয়েও ছোট। বেশি না হলেও দু'চার বছরের তো বটে। আর ষাট বছর বয়সে লোকে তেমন কি বুড়ো হয়। অনেকে তো নব্বই একানব্বই বছর পর্যন্ত বাঁচে। মরণের দিন পর্যন্ত সুস্থ, সবল ও বলিষ্ঠ থাকে। নিজের শক্ত হাত দুটো নেড়ে দৃঢ়তা পরীক্ষা করে ভাওনাথ। কাজের লোক যারা তারা বুড়ো হয় না। কর্মস্পৃহা তাদের বুড়ো হাড়ের মজ্জায় মজ্জায় যৌবনের শক্তি যোজনা করে। নিরঞ্জনবাবু কাজের লোক।

আজ এক বছর ধরে নিরঞ্জনবাবুর নাম প্রায়ই খবরের কাগজে দেখতে পায় সে। নিরঞ্জন তরফদার। মনে হয় সেই নিরঞ্জনবাবু। বিশ্বাস ঘন হয়ে আসে। পরক্ষণেই বিশ্বাসের গাঁট ছিঁড়ে যায়। পাতলা ফিকে হয়ে যায় বিশ্বাস ও দৃঢ়তা। নিরঞ্জন তরফদার তো আরো অনেকের নাম আছে। আর এই বয়সে কি নিরঞ্জনবাবু দেশের বা দশের কাজে নামতে পারেন। আবার সেই বয়সের কথা। না, বয়স কিছু না—মনই শক্তি দেয়। আবার দানা বাঁধে বিশ্বাস।

এরমধ্যে নতুন করে আবার একটা বৃহত্তর সমিতি গড়ে তোলবার আয়োজন চলছে। ইতিমধ্যে 'গুর্খা সংঘ'ও নাম বদলি করেছে। 'গুর্খা সংঘের' নতুন নাম হয়েছে 'মজদুর সংঘ'। এর কারণ ভাওনাথ বুঝতে পারে। এই নতুন নাম দিয়ে সমস্ত মজদুরকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। এতে কোন সুফল পাননি। আদিবাসী বলতে প্রায় সকলেই বেরিয়ে আসে নরসিং-বাহাদুরের 'সংঘ' থেকে কিন্তু নেপালী সম্প্রদায়ের বেশির ভাগ মজদুর ঐ সংঘের সঙ্গেই যুক্ত থেকে যায়।

এই বৃহত্তর সমিতির কার্যভার গ্রহণ করবার কথা ভাবতেই মনে মনে ভয় পায় ভাওনাথ। খাটুনি বা পরিশ্রমের কথা ভাবে না সে। সেজন্য কোন চিন্তাও নেই তার। বয়স ষাটের উপর হলেও এখনও সুস্থ ও সবলতার দিক দিয়ে বিচারে সে একজন বলিষ্ঠদেহী যুবকের চেয়ে কম নয়। ভয় মগজের। তার ক্ষুদ্র বিদ্যাবুদ্ধি কি এই বৃহত্তর কাজের সবদিক চিন্তা করতে পারবে? সে এতদিন পরিচালনা করে আসছে একটা ক্ষুদ্র সমিতি। ঠিক সমিতি নয়, একটা ছোট্ট স্কুল। এই স্কুলের শিক্ষার মধ্য দিয়েই একটি বাগানের সামান্য মুষ্টিমেয় কয়েকজন শ্রমিককে তাদের জীবনটাকে উপলব্ধি করবার সুযোগ করে দিয়েছে। এছাড়া আর কি? আর কিছুই তো তার চোখে ধরা পড়ে না। তারপর সময় কোথায় তার? সারাদিন তো বাগানের কাজ। সময় যা একটু পায় তা তো রাতে। সে সময়ে তো স্কুল। স্কুলটা তুলে দিতে সে কিছুতেই রাজী নয়। স্কুলটা তার বুকের পাঁজর আর দেহের রক্ত দিয়ে তৈরি।

বিলাসী ও পদমমায়া বললে—তোর খাওয়াপরার জন্ত চিন্তা করতে হবে না। আমরা যা কামাই করবো তাতে তোর পেটটাও চালাতে পারবো।

ভাওনাথ বললে—খাওয়াপরাটা না হয় দিলে। কিন্তু মগজ পাব কোথায় ?

বিলাসী বললে—তোর নিজের যে মগজ আছে তা খাটালেই সব কিছু পাবি। মগজ খাটানোর সুযোগ ও সুবিধা পাসনা তাই মগজটা বাড়তে পারছে না।

স্কুল ?

কেন, স্কুল আমি আর অম্বরবাহাদুর চালাবো, বললে বিলাসী।

ভাওনাথ হেসে ওঠে বিলাসীর কথায়। বললে—তোমার বুড়ো হাড়ে কি অতসব খাটুনি সইবে ?

বিলাসী একরকম রেগে উঠে বললে—তোর ঐ এক কথা। বুড়ো হয়েছ—বুড়ো হয়েছিস। বুড়ো আবার কি ? মন ঠিক থাকলে মানুষ বুড়ো হয় না। তার তেজ ও কর্মক্ষমতাও কমে না।

বিলাসীকে চটানো ভাওনাথের একটা স্বভাব। বিলাসী চটলে খুব ভাল লাগে তার। ঐ সঙ্গে তার কথার মধ্য দিয়ে কেমন একটা উৎসাহ পায় ভাওনাথ। সে বললে—বুড়ো না হয় নাই বা হলে কিন্তু আর একটা দিক ভাববার আছে। আমি যদি বাগানে কাজ না করে সমিতির কাজ চালিয়ে যাই তাহলে তো আমাকে বাগানে থাকতে দেবে না সাহেব। এর প্রমাণ বাবুদের বেলাতেই পেয়েছ।

বিলাসী বললে—বাবুদের কথা আলাদা। তারা কটাইবা লোক। আঙুল দিয়ে গুনে বের করা যায়। আর একটা বাবু গেলে তার জায়গায় এক ঝাঁক এসে হাজির হয়। আমাদের বেলাতে অত সোজা হবে না। একদিন কাজ বন্ধ করলেই সব সুড়সুড়ি ভেঙে যাবে।

এরপর নতুন সমিতি গঠন হয় একশটি চা বাগানের শ্রমিক নিয়ে। এই সংঘেই শতকরা পঁচাত্তর ভাগ শ্রমিক যোগ দিয়েছে। বাকি পঁচিশ ভাগ নরসিংবাহাদুরের সংঘেই রয়ে গেছে। এরা

সকলেই নেপালী অথবা ভুটিয়া। একটা আদিবাসীও নরসিং-বাহাদুরের সংঘে যোগ দেয়নি। ইতিমধ্যেই দোকান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সের সাদা সাইনবোর্ডের মাঝে লাল পেণ্ট দিয়ে লেখা গুর্খা সংঘ কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স কথাটা ভুলে দিয়ে সমস্ত বোর্ডটাতে হলুদ রঙের ছোপ দিয়ে কালো পেণ্টে বড় বড় হরফে লেখা হয়েছে 'মজদুর সংঘ'।

একশটি বাগান নিয়ে সমিতি। মেম্বার সংখ্যা কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার। ভাওনাথ এই সমিতির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছে। সমিতির নাম দিয়েছে পুর্ব ডুয়ার্স চা বাগান মজদুর সংঘ। সকলেই খুব খুশী। কিন্তু ভাওনাথ চিন্তার খেই পায়না। ছোট্ট একটি মাথা অথচ চিন্তা অফুরন্ত। মনে হয় মাঝে মাঝে সংগা হারিয়ে ফেলে সে। একলাটি নিরিবিলি বসে চিন্তার সঙ্গে মনের কথাবার্তা চলে। মন তেজী, মেজাজী হয়ে ওঠে। পরক্ষণেই মন হারিয়ে যায় চিন্তা এসে ঘাড়ে চেপে বসে আবার। একটা দুর্বলতা, অক্ষমতা তার সমস্ত দেহটা অলস, অসাড় ও নিশ্চেষ্ট করে দেয়।

করুণসিং ও মদনকুল বলে ভয় কিসের তোমার? আমরা আছি, জ্ঞাননগর বাগানের তোরঙ্গবাহাদুর ও মঙ্গলে আছে। আমরাই কাজ করবো, তুমি শুধু হুকুম করবে।

অম্বরবাহাদুর ও বিলাসীও ঐ এক কথাই বলে।

তোরঙ্গবাহাদুর মঙ্গলে ও আর আর সমস্ত বাগানের প্রতিনিধিরা উৎসাহ ও সাহস দেয় তাকে। এতে উৎসাহ ও সাহস বাড়ে, দেহে শক্তির পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু সে কতক্ষণ—তার পরমুহূর্তেই চিন্তার দমকা হাওয়া এসে হালকা মস্তিষ্কটাকে কেমন যেন ভারী, নিষ্ক্রিয় করে তোলে।

বিলাসী আগের মতই সব সময় পরামর্শ, উৎসাহ ও সাহস দেয়। বিলাসীর দৃঢ় কথাগুলোর মধ্য দিয়ে আগে যে শক্তি ভাওনাথের মধ্যে সঞ্চারিত হতো তার রূপ আগের মত থাকলেও ভাওনাথ যেন তেমন জোর পায় না। শক্তি সঞ্চারিত হয় তা অনুভব করতে পারে। শিরাগুলো ফুলে কেঁপে ওঠে। রক্তের স্রোত বইতে থাকে। কিন্তু আগের মত অবাধ স্বচ্ছন্দ নয়। উষ্ণতা কম।

মাঝে মাঝে যেন থেমে যায়। রক্তটা জমাট বাঁধে। একটা হিমেল হাওয়ার কাঁপুনি শুরু হয়।

বিলাসী বলে—ভয় কিসের? আমার উপরে বিশ্বাস রাখ—বিশ্বাস রাখ জিতবাহন আর করম গোঁসাইয়ের ওপর। তাঁদের কাজ তাঁদের ওপর ছেড়ে দিয়ে তাঁদেরই ইংগিত মত কাজ করে যা। বুদ্ধি, মগজ, শক্তি সবই তাঁরা দেবেন—ভয় কি তোর?

ভাওনাথ বললে—ভয় নেই সত্য কিন্তু সাহসই বা কোথায়? এই তো এর আগে যাহোক দু'টো মিটিং করেছি স্কুলে। কিন্তু আর তো স্কুলে মিটিং করা চলবে না। বড়সাহেব নোটিশ দিয়েছেন। আর সত্যিই তো তাঁর বিনা অনুমতিতে স্কুলঘরে মিটিং করবার আমাদের কোন অধিকার নেই। ঘরটা কোম্পানীর, আমাদের সম্পত্তি নয়।

কেন, বললে বিলাসী। মিটিং করবো খোলা মাঠে জঙ্গলের ধারে।

ভাওনাথ একটা ম্লান হাসি দিয়ে বললে—ঐ মাঠও তো কোম্পানীর।

মিটিং করবার জায়গার কি অভাব আছে? রেলওয়ে ল্যাণ্ড পড়ে আছে মস্ত বড়। সেখানে করবো।

সেখানে না হয় শীতকালে করবে। বর্ষা শুরু হলে?

বিলাসী এবারে যেন মুস্কিলে পড়ে যায়। জবাব খুঁজে পায় না। চোখের জ্র কুঁচকে যায়। একটুক্ষণ চুপ থেকে বললে—যতদিন চলে চালানো যাক তারপর একটা ব্যবস্থা হবেই।

এরপর সমিতির একটা ঘরোয়া কমিটি মিটিং বসে। এই মিটিং-এ সমিতির ঘরের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয় আলোচনা করা হয়। স্থির করা হয় যে পরবর্তি সাধারণ মিটিংএ সকল মেম্বারের একটা মতামত নেওয়া হবে। তবে এই সাধারণ মিটিং বসবে রেলওয়ে ল্যাণ্ডে।

সাধারণ মিটিং বসে। তোরঙ্গবাহাদুরই ঘরের কথাটা উত্থাপন করে সকলের কাছে।

সমস্ত বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা হওয়ার পর স্থিরীকৃত

হয় যে সমিতির জন্য একটা ঘরের একান্ত প্রয়োজন। এই ঘর তৈরি বাবদ যে টাকার দরকার তা চাঁদা করে বাগান বাগান থেকে তুলতে হবে।

সমস্ত বিষয়ের মীমাংসাই বেশ সরল নিশ্চিন্ত ভাবে হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমস্যা গিয়ে দাঁড়ায়—ঘর কোথায় তুলবে ?

অনাদি হ বলে ওঠে—কেন ? ঘর তুলবো এই রেলওয়ে ল্যাণ্ডে যেখানে বসে আমরা মিটিং করছি আজ ?

ভাওনাথ মুখে হাত দিয়ে কি ভাবছিল এতক্ষণ। এবারে হাতটা মুখ থেকে নাবিয়ে বললে—এখানে ঘর তোলা তো হবেই না বরং আমার মনে হয় শীগগিরই একটা নোটিশ পাব আমরা রেলওয়ে থেকে। জানোই তো ওরা সব এক। হয়ত কালই ম্যানেজার চিঠি লিখবেন কোম্পানী ও ইণ্ডিয়ান টী এসোসিয়েসনের চেয়ারম্যানকে। তারপর তাঁরা সেটা রেলের জেনারেল ম্যানেজারের কাছে পেশ করবেন। রেলওয়ে তো দূরের কথা গভর্ণমেণ্টেরও ক্ষমতা নেই যে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনের কথা অমান্য করেন।

ভাওনাথের কথা শুনে সকলেই নিতান্ত অসহায় বিষণ্ণ চোখে আর দিকে চেয়ে থাকে। মনে হয় তারা তারই উপরে নির্ভরশীল। তাদের মগজে আর খই ফুটছে না। বালির সমস্ত দানাগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গেছে। অপেক্ষা করছে, তারই কাছে জানতে চায় উপায়। তাহলে কি করা যাবে ?

একটা নিঝুম রাতের জমাট নিস্তব্ধতা। কতকটা ভয়, বিমূঢ়তা ও চেতনাশূন্যতার মধ্যে কাটে খানিকক্ষণ। কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছে না। অথচ অনুভব করতে পারছে সব। শেষে ভাওনাথ বললে—চার মাইল দূরে রাজেন্দ্র মোড়লের যে বস্তি আছে তাকে বলে ক'য়ে ধরপাকড় করে সেখানে একটা সমিতির ঘর তুললে কেমন হয় ?

মুহূর্তের মধ্যে পাহাড় হেসে ওঠে। অন্ধকার ফিকে হয়ে যায়। সমস্ত মাঠটা আলোকময় হয়ে ওঠে। আলোর উত্তাপে বালির দানাগুলো উত্তপ্ত হয়ে বাঁধন খুলেছে আবার। খই ফুটতে থাকে মগজে। কথা আর হাসির অফুরন্ত ঢেউয়ে জীবন যেন

কোথায় আর এক নতুন দেশে গিয়ে হাজির হয়। আলো বাতাসে দেশ। সেখানে অন্ধকার নেই, গুমোট নেই। অফুরন্ত ঢেউ আর ফেনা—কথা ও হাসির আসমুদ্র উৎস।

দিন যত এগিয়ে চলেছে বাধাবিঘ্ন তত মূর্তিমান হয়ে উঠছে। অনন্ত কালের সঙ্গে অনন্ত সংঘাত। তবু কাল চলেছে তার কাজ করে।

এরমধ্যে আর এক ফ্যাসাদ এসে জোটে। সমিতি গঠনের তোড়জোড় ও দৃঢ়তা দেখতে পেয়ে বাগানের মালিক সম্প্রদায় পাদরীর স্মরণাপন্ন হন। প্রায় প্রতিদিনই পাদরী আসছেন বাগানে বাগানে। গীর্জা আর এখন যীশুর উপাসনা ঘর নয়—সেখানে চলে ধর্মের নামে রাজনৈতিক আলোচনা। পাদরী সমস্ত খৃষ্টান কুলিদিগকে নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করেন। তিনি বলেন—তোমরা খৃষ্টান, যীশুর ভক্ত। তোমাদের উদ্দেশ্য ভগবানকে লাভ করা, তোমাদের লক্ষ্য রাজদ্রোহিতা করা নয়। আর এ-ছাড়া তোমরাও তো রাজার জাত। রাজার সুখ দুঃখ তোমাদের সুখ দুঃখ। তোমার জাতির তোমার সমাজের। তোমাদের জাতি বা সমাজকে কলঙ্কিত করো না এতে যীশুর কৃপা লাভ করতে পারবে না। তোমরা যীশুর কাছে উপাসনা করবে তোমাদের জাতি বা সমাজের মঙ্গলের জন্যে। তোমরা কেন ক্ষেপে উঠবে তোমাদের আপন জাতির বিরুদ্ধে। একে আত্মহত্যা বলে।

পাদরীর এই সমস্ত বক্তৃতার ফলে খৃষ্টান কুলিগুলোর মনে একটা আতঙ্ক, ভীতি ও সংশয় জাগে। তারপর একে একে সমস্ত খৃষ্টান মজুরই সমিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

যদিও এই খৃষ্টান মজুরের সংখ্যা পাঁচ হাজারের উপর হবে না তবুও মনে মনে তীব্র একটা অস্বস্তি ও বেদনা অনুভব করে ভাওনাথ। জাতিবাদ সমস্যা তাকে পেয়ে বসে।

ভাওনাথ মনে মনে প্রাচীন ও আধুনিক সর্বপ্রকার সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণ করে দেখতে পায় যে এই জাতিবাদ আসলে নির্দিষ্ট কতকগুলো ক্ষমতা বা স্বার্থলোভীর কল্পিত আদর্শ। তারা

এই জাতীয় স্বার্থের ভিগির তুলে বিরাট একটা গোষ্ঠী সৃষ্টি করে ক্ষমতাবান হতে। জাতিবাদ সমাজের সমস্ত বৈচিত্র্য ধ্বংস করে। স্বাধীন চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে কুক্ষিগত করে নিয়ে যায় পরনির্ভরতার মধ্যে। আত্মনির্ভরশীল সমবায়ী প্রতিষ্ঠান-গুলোকে টুকরোঁ টুকরো করে ফেলে, আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায় সমূলে উচ্ছেদ সাধন করে। প্রাক্‌যুগের অসাংস্কৃতিক পশুবৃত্তিগুলিকে উদ্বুদ্ধ করে। ক্ষমতাশালীর অনুগত করে। সমস্ত সৌন্দর্য সাহস বীর্য বিলুপ্ত হয়। ভয়, বিদ্বেষ ও প্রবল হিংস্রতা এসে মনটার মধ্যে আসন করে নেয়। তাই এই জাতিবাদ রাষ্ট্রবাদ বা সাম্রাজ্যবাদ ছাড়া কিছু নয়। এই জাতিবাদের মধ্যে ধর্মবাদ বলতে কিছু নেই। অথচ এই জাতিবাদের একাত্ম করিয়ে এই দুর্বল মানুষগুলিকে ধর্মের নামে আরো ভীত এবং দুর্বলতর করে তোলে।

এই জাতিবাদের কথা আরো অনেকবার ভেবেছে ভাওনাথ। তবে আজকার মত এত বিশ্লেষণ করে নয়। যত ভাবে তত তার গলদ বার হচ্ছে। বিজ্ঞান দূরের মানুষকে নিকটে এনেছে এ-কথা সত্য। তবু যেন মনে হয় মানুষ অনেক দূরে। অনেক রাস্তাঘাট গাড়ীঘোড়া হয়েছে। পথের সমস্ত বাধা সরে গেছে। কিন্তু আর এক নতুন বাধার সৃষ্টি হয়েছে। এ অন্তরের বাধা। এই অন্তরের বাধা দূর করতে হলে শিক্ষার প্রয়োজন। তাই এই পথ বেছে নিয়েছিল সে। গড়ে তুলেছে শিক্ষাকেন্দ্র—একটা স্কুল। স্কুল সরকারেরও আছে। কিন্তু তার স্কুল স্বতন্ত্র। সরকারের স্কুলে শিক্ষা দেওয়া হয় রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্যবাদ। আর তার স্কুলে সাম্য অথবা গণতন্ত্রবাদ। এই দু'টি বাদেরই বিরোধী ধারা। প্রথমটি ধ্বংসাত্মক আর দ্বিতীয়টি গঠনমূলক। তার বিশ্বাস যতদিন সমাজগঠন না হবে ততদিন ধর্মের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। প্রকৃত ধর্ম যে কি তা সমাজগঠনের মধ্য দিয়েই জানতে হবে মানুষকে।

ভাওনাথ ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে। ঝড় উঠেছে সমুদ্রে। আকাশের নীল চাঁদোয়া কোথায় যেন হারিয়ে গেছে—কালো

চে অন্ধকার জামা পরে আকাশটা 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কারখানার আকাশ-ছোঁওয়া চিমনি তার মুখ দিয়ে মেঘের মত ঘন কালো ধোঁয়া উড়িয়ে চলেছে অবিরত। নীল জল কালো হয়ে গেছে। একটুক্ষণ আগেও পাখিগুলো উড়ে বেড়াচ্ছিল শূন্যে শূন্যে। এখনি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে তারা। অথবা ঘূর্ণী আবর্তে পাহাড়ে বাড়ি খেয়ে ডানা ভেঙে মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। কিম্বা মরে গেছে, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। চায়ের মাটি মানুষ সব জলে একাকার হয়ে গেছে। কেউ নেই। শুধু সে একা দাঁড়িয়ে আছে সেই ঘূর্ণী আবর্তে আর সমুদ্রের অফুরন্ত জলরাশির বিরাট ঢেউয়ের মধ্যে। পরক্ষণেই সে দেখতে পায় আকাশটা আবার নীল চাঁদোয়া জড়িয়েছে গায়ে। পাখিগুলো মরেনি। অনেকেরই ডানা ভেঙেছে, ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। তবু তারা বেঁচে আছে। শক্তিও কমে নেই। চা মাটি মানুষ জেগে উঠেছে আবার। পাশেই দেখতে পায় নিরঞ্জনবাবুকে। নিরঞ্জনবাবু হাসছেন। বললেন—কি রে ভয় খেয়েছিলি ?

ঘুম ভেঙে যায়। চারপাশে তাকিয়ে দেখে—কোন কিছুরই পরিবর্তন হয়নি। ঠিক যেমনটি ছিল তেমনিই আছে সব।

স্বপ্ন অলীক, স্বপ্ন মিথ্যা। এ-কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস হয় না তার। এর মধ্যেও সত্য ও বাস্তব বলতে যা বোঝায় তার কিছুটা নিশ্চয়ই আছে। তার বিশ্বাস ঘুমন্ত অবস্থায়ও মানুষের মন কাজ করতে থাকে। মনের বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। দেহের বিরাম ও বিশ্রাম দুইই আছে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর নীরবতার মধ্যে মনের পরিক্রমা চলতে থাকে সমস্ত অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের ভেতর দিয়ে।

মুহূর্তের মধ্যে ঘুমের জড়তা আর স্বপ্নের ক্লান্তি কেটে যায় ভাওনাথের। স্বপ্ন স্বর্ণ হয়ে ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মন উতলা হয়ে ওঠে। নিরঞ্জনবাবু, সেই নিরঞ্জনবাবু। তার গুরু, তার বাবা। ভাওনাথের মনে হলো নিরঞ্জনবাবু যেন তারই সামনে দাঁড়িয়ে। সে তাঁরই সঙ্গে কথা বলছে। আপনি এসেছেন নিরঞ্জনবাবু। না, নিরঞ্জনবাবু নয়, তার বাবা, গুরু অনেক প্রশ্ন

ভর্ৎসনা এসে মনের মধ্যে ভিড় করে। ভাওনাথ মনে মনে বলে—গুরু কি শিষ্যের দূরে থাকতে পারেন। এ স্বপ্ন নয়, সত্য। সত্যই নিরঞ্জনবাবু আসবেন। আর বিলম্ব নেই।

এরমধ্যে বাবু আর সাহেবদের মধ্যে তুমুল বিরোধিতা শুরু হয়। যে দুইজন বাবুর চাকরি গেছে সাহেবরা কোম্পানীর দেওয়া বাসা ছেড়ে অন্যত্র চলে যাওয়ার নোটিশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা যান নি, বাসাও ছাড়েন নি। এতে সাহেবের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তখনও রেশন চালু আছে। তাঁরা সেই দুই পরিবারের রেশন বন্ধ করে দেন। জ্বালানী কাঠ, কেরাসিন তেল সব কিছু। এই সময়ে বাবুরা তাঁদের সমিতি থেকে সমস্ত রকম সাহায্য করেন এই দুটি পরিবারকে। এই জন্য সমস্ত বাবু গোষ্ঠীরই উপরে রাগ গিয়ে পড়ে সাহেবদের। বাগানের সাহেবেরা নির্মম ব্যবহার করতে শুরু করেন তাঁদের ওপর। বাবুরাও মরিয়া হয়ে ওঠেন। তাঁরা এর মধ্যে চাঁদার হার বাড়িয়ে বাইরের একজন রাজনীতিজ্ঞ লোককে মাইনে করে রেখেছেন তাঁদের সমিতি পরিচালনার জন্য। এবং তাঁরই পরামর্শ অনুযায়ী বাবুরা কাজ করবেন। এছাড়া তাঁরা শ্রমিক সম্প্রদায়কে তাঁদের সমিতির মধ্যে আনার জন্য বাগানের সমস্ত সর্দার, কামদারি চাপরাসিকে প্রলুব্ধ করতে থাকেন। কিন্তু বাবুদের সম্বন্ধে একটা রূঢ় ধারণা থাকায় বেশির ভাগ শ্রমিকই এ প্রস্তাবে রাজী হয় না।

এদিকে নরসিংবাহাদুরের তৎপরতা বেড়েছে। সাহেবদের সঙ্গে তাঁর কি বোঝাপড়া হয়েছে তা শ্রমিকেরা জানে না। তিনি বাগানে বাগানে ছোটাছুটি করছেন। বাবু আর কুলি যে এক নয় এই কথা বার বার করে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন শ্রমিকদের। ভাওনাথের নিজেরও ততটা মত নেই বাবুদের সমিতিতে যোগদান করার। তাঁদের মনোভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারে না সে। এই পরিবর্তন সাময়িক। দায়ে পড়ে খুড়ো কর্তা এই রকম কিছু একটা। এ নিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে অনেক আলাপ আলোচনা হয়।

তোরঙবাহাদুর বেশ বিরক্ত ভাবেই বললে—ওসব রেখে দাও।

বাবুরাও কম শোষক নয়। ওঁরাও অনেক রক্ত খেয়েছেন আমাদের। ওঁদের সঙ্গে আমাদের মিল হতে পারে না কোনদিন।

বেশির ভাগ লোকেই এইরূপ বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে। অনেকে তো খুবই খুশি হয়েছে বাবুদের দুর্দশা দেখে। মনেপ্রাণে ভগভোগ করছে। কথায় গানে ভাষায়।

ভাওনাথ বলে—এতে খুশী হওয়ার কিছু নেই। বরং নিঃসন্দেহেই বলা যায় দুঃখের। কারণ সমবেদনাই হৃদয়বত্তা। আমার মনে হয় আমাদের উচিত তাদের সাহায্য করা।

কথাটা কারো মনঃপুত হয় না। সকলেই অবাক চোখ মেলে ভাওনাথের দিকে তাকায়। চোখ মুখ বিদ্বেষ, ঘৃণা ও বিরক্তি ভরা। তাদের ধারণা ভাওনাথ বাবুদের সমিতিতে যোগদান করাটাই সমর্থন করছে। অনেকেরই ঠোঁট নড়ে উঠছে। মনে হচ্ছে কিছু বলবে নিশ্চয়। কিন্তু কথাগুলো ঠিক মত গুছিয়ে নিতে পারছে না। অথবা হয়ত অপর কেউ কিছু বলে কিনা সে-জন্য অপেক্ষা করছে।

ভাওনাথ আবার আরম্ভ করে বলতে। বলে—সাহায্য করা মানে এই নয় যে আমরা বাবুদের সমিতিভুক্ত হবো।

চকমকির মত আরো একটা বিস্ময় ঠিকরে পড়ে সকলের চোখেমুখে। সেই সঙ্গে আনন্দেরও রেখাপাত হয়। আনন্দ, বিস্ময় ও ভাবনা এই তিনের মিশ্রণে কেমন একটা নতুন অনুভূতি জাগে।

ভাওনাথ তার কথার ছেদ না টানতেই অম্বরবাহাদুর বললে—তোমার হেঁয়ালির মত কথার কোনই অর্থ বুঝতে পারছি নে। সাহায্য মানে যোগদান ছাড়া আর কি হতে পারে?

ভাওনাথ বললে—সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নই মূলে এক। প্রত্যেকের উদ্দেশ্যও এক। তবে রাস্তা ভিন্ন। কিন্তু পারস্পারিক একটা সম্বন্ধ আছে। তাই শত মতভেদ থাকলেও তাদের যে কোন [illegible] আমাদের সহানুভূতি থাকা দরকার। ঐ সঙ্গে [illegible] জানতে হবে। কারণ তাদের সমস্যা মূলত আমাদেরও। তারা চায় সা[illegible]জ্যবাদ ধ্বংস করে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে। আমরাও

তাই। এখানে আমরা এক। অন্য সময়ে আমরা অ'বাদের মত, তারা তাদের মত।

শেষ পর্যন্ত সকলেই ভাওনাথের কথাই মেনে নেয়।

কখন থেকে যে তিল তিল করে রাতের স্তব্ধ বুকে দিনের আলো ফুটে উঠছে সে-কথা ভাওনাথ জানে না। রাত যেন প্রজাপতির মত একটা নতুন জন্ম দিয়ে মরে গেছে। দিনের আলো ঝলমল করছে। আলিপুরদুয়ারের কোর্ট-প্রাঙ্গনের অল্প দূরে বিস্তৃত মাঠে বিরাট এক প্যাণ্ডেলের বুকে থই থই করছে লোক। প্যাণ্ডেলের চারিপাশে পুলিশ অফিসার, ইনস্পেক্টর, দারোগা সেপাই পায়চারি করছে। মিটিং হচ্ছে। কলকাতা থেকে সভাপতি এসেছেন। প্যাণ্ডেলের মধ্যে ঘাসের গালিচায় বসে এক দৃষ্টে সভাপতির দিকে চেয়ে তাঁর ভাষণ শুনছে। কী ক্ষুরধার বক্তৃতা! মনে হয় সব কিছু যেন কেটে টুকরো টুকরো চলছে। মাঝে মাঝে চোখ দুটো শিকারী বাঘের মত জ্বলে উঠছে। উত্তেজিত হয়ে উঠছে বাবুরা। তাঁদের চেহারার পরিবর্তন হয়ে গেছে—চেনা যাচ্ছে না।

ভাওনাথ তন্ময় হয়ে সভাপতির ভাষণ শুনছিল। সমিতির পক্ষ থেকে তাকে আসতে হয়েছে এই মিটিংএ। তার জানা থাকা প্রয়োজন বাবুদের এই সভাতে কি হচ্ছে, কি ঘটছে—কেউ শ্রমিকদের সম্বন্ধে কোন কিছু বলছে কিনা। অম্বরবাহাদুর, তোরঙ্গ-বাহাদুর, করুণসিং ও মদনফুলও তার সঙ্গে আছে।

তোরঙ্গবাহাদুর আস্তে করে ভাওনাথকে বললে—না, আমাদের সম্বন্ধে কোন কিছু খারাপ কথা বলেনি কেউ।

ভাওনাথ তার কথার কোন জবাব দেয়নি। তোরঙ্গবাহাদুরের কথাগুলোও হয়ত ভাল ভাবে শুনতে পায়নি। সে তখন ভাবছিল—সভাপতির একটা কথা। সেই কথাটাই অনেকক্ষণ ধরে ঘুরপাক খাচ্ছে তার মনে। সভাপতি বলেছেন—শ্রমিক আর তোমরা এক। তোমরাও শ্রমিক একথা যেন ভুলে না যাও। আগের সব কথা ভুলে গিয়ে শ্রমিকদের হাতে হাত মিলাতে হবে

তোমাদের। প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে। কথাটা খুব ভাল লেগেছে ভাওনাথের। তবু সংশয় ও দ্বন্দ্ব রয়ে গেছে। তবে কি এটা রাজনৈতিক চাল। না অন্য আর কিছু ঐরকম একটা।

অনেকক্ষণ ধরে এই চিন্তা, সংশয় ও দ্বন্দ্বের মধ্যে ডুবে থাকার জন্য অন্য কোন বিষয় ভাবতে পারেনি ভাওনাথ। এরমধ্যে সভা ভেঙে গেছে। অম্বরবাহাদুর বললে—চলো, এবারে যাই।

হঠাৎ ভাওনাথের খেয়াল হয় সভাপতির সঙ্গে একটু আলাপ আলোচনা করার। সে তার ইচ্ছা প্রকাশ করে সকলের কাছে।

সকলেই তার কথা উড়িয়ে দেয়। বলে—তুমি ক্ষেপেছ? কি দরকার আমাদের ওঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় করার?

ইতিমধ্যে অম্বরবাহাদুর বললে—আচ্ছা, ভাওনাথ তুমি তো নিরঞ্জনবাবুকে দেখেছ। ইনি নিরঞ্জনবাবু নন তো? আমার সন্দেহ হয়।

অম্বরবাহাদুরের কথায় চমকে ওঠে ভাওনাথ। এঁ্যা নিরঞ্জন-বাবু। হ্যাঁ, গলার স্বরটা যেন তাঁরই মত। কপালে সেই ছোটবেলায় খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে কাটা দাগটাও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে। বয়স হওয়ায় কপালে রেখার ভাঁজ পড়ায় দাগটা প্রায় ডুবে গেছে। চেহারাটা একটু ভাল করে স্মরণ করে ভাওনাথ। হ্যাঁ নিরঞ্জনবাবুই। সেই গোলগাল ফরসা মুখ, ঘন কোঁকড়া চুল টানাটানা চোখ। রঙটা যেন একটু ময়লা হয়েছে।

ভাওনাথ প্যাণ্ডেলের দিকে ফিরে তাকায়। সভাপতির আসন খালি। লোকগুলো হৈ হল্লা করে বেরিয়ে আসছে বাইরে। দৃষ্টি দূরের দিকে তাই নিকটের কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ভাওনাথ। লোক ঠেলাঠেলি করে বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'চারটে ধাক্কা তার গায়ে লেগেছে কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করেনি সে। হঠাৎ কে যেন তার বাঁ হাতটা ধরে জোরে একটা ধাক্কা দেয়। ভাওনাথ চমকে উঠে লোকটার দিকে তাকায়। নিতান্ত অভদ্র বলে মনে করে তাকে। জানা নেই চেনা নেই অথচ হাত ধরে অমনি একটা ঝাঁকুনি দেওয়ার কি মানে হয়।

লোকটা হেসে বললে—কি দেখছিস? চিনতে পারছিল না আমাকে।

ভাওনাথ এবারে নিরঞ্জনবাবুর পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করে।

নিরঞ্জনবাবু অম্বরবাহাদুরের দিকে চেয়ে বললে—সর্দার না।

অম্বরবাহাদুর হাত দুটো জোড় করে প্রণাম করে। হেসে বললে—চিনতে পেরেছেন? আমি তো আগেই চিনেছিলাম একরকম।

ভাওনাথ তাঁকে তোরঙবাহাদুর, করুণসিং ও মদনকুলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

নিরঞ্জনবাবু বললেন—কাল সন্ধেয় তোর ওখানে যাব ভাওনাথ। তোর স্কুলটা দেখে আসবো। এখন খুব ব্যস্ত আছি। বাবুদের দেখিয়ে বললেন—এ দের সঙ্গে দু'চারটে জরুরী কথা বলতে হবে। কাল সব কথা হবে।

ভাওনাথের মনে আনন্দ ধরে না। গায়ে অসীম ক্ষমতা অনুভব করে। দেহের সমস্ত বলিরেখাগুলো ফুলে উঠেছে আবার। বিলাসীকে সব খুলে বলে। বিলাসীও খুশী হয়েছে খুব।

একটুক্ষণ নীরবতার আনন্দ উপভোগ করে বললে—তোকে তো আগেই বলেছি তোর ভয় নেই। জিতবাহন, করম গোঁসাই তোর সহায়।

পরদিন নিরঞ্জনবাবু আসেন। স্কুল দেখে খুব সন্তুষ্ট হন।

ভাওনাথ সমস্ত বাগানের প্রতিনিধিদের খবর দিয়েছিল। সকলেই এসেছে। নিরঞ্জনবাবুর আচার ব্যবহার কথাবার্তায় সকলেই খুব খুশী হয়। মদনকুল এক কাপ চা তৈরি করে আনে। করুণসিং বাজার থেকে কিছু মিষ্টি ও বিস্কুট নিয়ে আসে। নিরঞ্জনবাবু কোন রকম আপত্তি না করে পান করেন।

সকলেরই খুব ভাল লাগে। তাদের জীবনে এই প্রথম দেখতে পায় যে একজন বাবু কুলির বাড়িতে চা পান করছে। এ যেন স্বপ্নের মত অবিশ্বাস্য। জীবনটাকে অন্য ভাবে দেখতে পায়। অন্য আর এক স্বাদ।

এরপর ভাওনাথের সঙ্গে নিরঞ্জনবাবুর অনেক কথা হয়। তিনি বললেন এখানে কেমন করে এলাম জানতে চাস তুই। আজ তিন বছরের বেশি হয় চাকরি ছেড়ে দিয়ে রেলওয়ে ফেডারেসনে যোগ দেই। আমিই সাধারণ সম্পাদক। অনেক ঝড়ঝাপটা সহ্য করে রেলওয়ে কর্মচারিদের মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছি। সেই সমস্ত ব্যাপার খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। তাই দেখে এখানকার বাবুদের সমিতি থেকে প্রতিনিধি যান আমার কাছে। অনুরোধ করেন—এ দের সমিতির ভার নিতে। চা বাগানের লোকের ওপর আমার একটা প্রীতি আছে। চা বাগানে থাকাকালীন এঁদের দুর্দশা দেখেছি নিজে চোখে। নিজেও খুব ভোগ করেছি এর। এ-সবই তো জানা আছে তোর। তাই এরা অনুরোধ করতেই রাজী হয়ে যাই। পিছু টানও তো তেমন একটা কিছু নেই। ছেলেটা বড় হয়েছে। বিয়ে করেছে। একটা চাকরিও করে। আর আমার স্ত্রী সেও রেলওয়ে ফেডারেসনে যোগ দিয়েছিল আমার সঙ্গে। আমি সম্পাদকের পদ ছেড়ে দেওয়ার পরে সেই সে কাজ করছে। আমিও আছি তবে উপদেষ্টা হিসাবে।

ভাওনাথ মুখটা শুক্‌নো করে বললে—আমাদেরও তো একজন লোকের দরকার। আর আমার বিদ্যা বুদ্ধিই বা কতটুকু কিসে যে কি করবো ভেবে কুল পাইনে।

ভাওনাথের কথা শেষ না হতেই নিরঞ্জনবাবু বলে ওঠেন—বাইরের লোকের কী দরকার। আমি বলছি, তুইই চালাতে পারবি তোদের সমিতির কাজ। ভয় কি? যখন যেটায় ঠেকবি আমি তো আছিই।

ভাওনাথ এবারে হাসতে হাসতে সরাসরি বললে—তাহলে আপনি রেলওয়ে ফেডারেসনের মত উপদেষ্টা হয়ে থাকুন না আমাদের সমিতিতে। কষ্ট তো অনেক করছেন, আমাদের জন্য না হয় আর একটু করুন।

আট

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে মানুষ যেন আরো নির্মম, কঠিন হয়েছে। প্রকৃতির স্বরূপকে অস্বীকার করে নিজের সৃষ্টির উপর আস্থাবান হয়ে উঠেছে। পৃথিবীর যা কিছু মহৎ, সুন্দর ও প্রিয় সব কিছুকেই ধ্বংস করে দেওয়ার একটা প্রয়াস চলছে। এই প্রচেষ্টার একটা শুভ দিক আছে। মানুষ আপন আপন শক্তির ওপর বিশ্বাসী হয়েছে। জীবনের ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখেছে। জানতে পেরেছে জীবন কখনও এক ছাঁচে তৈরি নয়। প্রতিটি জীবনেরই বিশিষ্ট স্বতন্ত্র রূপ আছে। মানুষ আত্মনির্ভরশীল হয়ে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজ করলে দেশের ও সমাজের মঙ্গল হবে। মানুষ বুঝতে পেরেছে তার দায়িত্ব। নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকলে কিছুই হবে না।

এই সঙ্গে প্রকৃতিও কঠিন হয়ে উঠছে দিন দিন। নির্মমতা বেড়েছে। এই নির্মমতার মধ্যেও হৃদয়তা আছে, কল্যাণ আছে। একটু ধ্বংস বা নির্মমতা অথচ কল্যাণ অনেকখানি। বর্ষার জলে ধুয়ে গেল, ভেঙে গেল ছোট একটা অংশ—কিন্তু তার পরিবর্তে শস্য-শ্যামলা হয়ে উঠলো অপর একটা বিশাল বিস্তৃত ভূখণ্ড।

এরমধ্যে জীবনযাত্রা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। চারিদিকে শুধু হাহাকার, হায় হায়। মানুষের পেটের চাহিদার চেয়ে আয় অনেক কম। সর্বত্র শ্রমিক ও কর্মচারিমহল মরিয়া হয়ে উঠেছে। বেতন বাড়ানোর জন্য লড়াই চলছে সরকার ও মালিকদের সঙ্গে। ছোট বড় অনেক নতুন নতুন সংস্থা সংগঠিত হয়েছে। কাজকর্ম সুশৃঙ্খলভাবে চলছে না কোথাও।

ইতিমধ্যে বাগানে বাগানে মজুরদের জন্য প্রতি বছর দু'চারটে করে পাকা ঘর তৈরি করছেন সরকার। ঘরগুলো দেওয়া হচ্ছে সর্দার, মুন্সী, চাপরাসী কামদারীকে। [illegible] সব সময়ই

বলেন—তোমাদের সব কিছু হবে, সব পাবে। এই তো তোমাদের জন্য পাকা ঘর তৈরি হচ্ছে। এরপর অন্য অন্য অভাব অভিযোগের দিকে নজর দেওয়া হবে। কথাটা শুনে সত্যি হাসি পায়। কারণ যে পরিমাণ ঘর তৈরি হচ্ছে প্রতি বছর এতে সমস্ত বাগানটা সম্পূর্ণ করতে কত যুগ লাগবে তা বোধ হয় হিসাব করে দেখবার সময় পাননি কোম্পানী। এক একটা বাগানে কমপক্ষে ছ'সাত শো থেকে আড়াই হাজার তিন হাজার বাড়িঘর। প্রতি বছর পাঁচ থেকে দশটা করে ঘর তৈরি হলে কত যুগ কত পুরুষ লাগবে তা সহজেই বোঝা হয়। এর উত্তরে কর্তারা বুঝিয়ে দেন যে সিমেণ্ট, টিন, য়্যাসবেষ্টাসের অভাবে বেশি ঘর তৈরি করতে পারছি না। এই আসছে দুই এক বছরের মধ্যেই কণ্টোল উঠে গেলে একসঙ্গে অনেকগুলো করে করা হবে।

এই সমস্ত বিষয় নিয়ে ভাওনাথের সঙ্গে কথা হয় বাগানের ম্যানেজারদের। ম্যানেজারেরা বলেন—তোমরা শুধু শুধু এ-কি সব গোলমালের সৃষ্টি করছ? তোমাদের জন্য তো কোম্পানী সব কিছুই করতে সঙ্কল্প করেছেন। জানোই তো যুদ্ধের পর থেকে সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় ঘটেছে। তাই ব্যাপকভাবে সব কাজগুলো একসঙ্গে হাতে নেওয়া সম্ভবপর নয়। সব হবে, একটা একটা করে সব হবে।

ভাওনাথ বললে—পেটে খিদে লাগলে পেট ডাকবেই। সে কারো অপেক্ষা রাখে না। যদি সবগুলো একসঙ্গে না হয় তাহলে ঘর তৈরির কাজ না করে মজুরদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়াই তো ভাল। আর আমরা সেইটেই চাই। কারণ ঘর বা শোওয়া আরামের কিন্তু টাকা দরকার বেঁচে থাকার জন্যে। বেঁচে না থাকলে—আরাম কোথায়? আর এ-ছাড়া আরামেরই বা তেমন কি—আর ক'জনের জন্যে? এতো অসংখ্য চড়ুই কাকের মুখে একদানা চাল বা সরষে ছুঁড়ে ফেলা।

কথাগুলো একটু রূঢ় শোনায় ভাওনাথের মুখে। কথাগুলো ঠিক হলেও উপমা, ভাষা আর বলার ঢং বিশ্রী লাগে সাহেবদের কাছে। কিন্তু সময় ও কালের গতি কেউ রোধ করতে পারে

না। তাই অসহায় একটা ম্লান হাসি হেসে কথাগুলোকে সরল ও সহজভাবে নিতে চেষ্টা করেন।

সাহেবেরা বললেন—তোমরা তো সকলেই জান, যুদ্ধের পর চায়ের বাজারে কি রকম একটা ফাটল ধরেছে। সমস্ত কোম্পানীই তো দেনায় ডুবু ডুবু। লাভ হোক বা না হোক প্রতি বছরই ব্যাঙ্ককে সর্ত অনুযায়ী টাকা দিতে হয়। গভর্ণমেণ্টের কাছে ধার চেয়েছিল সকলে কিন্তু এক পয়সা দেয়নি তারা। এই অবস্থায় বাগান পরিচালক মণ্ডলীই বা কি করতে পারেন আর?

ভাওনাথ এবারে সত্যিই একটু রুক্ষ হয়ে ওঠে। বলে—এতদিন অনেক পেয়েছেন তার কতকটা দিলেই দুদিন কেটে যাবে। লোকসানের কথা বলছেন—লোকসান হচ্ছে কোথায়? এতো একটা মনগড়া কথার জিগির তুলে মজুরকে ভয় দেখানো। গভর্ণমেণ্টে যে ইনকোয়ারী বোর্ড বসিয়েছিলেন তাঁরা তো বাগানের সমস্ত হিসাবপত্তর পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন—লোকসান হচ্ছে না তবে লাভের অংশ কম। আর তাঁরা এ-কথাও বলেছেন যে বাগানের খরচপত্র দেখে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে বাগানের পরিচালক মণ্ডলীর অমিতব্যয়িতা এরজন্য অনেকখানি দায়ী।

সাহেবেরা বিরক্ত ও উদ্ধত স্বরেই বলে ওঠেন—দূরে দাঁড়িয়ে অনেক কিছুই বলা যায়—দূরের পাতলা ঘাসও ঘন দেখায় কিন্তু কাছে এসে ক্ষেত্রে দাঁড়ালেই তার আসল রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আজেবাজে কাগজে অঙ্ক কষা যত সহজ পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ঠিকঠিক উত্তর লেখা ততটা সহজ নয়। তাঁরা কি ঠিকমত হিসাব করে দেখেছেন যে শ্রমিকদের রেশন সাপ্লাইএ কত টাকা লোকসান দিতে হয়? এ-ধারণা তাঁদের নিশ্চয়ই নেই।

ভাওনাথ একটা তির্যক হাসি হেসে বললে—আপনারা কি বলতে চান যে রেশন সাপ্লাইএ আপনারা কোন অপব্যয় করেন না?

সকলেই এক সঙ্গে বলে ওঠেন—কি করে অপব্যয় হয়?

কি করে হয় সে কথা আপনারা ভাল করেই জানেন। আপনারাই জানেন কোথাকার জল কোথায় যায়, বললে ভাওনাথ।

একজন সাহেব বলে ওঠে—তোমার এ-সব হেঁয়ালীর অর্থ কি?

ভাওনাথ সাহেবটিকে চেনে না। একবার ভাল করে এক নজর দেখে নিল তাঁকে। লোকটা অসম্ভব মোটা। গলায় লম্বা নেকটাইটার শেষপ্রান্ত মোটা পেটের ওপর উঁচু হয়ে আছে। বড় বিশ্রী দেখাচ্ছে। ভাওনাথ একটু হাসলো। মনে করলো—জবাব দেবে। বলবে—তোমার ওই মোটা পেটের মধ্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করে শান্ত গলায় বললে—এক জায়গা ভাঙে আর অন্য জায়গা গড়ে। কথাটি ঠিক যে কোম্পানীর ভাঙন লেগেছে কিন্তু সেই পলিমাটিতেই গড়ে উঠছে আরো অনেক জন।

বেশির ভাগ সাহেবরই মুখ চোখ শুকিয়ে যায়। ভাওনাথের কথার অর্থ এবারে স্পষ্ট করে বুঝতে পারেন।

অনেকে আপত্তি উত্থাপন করেন। চটে ওঠেন ভাওনাথের ওপর। কিন্তু ভাওনাথ নির্ভীক-ভাবেই বললে—আপনারা চটতে পারেন কিন্তু আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি যে একমাত্র চাল, আটা ছাড়া আর যে সমস্ত জিনিস যেমন ছাতা, ডাল এ-সমস্ত জিনিসেই আপনারা ঠীকাদারকে বেশি দাম দিচ্ছেন। আমি বাজার যাচাই করে দেখেছি, যে ডালের দাম পঁচিশ টাকা মণ আপনারা ঠিক সেই ডাল কিনছেন সাতাশ আটাশ টাকা করে। কেন, কি জন্য, এতে কি কোম্পানীর লোকসান হয় না? একবার হিসাব করে দেখুন তো বছরে কত মণ ডাল কেনেন—মণ পিছু তিন টাকা বেশি দিলে কত টাকা অপব্যয় হয়?

হঠাৎ ভাওনাথের আবার মনে পড়ে শ্রমিকদের ঘরের কথা। আর এই শ্রমিকদের ঘর তৈরির ব্যাপারে-ও অনেকটা তাই। ঘর তৈরির সমস্ত মালমসল্লাই অত্যন্ত চড়া দরে কেনা হয় তারপর ঠীকাদারের রেটও খুব বেশি। আর এই যে পাকা ঘরের প্রশ্ন তুলে সমস্ত গলদটা চাপা দিতে যাচ্ছেন তা কি ঠিক? এই ঘর তৈরিতে মূলত কোম্পানীর কোন ক্ষয়ক্ষতি নেই। এতো কোম্পানীর ক্যাপিটাল ইনভেষ্টমেণ্ট। কোম্পানীর ঘর কোম্পানীরই থেকে যাবে—যাওয়ার সময় কেউ সঙ্গে নিয়ে যাবে না বা বিক্রি করে দিতে পারবে না।

সাহেবদের মধ্যে অনেকেই খড়্গহস্ত হয়ে ওঠেন। চারদিক

থেকে কয়েকজন সাহেব প্রায় একসঙ্গেই চিৎকার করে বলেন—তাহলে তুমি কি বলতে চাও আমরা চুরি করি।

ভাওনাথ বললে—আমার মনে হয় অপব্যয় অর্থে চুরি বোঝায় না। অপব্যয় অর্থে মোটামুটি আমি বুঝি উপযুক্ত তদারকের অভাবে যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তাই অপব্যয়।

সকলেই বুঝতে পারে ভাওনাথ কথাটার মোড় অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিয়েছে। মনের আগুন মনেই থাকলো তবে মুখের আগুন অনেকটা নিবু নিবু হয়ে একটু আধটু হাসি ফুটে বেরোয়।

জ্ঞাননগর বাগানের বড়সাহেব কিঙসৃলি বললেন—আমার বিশ্বাস আমরা যে চড়া দামে জিনিসপত্তর কিনি তা শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্যই। তারা ভাল জিনিস পায়। আর যখন যে জিনিস কেনা হয় তখন তা পরিমাণে বেশি কেনা হয়। কারণ মালটা গুদোমজাত করে রাখতে হয় বেশ কিছু দিনের জন্য। খারাপ মাল কিনলে তা হয়ত অল্প কিছু দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া বেশি করে না কিনেও উপায় নেই শেষে হয়ত দরকার মত বাজারে পাওয়াই যাবে না।

ভাওনাথের ইচ্ছা নয়—ব্যাপারটা আরো ঘোলা বা গাঢ় করে। হয়ত অসংখ্য দুঃখ বেদনায় বুক ফেটে অনেক কিছু মালিন্য বের হতে পারে শেষ পর্যন্ত তাই এ-সব কথা চাপা দিয়ে আগের কথাতে ফিরে আসতে চায়। সে বললে—এ সমস্ত আমাদের দেখার দরকার করে না তবে নিজেদের অভাব অভিযোগের জন্যই নজরে পড়ে, মনে আসে। আবার মন থেকে কখন কখন গরল হয়ে বেরিয়ে আসে তা। আমাদের মাইনে বাড়লে এবং উপযুক্ত খাবার পেলে এর কোন কিছুই আমাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। আমাদের তলব বাড়িয়ে দিলেই আমরা খুশী।

ভাওনাথের কথা শুনে সকলেই নিরাশ হন। ইতিমধ্যে অনেকেই বাইরে গিয়ে খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে গুজগুজ করতে থাকেন। যাঁরা আছেন তাঁরা সকলেই কিঙসৃলির মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

কিঙসৃলি ডুয়ার্স প্লাণ্টার্স এসোসিয়েনের এই ডিষ্ট্রিক্টের চেয়ারম্যান। তিনি বললেন—ঠিক আছে। আমাদের মতামতে

তো কোন কিছুই হবে না। আমি তোমাদের ব্যাপারটা ডি, পি, এর চেয়ারম্যানের থ্রু দিয়ে আই, টি, এর চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি।

এর কিছুদিন বাদেই দেখা গেল যে সাহেব ও বাবুদের মাইনে ও মাগ্‌গিভাতা বেড়েছে। একটা 'পে স্কেল'ও হয়েছে। যে দুইজন বাবুর চাকরি গিয়েছিল আবার কাজে বহাল হয়েছেন তাঁরা। নিরঞ্জনবাবু চেষ্টা করেছিলেন তাঁদের সেই বাগানেই রাখতে কিন্তু পারেন নি। কোম্পানী তাঁদের আসামে বদলি করেন। আইনত আর কোন আপত্তি করতে না পেরে সে-কথাও তিনি বাবুদের বুঝিয়ে দেন।

নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে দেখা হয় ভাওনাথের। ভাওনাথ সাহেবদের সঙ্গে যে কথা কাটাকাটি হয়েছে তা সমস্ত খুলে বলে তাঁকে।

নিরঞ্জনবাবু খুশী খুশী মুখে বললেন—ঠিকই বলেছিস তুই। তবে আমার বিশ্বাস বাবুদের কেস যত সহজে মিটেছে তোমাদের কেস তত সহজে মিটবে না।

ভাওনাথ বললে—তার কারণ?

—তার কারণ অন্য কিছুই নয়। বাবুদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের মাইনে বাড়াতে কোম্পানীর আর তেমন কি খরচ বাড়লো। এ মাত্র চার পাঁচ হাজার টাকার প্রশ্ন কিন্তু শ্রমিদের বাড়লে সেটা আর চার অঙ্কে থাকবে না অন্ততপক্ষে ছয় সাত অঙ্কে গিয়ে দাঁড়াবে, বললেন নিরঞ্জনবাবু। আমি দু'একদিনের মধ্যেই কলকাতায় গিয়ে আই, টি, এর চেয়ারম্যানের সঙ্গে কথাবার্তা বলবো। মনে হয় ব্যাপক আন্দোলন ছাড়া তোমাদের বিষয়ের সমাধান হবে না।

এদিকে সাহেব বাবুদের মাইনে বেড়েছে জানতে পেরে শ্রমিকদল উগ্র হয়ে ওঠে। বলে—সাহেব বাবুদের পেট আছে, কুলিদের বুঝি পেট নেই।

ভাওনাথ বলে—দেখ না আর কিছুদিন।

—আর কতকাল দেখবে? দেখতে দেখতেই তো জীবন ফুরিয়ে এলো।

নিরঞ্জনবাবু কলকাতায় গিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে শ্রমিকদের বিষয় আলোচনা করেছেন সে-খবর ভাওনাথ তাঁর চিঠিতে জানতে পেরেছে। আলোচনা যে বিশেষ সন্তোষজনক তা মনে হয় না ভাওনাথের। চেয়ারম্যান নাকি বলেছেন—ওসব অনেক পরের কথা। এখন তাঁরা ব্যস্ত আছেন টি কণ্ট্রোল বোর্ড নিয়ে। চা ব্যবসায় দুর্দিন পড়েছে অথচ দিনের পর দিন 'একস্‌পোর্ট ডিউটি' বেড়ে যাচ্ছে। সরকার এই ডিউটি না কমালে বাণিজ্যের যে কী অবস্থা হবে তা ধারণা করা যায় না। সরকারের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেলে শ্রমিকদের বিষয় নিশ্চয়ই বিবেচনা করা হবে। নিরঞ্জনবাবুর দৃঢ় ধারণা কোম্পানীকে জোর চাপ না দিলে শ্রমিকদের মাহিনা বাড়ার কোনই আশা নেই।

এই সংবাদে বাগানের সমস্ত শ্রমিকের রক্তে আগুন জ্বলে ওঠে। তারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে, আন্দোলন শুরু করার জন্য ভাওনাথকে অনুরোধ জানায়।

ভাওনাথ তেমন গা দেয় না তাদের কথায়। তার বিশ্বাস ব্যাপক আন্দোলন শুরু করবার মত দিন তাদের আসেনি এখনও। সমিতির ছোট খাটো অনেক গলদ আছে। তার ওপর সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে সমিতির ফাণ্ডে এমন কিছু টাকা মজুত নেই যা দিয়ে ধর্মঘট চালানো সম্ভব।

অনেকে বলে—ধর্মঘট করলে নিশ্চয়ই কোম্পানী একটা ব্যবস্থা করবেন। কারণ তাঁরা ভালভাবেই জানেন যে কী পরিমাণ লোকসান হতে পারে তাঁদের। এই ক্ষতি তাঁরা কিছুতেই সহ্য করতে পারবেন না।

ভাওনাথ বললে—তাঁদের দেহে যে পরিমাণ রক্ত তা থেকে দু'চার ফোঁটা রক্ত বেরিয়ে যায় তাতেও তাঁদের দেহ সুস্থ ও সবল থাকবে কিন্তু আমাদের মত রক্তহীন দেহ থেকে যদি ক্ষুদ্র একটা বিন্দু রক্ত ঝরে যায় তাহলে আর আমাদের অস্তিত্ব থাকবে না।

মদনকুল, করুণসিং, ভোরজবাহাদুর, মঙ্গলে, অম্বরবাহাদুর আরো অনেকে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। মদনকুল বললে—মরেও যা থাকবে তার সংখ্যা ওঁদের চেয়ে ঢের—ঢের বেশি। আর

মরে যদি সাবাড় হয়ে যাই তাতেই বা ক্ষতি কি? আমরা কি বেঁচে আছি? ওঁরাও মরবে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ওঁদের এই বাণিজ্য।

বেশির ভাগ লোকই মদনকুলকে সমর্থন করে চেঁচিয়ে বলে—ঠিকই বলেছে মদনকুল।

করুণসিং উপাধ্যায় ব্রাহ্মণের ছেলে। তার মন থেকে এখনো ধর্মের কথা মুছে যায়নি। সে বললে—আমরা লড়াই করবো অত্যাচারীর বিরুদ্ধে, ন্যায়ের জন্য। এখনও ভগবান আছেন।

মঙ্গলে বেশ চড়া গলায় বিরক্তির স্বরে বলে ওঠে—রেখে দাও তোমার ভগবান। আজকাল কি আবার ভগবান আছেন। আজকালকার ভগবান হচ্ছেন রাষ্ট্র সরকার আর মালিক বা ধনীসম্প্রদায়। এই ভগবানের নলচে-খোল ভেঙে চুরমার করে দিয়ে সেখানে নতুন নলচে-খোল বসাতে হবে।

বিলাসী বললে—ভগবান ছিলেন, আছেন এবং চিরদিনই থাকবেন। সৃষ্টির গোঁড়ায় শব্দই ছিল ভগবান। এই শব্দ আসে হৃদয়ের গভীর তলদেশ থেকে। এই শব্দই ভগবানের বাণী বা নির্দেশ। এই শব্দকে মেনে নিলেই ভগবানকে মেনে নেওয়া হয়। তাই আমার মনে হয় আমাদের মন থেকে যে শব্দ আসছে তার নির্দেশ অনুসারেই কাজে অগ্রসর হওয়া উচিত। তা না হলে হয়ত শব্দটা থেমে যাবে।

বিলাসীর কথা শেষ না হতেই ভাওনাথ বলে ওঠে—তোমাদের কারো কথা আমি খণ্ডন করতে চাই নে। কারণ তোমাদের প্রত্যেকের কথাই ঠিক এবং চিন্তার। আন্দোলন আমাদের চালিয়ে যেতে হবে। তবে ব্যাপক আন্দোলনের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। ওই যে বিলাসীমাই বললে শব্দের কথা। সত্যিই, শব্দটাকে জিইয়ে রাখতে হবে আমাদের। তাই আমি বলছি—প্রতিদিন ভোরে কাজে যাওয়ার আগে আর সন্ধেয় কাজ থেকে ফিরে এসে অফিস, গুদোম ও বাগানের বড় বড় সড়ক দিয়ে কিছুক্ষণের জন্য জিগির গেয়ে চলতে হবে—মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। আমাদের দাবী মানতে হবে। অত্যাচার সইবো না।

এর কয়েক মাস পরে যখন বাগানে জোর পাতি আসবে তখন আমরা শুরু করবো আমাদের ব্যাপক ধর্মঘট। এই সময়ের মধ্যে আমরা অনেকটা প্রস্তুত হয়ে নিতে পারবো। আর এখন শুরু করলে কোম্পানীর তেমন কিছু মারাত্মক লোকসান হবে না। এখন তো পাতি নেই, শুধু বাগানের ফাড়ুয়া করা, খুলনি করা। এই ফাড়ুয়া বা খুলনি না করলে বড় একটা লোকসানের প্রশ্নই ওঠে না। এ-ছাড়া এর মধ্যে নিরঞ্জনবাবুও খড়্গাপুর থেকে নিরাময় হয়ে ফিরে আসবেন। তিনি এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। বুড়ো হাড়ে আর কত সইবে বল! ক'মাস ধরে কী কঠোর পরিশ্রমই না করেছেন। অসুখ না হয়ে যায় কোথায়?

সকলের সব কথাগুলোই ঘরময় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। লোকগুলো উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বিলাসী ও ভাওনাথের কথাই ন্যায়সঙ্গত বলে মেনে নেয়। জিগির গেয়ে মনের শব্দকে জিইয়ে রাখতে হবে। সকলেই বলে ওঠে—আর দেরী করা চলবে না। আজ ভোর থেকেই শুরু করতে হবে। লাইনে লাইনে গিয়ে সবাইকে প্রস্তুত থাকতে বলবে।

ভাওনাথ মনে মনে খুব খুশী হয়। তার মনে হয় তখনই যেন তারা বেরিয়ে পড়ছে লাইনে। একটা অব্যক্ত আবেগে তাদের কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। এতদিন পরে যেন মনের কথা পেয়েছে। লুকোনো কথাগুলো বারে বারে উচ্চারণ করছে। একটা আকারহীন আনন্দ ও কামনায় মনটা ভরে উঠছে। আগুন জ্বলছে। সমস্ত অন্যায় অসত্য পুড়ছে। ন্যায় ও সত্যের জন্ম হচ্ছে।

ভাওনাথের মনে হয় সমস্ত লাইন উজাড় করে শ্রমিকের দল এসে বড় সড়কে ভিড় করেছে। লোকগুলো অঙ্গভঙ্গি করছে। হাত নাড়ছে, কথার চাবুক মারছে। সমস্ত বাগান কাঁপছে। পাহাড় নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে আছে। আকাশ থেকে তারার আলো ঝরছে। তারা এগিয়ে যায় গুদোম, অফিস ও সাহেবদের বাংলোর দিকে। একটা পরিবর্তন তারা নিশ্চয়ই আনবে।

সাহেব মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। প্রতিদিনই ক্লাবে মিটিং বসছে, আলোচনা হচ্ছে। প্রায়ই পুলিশ এসে বাগানে বাগানে

টহল দেয়। পাদরীর যাতায়াত বেড়েছে। ধর্মের দোহাই পেয়ে খৃষ্টান কুলিদের মনে ভীতির-সঞ্চার করছে।

নরসিংবাহাদুরও প্রায়ই মিটিং করছেন বাগানে। তাদের মিটিং বাগানের জমিতেই হচ্ছে। সাহেবেরা কোন বাধা দিচ্ছেন না। এই মিটিংএ পুলিশ পাহারাও থাকছে না। নরসিংবাহাদুর তাদের সামনে ধর্মঘট বা বিদ্রোহিতার খারাপ, অন্ধকার দিকগুলো ধরে বলেন—ধর্মঘট বা বিদ্রোহিতার সাহায্যে তোমাদের কোনই লাভ হবে না বরং এতে তোমাদের নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা শিথিল হবে। তোমরা ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। মরবে না অথচ মরণের চেয়ে অনেক যন্ত্রণা ভোগ করবে। হাতের এক টুকরো কাগজ আর কলম দেখিয়ে বলেন—এই কাগজ কলমে কি না হয়? সমস্ত পৃথিবীর যত বড় বড় কাজ চলছে শুধু এই কাগজ কলমের মাধ্যমে। রাজ্য চলছে, রাজনীতি চলছে। আমাদেরও এই কাগজ কলমের সাহায্য নিয়ে চলতে হবে। এতেই শান্তির ভিত তৈরি হবে, মানুষ ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু জোরজবরদস্তিতে বিরোধিতা বাড়বে, ঐক্যের বাঁধন ছিঁড়ে আত্মঘাতী হবে।

ইতিমধ্যে যে সমস্ত খৃষ্টান কুলি সমিতিতে যোগ দেওয়ার জন্য মনস্থির করেছিল তারা পাদরীর কথাতে অনেকখানি পিছিয়ে যায়।

ভাওনাথ যুক্তি তর্ক দিয়ে সবাইকে বোঝাতে চেষ্টা করে। সে জিগ্যেস করে—সাহেবই বলো আর পাদরী বলো এরা কি তোমাদের আপন জন? আমার বিশ্বাস তা নয়, বরং এই শ্রমিক সম্প্রদায়ই তোমাদের নিজের মানুষ। সাহেব কি পাদরী যদি তোমাদের নিজেদের মানুষ হবেন, একই চোখ দিয়ে দেখবেন তাহলে কেন তাঁরা তোমাদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন না, কেনই বা তোমাদের বাড়িতে আসবেন না, একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া করবেন না। কেনই বা তোমাদের আনন্দ উৎসবে দুঃখ বেদনায় সমভাগী হন না। এখানেই বোঝা যায়—তোমরা আর তাঁরা এক নও। তোমাদের স্বার্থ আর তাঁদের স্বার্থ ভিন্ন। বরং আমি বলবো—আমরা শ্রমিকেরা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও জাতিতে এক। কারণ আমাদের সুখ দুঃখ স্বার্থ কর্ম এক। এরা আমাদের

সবার থেকে ভিন্ন, বিরোধী। এই দেখ না আমরা সবাই করছি মাইনে বাড়ানোর জন্ত এতে তোমাদের স্বার্থ এক আর এরা করছেন এর বিরোধিতা। এর কারণ অন্ত কিছু নয়, এদের স্বার্থ ভিন্ন। আর ধর্মের কথা যদি বলো তাহলে আমি বলবো ধর্মে কি স্বজাতী ও স্বদেশ পালন বা রক্ষা করার কথা নেই? কিন্তু এরা এর কোনটা করছেন? কোনটাই নয়। বরং ধর্মকে ভেঙে গুঁড়ো করে দিচ্ছেন। ভগবানকে তাড়িয়ে তার জায়গায় নিজেরা বসছেন। এই যে তোমাদের জন্ত গীর্জা তৈরি করেছেন। সেখানে কি ভগবান আছেন? ভগবান সেখানে নেই। তিনি তোমার আমার সকলের অন্তরে। তাই আমরা আজ কথা বলছি, শুনছি, দেখছি। এই গীর্জায় আছে ভয়। দুর্বলকে আরো দুর্বলতর করে তোলা হয় এখানে। মানুষ তার অস্তিত্ব হারায়। পাওয়া জিনিসকে হারিয়ে ফেলে অন্ধকারে হাতড়ায়। তোমাদের যিশুই তো বলেছেন—মনই ভগবানের গীর্জা বা মন্দির। যিশুকেই যদি তোমরা মেনে চলো তাহলে মনকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে পার না। মনের আদেশ বা নির্দেশ না মানলে ভগবানই বা কোথায় আর তুমিই বা কি?

ভাওনাথের কথাগুলো ওদের কাছে জটিল ও চিন্তাসাক্ষেপ। তবে স্বার্থের কথাটা ঠিক। তারা খৃষ্টানই হোক অথবা অন্ত কিছু হোক কিন্তু তারা সকলেই শ্রমিক এবং এই ক্ষেত্রে ওদের সকলের স্বার্থই এক। এ-নিয়ে অনেক আলোচনা তর্কবিতর্ক হয় ওদের নিজেদের মধ্যে। ওদের মধ্যে সুলেমান সব চেয়ে বোঝদার লোক। বিত্তাবুদ্ধি দুইই আছে। বেশ ভারি গম্ভীর। কথাবার্তা কম বলে। পাদরীর ইচ্ছা ছিল তাকেই বাগানের খৃষ্টান কুলিদের প্রিচার নিযুক্ত করেন। সে রাজি হয়নি এতে। সে বলেছিল, আমরা হচ্ছি গায়ে খেটে খাওয়া লোক, শ্রমিক। আমরা চাই খেয়ে পরে জীবনটাকে বাঁচিয়ে রাখতে, কর্মের মধ্য দিয়ে যিশুকে পেতে। ওসব ভারি ভারি ধর্মের বই পড়ে বা বুলি আওড়িয়ে মনটাকে নিষ্কাম চিন্তার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে চাইনে। জগতের সব কিছু ছেড়ে ছুঁড়ে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চাইনে।

সে [illegible], ভাওনাথ যে কথাগুলো বলেছে তা সবই ঠিক। আমরা ধর্মের দিক দিয়ে এক হতে পারি কিন্তু সাহেব আর আমাদের মধ্যে আকাশ পাতাল পার্থক্য। এদের আচার ব্যবহার রীতি নীতির কোনটাই আমাদের সঙ্গে খাপ খায় না। বরং অনেক কিছুতেই আদিবাসীর সঙ্গে আমরা এক। এরা এক মাটির লোক আর আমরা অন্য মাটির। এরা যতই বলুন এদের স্বার্থ আর আমাদের স্বার্থ এক নয় তাই মনও ভিন্ন। এরা কত দূরের। এরা এসেছেন আমাদের মাটির রস চুষে খেয়ে এদের মাটি ভরাট করতে। দু'দিন বাদে চলে যাবে কিন্তু আমাদের এখানেই থাকতে হবে। এই মাটি, এই দেশ আমাদের, আসলে আমরা আর আদিবাসীতে কোন প্রভেদ নেই। এই বিভেদ এদেরই তৈরি। এরাই এদের স্বার্থের জন্য আমাদের বাপ ঠাকুরদাকে প্রলোভন দেখিয়ে অথবা ভাই বোনকে নষ্ট করে বিধর্মী করেছেন। তাই আজ আমরা খৃষ্টান। অথচ এখনও আদিবাসীর সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠানে আমাদের মনে দোল দেয়। এসবই মাটির গুণ। অবশ্য হিন্দুধর্মেরও গলদ আছে, তা আমি স্বীকার করি। এদের আচার আছে, বিচার নেই। শুধু এই আচারকেই আমি ধর্ম বলে মেনে নিতে রাজি নই। ধর্ম মনের, আচার বাইরের? সে যাই হোক, আমাদের স্বার্থ যখন এক আর আমাদের যখন আদিবাসীর সঙ্গে পাশাপাশি, গলাগলি থাকতে হবে, তখন আদিবাসীরাই আমাদের আপনজন। এক কথায় বলা যায় শ্রমিক সম্প্রদায়। কাজেকর্মে সুখে দুঃখে যখন আমাদের ওদের কাছেই যেতে হয় তখন ওরা ছাড়া আর আমাদের আপন কে আছে?

এতে খৃষ্টান কুলিদের অনেকেরই মন ভেজে। কথাটা সত্যি যে সাহেবরা অন্য মাটির লোক। এই মাটির রঙ আলাদা। এর গাছপালা নদীনালা আকাশ বাতাস সবই ভিন্ন ধরনের। আমাদের মাটি এক, রঙ এক। আমরাও এক। এক রোদ বাতাসেই আমাদের জীবন।

যেখানে স্বার্থের গন্ধ থাকে সেখানে মানুষের মন টলবেই। যদিও নরসিংবাহাদুরের কথাগুলো তাঁর সমিতির লোকগুলোর

মনঃপুত হয়নি তবু কোন প্রতিবাদ করেনি। কারণ তারা জানে নরসিংবাহাদুর তাদের যে কোন প্রতিবাদের একটা অখণ্ড প্রমাণ দিয়ে তাদের মুখ চেপে ধরবেন। এ বিদ্যাবুদ্ধি তাঁর আছে। এরা পথ চলতে চলতে কোন সময় ভাওনাথের সঙ্গে দেখা হলে নরসিং-বাহাদুরের কথাগুলোর পুনরাবৃত্তি করে বলে তোমার কি. মনে হয় ভাওনাথ?

ভাওনাথ বলে, নরসিংবাহাদুরের কথা কোন সমাজ বা জনসাধারণের কথা নয়। এ আত্মতৃপ্ত মানুষের কথা। সমাজের বুকে শক্ত হয়ে বসে থাকার মত। বীজ যদি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অঙ্কুরিত হতে চেষ্টা না করে তাহলে সে কোনদিনই মাটি ফুঁড়ে উঠতে পারে না। মাটিতেই পঁচে গলে যেত। গাছ হয়ে পাতা ফল ফুলে সমন্বিত হয়ে উঠতে পারতো না। জীবনটাকে উপভোগ করতে পারতো না কোনদিন। তোমার যদি বুকের পাটা, কবজীর জোর না থাকে তাহলে কাগজে কলমে কি হবে? এ তো শুধু দর্শনদারি, মনকে চোখ ঠেরে বোঝানো। শক্তি সঞ্চয় করতে হলে নিজের ওপর নির্ভর করতে হয়। অপরের ওপর নির্ভর করে থাকলে মানুষ দুর্বল হয়। তার সমস্ত মনোবৃত্তি সরে যায়।

এরপর অনেক খৃষ্টানকুলি ও নরসিংবাহাদুরের সমিতির লোক এসে যোগ দেয় ডুয়ার্স বাগান মজদুর সংঘে।

এতে সাহেব মহলে একটা প্রচণ্ড সাড়া জাগে। দমননীতির অনেক মতলব ছাঁদছে। কতকগুলো মুন্সী, কামদারি, চাপরাসী ও সর্দারকে উৎকোচ অথবা পদোন্নতি কিংবা মাইনে বাড়িয়ে দিয়ে হাত করছে। বাগানে বাগানে সকল সম্প্রদায় থেকেই লোক নিয়ে এক একটা ওয়ার্কিং কমিটি তৈরি হলো। সমিতি দুটির পক্ষ থেকে নরসিংবাহাদুর, করুণসিং, সুলেমান এই কমিটি অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ছাড়া সাহেববাবু অনেকেই নির্বাচিত হন। কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় পরিচালকমণ্ডলীর পক্ষ থেকেও কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। এই কমিটির কাজ হবে বাগানের শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ দুঃখ কষ্টের নিবারণ করা। সভা বসে সপ্তাহে একদিন। সভাপতি বাগানের বড়সাহেব। শুরুতে দু'একটা

জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজ হয়। লাইনের মধ্যে দু'একটা রাস্তা তৈরি হয়, কারো কারো ঘর দিয়ে কোঁটা কোঁটা জল পড়তো তা মেরামত করা হয় আর এই সঙ্গে কতকগুলো বুড়ো অথর্ব লোক যারা তাদের জীবনপাত করেছে, হাত ভেঙেছে, পাঁজর ভেঙেছে দেহ খুইয়েছে বাগানে কাজ করতে করতে তারা এতদিন রেশন পেত না কাজ করতে না পারায় তাদের জন্য অল্প সামান্য রেশনের বরাদ্দ করা হয়েছে। করুণসিং ও সুলেমান প্রস্তাব করে— বুড়ো অথর্বদের এই রেশনটা ফ্রি দেওয়ার জন্যে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভোটে হেরে যায় তারা।

মাস দুই যেতে না যেতেই এই ওয়ার্কিং কমিটির ওপর করুণসিং ও সুলেমানের বিতৃষ্ণা জন্মে। কমিটির সমস্ত ব্যাপারেই তারা হেরে যায়। সব যেন পূর্বকল্পিত। এক করুণসিং আর সুলেমান ছাড়া সকলেই বড়সাহেবের দিকে চেয়ে থাকে। একটুক্ষণ নীরবতার পর বড়সাহেব বড়বাবু ডাক্তারবাবু, নরসিংবাহাদুর কোলা ও আর সকল মেম্বারকে লক্ষ্য করে জিগ্যেস করেন—তোমাদের মত কি?

বড়সাহেবের চোখ দুটো জ্বলে ওঠে। মণির মধ্যে থেকে যেন তার কথা ও ইচ্ছা এই লোকগুলোর মনে সঞ্চারিত হয়। তারা বড়সাহেবের অভিপ্রেত কথাগুলোই তাদের মুখ দিয়ে বলে। সঙ্গে সঙ্গে ভোটাধিক্যে করুণসিং বা সুলেমানের প্রস্তাব নাকচ হয়। এই জন্য করুণসিং ও সুলেমান উভয়েই কমিটি ত্যাগ করে। বাগানের লোকগুলোও বিরক্ত হয়ে ওঠে। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজই করছে না কমিটি। শুধু শুধু একটা তামাসা হচ্ছে।

লোকগুলো ভাওনাথকে জিগ্যেস করে—তাহলে এই কমিটি করা কেন?

ভাওনাথ সকলকে কমিটির উদ্দেশ্য বলে। সে বলে—এ বড়সাহেব ও তাঁর খয়েরখাঁদের একটা দুরভিসন্ধি। তারা মনে করেছিল লোকগুলো নির্বোধ, এই করে হাতের মধ্যে আনবে তাদের। লোকগুলো মেতে থাকবে এই নিয়ে। ভুলে যাবে বিদ্রোহের সুর। সকাল ও সন্ধ্যায় টহল বন্ধ হয়ে যাবে,

ঝিমিয়ে পড়বে সমিতি। তোমরা সব সময় মনে রাখবে যে কোন কিছুকে বানচাল করার সব চেয়ে বড় প্রশস্ত উপায় হচ্ছে বিস্তারিত বিবেচনার জন্য কমিটি সংগঠন করা। একে এক কথায় ফাঁকি বলে।

সকলেই কোলার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তলে তলে ডুবে ডুবে অনেক জল খাচ্ছে। বেটা কী পাজী লোকটা। দিন আসুক, লোকটাকে ধোলাই দিতে হবে।

ভাওনাথ বলে—কি দরকার? ওর যা খুশী করুক না। এখন আর আমাদের ভয় কি?

আষাঢ়ে আকাশ। মেঘে মেঘে থম থম করছে। মেঘ ডাকছে। আকাশটা যেন ভেঙে চৌচির হয়ে মাটিতে পড়বে মনে হয়। বৃষ্টি পড়ছে ঝুপ ঝুপ করে। চা শিরীষের গাছগুলো হাসছে। বড় সড়কের রেন ট্রি নেয়ে উঠেছে। তার ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল থেকে জল ঝরছে টুপ টুপ করে। সুড়সুড়িখাওয়া অঙ্গ পুলকে নেচে উঠেছে। নালা দিয়ে জল চলছে কুল কুল করে। শুক্‌নো বিবর্ণ চা গাছে রঙ লেগেছে। ফুটন্ত-যৌবনা কুমারীর অঙ্গ ভরাট হয়েছে। লকলকে পাতায় ভরতি গাছ।

ভাওনাথ ভাবে—এই তো সময় এসেছে। কিন্তু নিরঞ্জনবাবুর খড়্গপুর থেকে ফিরে আসার কোন খবর নেই। এখনও অসুখ চলেছে। সময় যেন একান্ত নির্মমভাবে মানুষের ওপর চেপে বসে। তার সমস্ত আকাঙ্ক্ষা, বাসনা ভেঙে দেওয়াই তার কাজ। এতেই সে আনন্দ পায়।

ভাওনাথ বিলাসীকে জিগ্যেস করে—বলতো কি করি, নিরঞ্জনবাবু তো এলেন না?

নিরঞ্জনবাবুর পথচেয়ে বসে থাকলে তো সময় দাঁড়িয়ে থাকবে না তোমার জন্য। যাহোক একটা কিছু করা দরকার। না হয়, একটা কাজ করো না। তুমি বরং একবার খড়্গপুরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সমস্ত বিষয় আলোচনা করে এসো।

তাই ঠিক বললে ভাওনাথ। আমিও এই কথাই ভাবছিলাম।

নতুবা এদিকে তো বাবুদের ওপর আবার একটা অবিশ্বাসের সুর বেজে উঠছে। অনেকেই বলছে—তেলে জলে এক হয় না। নিরঞ্জনবাবুর অসুখ বিসুখ কিছুই হয় নি। এ একটা ভাঁওতা মাত্র। বাবুদের কাজটা অত সহজে গুছিয়ে নিতে পারলেন তিনি আর যত কঠিন হলো আমাদের বেলাতে।

বিলাসী বললে—সরল মনে অবিশ্বাস জন্ম নিলে বড় মারাত্মক। তুই বরং কালকার গাড়িতেই তার কাছে যা।

নয়

ভাওনাথ খড়্গপুর থেকে ফিরে আসে বাগানে। নিরঞ্জনবাবু সত্যি অসুস্থ। তবে বর্তমানে অনেকটা ভাল। ডাক্তারের কঠোর শাসনে আছেন তিনি। তিনি বলেছেন—জুলাই মাসের ভের তারিখের আগে কোথাও যাবেন না মশায়।

নিরঞ্জনবাবুর সঙ্গে ভাওনাথের সমিতি সম্পর্কে সমস্ত রকম কথাবার্তা হয়। তিনি শ্রমিকদের তৎপরতার কথা শুনে খুবই খুশী হয়েছেন। তিনি বলেছেন আজ জুলাইয়ের দুই তারিখ। এই মাসের পঁচিশ তারিখ থেকে ধর্মঘট শুরু কর। ধর্মঘটের পনর দিন আগে বাগানের কর্তৃপক্ষকে এ বিষয় জানিয়ে দিবি। এর মধ্যে নিশ্চয়ই আমি বাগানে গিয়ে হাজির হতে পারবো। বাগানে গিয়ে সমস্ত বাগানের শ্রমিক নিয়ে এই সম্পর্কে এক সভা করবে।

এতদিন বাদে একটা দুরূহ কাজে হাত দেবে ভাওনাথ। এ-কথা ভাবতেই বুকটা দুরু দুরু কেঁপে ওঠে। এই সঙ্গে মনে একটা দুর্জয় সাহসও জাগে। সমস্ত অন্ধকারের ভয় কেটে গিয়ে মনটা আলোকময় হয়ে ওঠে। অন্ধকার মরে গেছে। ভাওনাথ শক্ত পায়ের শব্দ করে মাটি কাঁপিয়ে পথ চলতে থাকে। পায়ের ধ্বনিতে জেগে ওঠে জয়, উল্লাস। ভাওনাথ জয়ী। পরাজয় কাকে বলে জানে না সে। কোনদিনই না। কথাটা কেমন অহঙ্কার বলে মনে হয় নিজের কাছে। পরক্ষণেই সে বুঝতে পারে এ অহঙ্কার নয়। পৌরুষ। আত্মবিশ্বাস।

এপরপ মিটিং বসে।

ভাওনাথের ভয় হয়। তিন চার দিন ধরে দিনরাত অনেক ভেবেছে—অনেক কথাই মনে ভিড় জমিয়েছে কিন্তু কোনটার সঙ্গে কোনটারই যেন সামঞ্জস্য নেই। কেমন যেন আগোছাল,

এলোমেলো। অথচ সব কথাগুলোই মূল্যবান। কথাগুলো একটু গুছিয়ে আনতেই মনে সাহস হয় আবার সঙ্গে সঙ্গে আরো অনেক কথা এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়। আবার সেই ভয় আর চিন্তা।

সভাতে উপস্থিত হতেই কেমন যেন ভয়ে নির্বাক ও জড়সড় হয়ে যায়। সমস্ত বাগানের লোক এসে ভেঙে পড়েছে সভাতে। পুলিশ জোরতালে পা ফেলছে। মাটি কাঁপছে। শ্রমিকদের জয়ধ্বনিতে ভাওনাথ কেঁপে ওঠে। পায়ের তলা থেকে মাটিটা যেন সরে যাচ্ছে। এখনই কোথায় তলিয়ে যাবে সে। সভার কাজ শুরু হতেই ভাওনাথ দাঁড়ালো। কি বলে শুরু করবে ভাবতেই গলাটা যেন রুদ্ধ হয়ে যায়। একটু কেঁপে ওঠে আবার।

এরপর বলতে শুরু করে ভাওনাথ। প্রথম দু'চারটে কথা কেমন বাধোবাধো কাঁপা গলায় বলে। তারপর ঝড় আরম্ভ হলো। কথারা যেন কোথায় লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। অফুরন্ত ঢেউয়ের মত ছুটে আসছে। একটার পর একটা করে করে। কোথা থেকে আসছে ভাওনাথ নিজেই তা জানে না। অন্য একটা শক্তি, অন্য একটা মন যেন তার মধ্যে জন্ম নিয়েছে। সে বললে—ভাই সব, তোমরা সকলেই জান আমরা কি জন্য এসেছি এখানে। একটুক্ষণের জন্য নিজেরাই নিজেদের কথা ভেবে দেখ। আমরা কি? তোমাদের ইচ্ছা আমার কাছ থেকে তোমরা কিছু জানতে চাও তাই আমি শুরুতেই বলবো—এই দুনিয়াতে বিভিন্ন জাতের লোক আছে সত্য তারা জাতিতে আলাদা হলেও এদের পরস্পরের মধ্যে অনেক কিছু খাপ খায়। কিন্তু খাপ খায় না শুধু দুটি জাতের। সে হলো মালিক আর শ্রমিক অথবা ধনী ও দরিদ্র।

জনতার জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। উত্তেজিত হয়ে ওঠে লোকগুলো।

সমস্ত শক্তি দিয়ে গলা ফাটিয়ে বলে ওঠে সুলেমান—ভেঙে চুরমার করো সব। গড়ে তোলা নতুন একটা মাত্র জাতি।

সভাস্থ লোকগুলো সমস্বরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো—ভেঙে দাও সব। গড়ে তোলো নতুন জাতি।

ভাওনাথ আবার বলতে শুরু করে। জীবনটার দিকে তাকিয়ে

দেখ একবার। কী পচাগলা দুর্গন্ধ এই জীবন! তোমরা জান না, জানতে চেষ্টা করো না যে তোমাদের ওপর ডাকাতি করে, রক্ত চুষে হাড় জির জিরে করে তিলে তিলে মারছে কারা। তারা এই মালিক বা ধনী জাতি।

আবার জয়ধ্বনি।

—এরা জানতে বা বুঝতে দেয় না তোমাদের যে তোমরাই সব, এই দুনিয়াতে তোমরাই সবচেয়ে বড় শক্তি। তোমাদের পরিশ্রমে, রক্তেই গড়ে তোলা হয়েছে এই বিরাট অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। যার সব কিছু মালিক বা ধনীদের, তোমরা কেউ নও। অথচ আমরাই তো সব। আমাদের পুর্বপুরুষেরা এবং আমরাই তো গায়ের রক্ত জল করে তৈরি করেছি এই বাগান, এই গুদোম, অফিস ঘরবাড়ি সব। আমরাই বসিয়েছি এই যন্ত্রপাতি আর আমরাই তো আমাদের সমস্ত শক্তি ক্ষয় করে খাইয়ে পরিয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে বাঁচিয়ে রেখেছি এই পুঁজিপতি লোকগুলোকে। আমাদের শক্তি আমাদের রক্তেই তো মালিকদের এত গাড়ি ঘোড়া, বাড়ি, ঠাকুর, চাকর, সোনার ছড়ি, ঘড়ি। আমরা আবাদ করেছি চা আবার আমরাই পাতি তোলা থেকে শুরু করে সব কিছু করে এই চা তৈরি করি কিন্তু আমাদের ভাগ্যে চা জোটে আর কতটুকু? আমরা পাই পরিত্যক্ত ডাস্টিগুলো যা আমরাই আমাদের মা বোনেরাই চা থেকে পৃথক করে রাখে। একবার ভেবে দেখ আমরা কি? ক্ষুধা সব সময় প্রেতাত্মার মত ছায়া হয়ে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রুটি পাওয়ার কোন আশা নাই। ক্ষুধা আত্মাকে গিলে ফেলেছে। মানুষের চেহারা আকৃতি বদলে যাচ্ছে। মানুষ মরছে। এতদিন আমরা তা দেখতে পাইনি। অন্ধ ছিলাম। আমাদের চোখে ঠুলি পরিয়ে দিয়েছিল ঘানীর বলদের মত তাই ঐ ঠুলি পরেই ঘুরেছি। তৈরি করেছি তেল। সেই তেল কি আমাদের ভোগে লেগেছে? তা খেয়ে মোটা হয়েছে এই পুঁজিপতিরা। একটু খোল তাও আমরা পাইনি। আজ আমাদের চোখের ঠুলি খুলেছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা দুনিয়াটা। বুঝতে পারছি, শুনতে পাচ্ছি সব। চোখের

সঙ্গে সঙ্গে কান ও মনের পর্দাও খুলে গেছে। এবারে আমাদের ভাগ কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিতে হবে। ভাগ্যের ওপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চেষ্ট বসে থাকলে একদানা ছাইও জুটবে না বরাতে।

জনতা নির্বাকে বসে ভাওনাথের দিকে চেয়ে তার কথা শুনছে। চোখমুখের চেহারা বদলে গেছে। একটা প্রবল উত্তেজনার ঢেউ লেগে মনের সমস্ত জমাট জল ভেঙে তরল হয়ে তোলপাড় করছে। দেহ নড়ছে। একটা হিংস্র রাক্ষুসে ক্ষুধা তাদের চোখের মধ্যে রোষে গর্জে উঠছে।

ভাওনাথের কথার শেষ নেই। সে বললে—চোখ যখন খুলেছে সব কিছু দেখতে পাচ্ছ তখন ভাল মন্দর বিচার কর। সামনেই তো দেখতে পাচ্ছ—অমানুষিক খাটুনি খেটে খেটে আমাদের অনেকেই ত্রিশ বছর না পার হতেই আশি বছরের বুড়ো বনে গেছে, মৃত্যুর দুয়ারে এসে হাজির হয়েছে। অথচ দশ বছর আগেও এরা গন্ধমাদন পর্বত বয়ে এনেছে। তখন এদের দেখে কে বলতে পারতো যে তারা নব্বই বছরের আগে অকর্মণ্য অথর্ব হয়ে পড়বে।

আশি বছরের বুড়ো শ্যামসিং লাঠির ওপর ভর দিয়ে কুঁজো মাজায় দাঁড়িয়ে বললে—সবই তো বুঝতে পারছি। কিন্তু শক্তি কতটুকু। যেরকম একটা হাঙ্গামা ফাঁদছে, ধর্মঘট করলে তা দু'চার দিনে মিটবে না। লড়াই করতে হলে রশদের দরকার। আমাদের রশদ কোথায়? আমার তো মনে হয় ভাল বিচার বিবেচনা না করে এত বড় একটা মারাত্মক কাজে হাত না দেওয়াই উচিত।

বুড়ো মানকু বললে—ঠিক বলেছ, শ্যামসিং। আমার মনে হয় আমাদের মত বুড়োথুড়োদের এ থেকে সরে থাকাই ভাল। নতুন জীবন দান করে নতুন মানুষ তৈরি করতে দাও ওদের। আমরা তো সারা জীবনটাই কাটালাম মাটিতে মাথা খুড়ে আর মালিককে সেলাম ঠুকে। ওদের মাথা খাটিয়ে কাজ করতে দাও। আমরা বুড়োরা বড় ভীরু। এই ভয় যে আমাদের জন্মগত, ধাতুগত। তাই এর হাত থেকে রেহাই পাইনে।

ভাওনাথ বললে—ভয়ের কথা বলছ, ভয়ই তো আমাদের

সর্বনাশের মূল। আমাদের মন ভয় দিয়ে গড়া। ভয়ের একটা টুন্‌কো আঘাতেই আমরা মরে যাই। আর আমাদের এই ভয়ের সুযোগ নেয় এই মালিকগুলো। তাই বলি ভয়কে আঘাত করে মেরে ফেলতে হবে। আমি জানি এই রোগ আমাদের ধাতুগত। আমরা পেয়ে আসছি এই রোগ পুরুষ পরম্পরা। ক্ষীণ দুর্বল জলো রক্তে দিনদিন এমনি করে জীবনীশক্তি বিনাশের বিষ দিয়ে আমাদের সমস্ত জীবনীশক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে ধনী সম্প্রদায়। আমাদের মধ্যে যাদের দু'এক কোঁটা তাজা রক্ত আছে তাদের জোর আছে। তারা হুমকি খেয়ে চমকে ওঠে না। জীবনের তাৎপর্য্য বুঝতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। আজ নতুন দিন এসেছে যুগের পরিবর্তন নিয়ে। এই সুযোগ হারালে আর আসবে না। এই যুগের পরিবর্তন আনছেন ভগবান নিজে। তিনিই নির্দেশ দিচ্ছেন অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়তে। ভয় কিসের? আমরা লড়বো ন্যায়ের জন্য। অত্যাচারী, মিথ্যাবাদী, লোভী, পরভূকদের বিরুদ্ধে যারা আমাদের হাত পা ভেঙে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে চাবুকের পর চাবুক মারছে পিঠে। এ-কথা সত্য যে আমাদের এই নতুন জীবনের পথ দুরূহ, কঠোর। প্রথমটায় ভাল লাগবে না এই জীবন। তারপর ধীরে ধীরে যত সন্ধান মিলবে তত জীবনটাকে উপভোগ করতে পারবো। তখন জীবনকে ধিক্কার না দিয়ে বরণ করবো। আর সমাজব্যবস্থার নলচে খোল সব বদলি করতে হবে। নতুন জীবনের জন্য নতুন মনের জন্ম দিতে হবে। এই নতুন মনই জীবনের স্বাদ দেবে। বন্য পশুর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য আমরা তাকে বধ করি। তাহলে দেখতে পাচ্ছি জীবনটাই সব। তবে কেন আমরা এই হিংস্র মানবপশু যারা আমাদের রক্ত চুষে খাচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে শক্ত হয়ে দাঁড়াবো না? একটা মশা মাছি কিংবা ছারপোকা আর কতটুকু রক্ত খায় তবু আমরা মেরে ফেলি তাদের কিন্তু তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বেশি রক্ত খায় এই নরপশুরা তাহলে কেন আমরা তাদের ছেড়ে দেব। আর আমাদের এই নতুন জীবনের অগ্রগতির পথে যারা দাঁড়াবে

তাদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। আমাদের কি আছে যে ভয় করবো? নাই ঘর বাড়ি নাই জায়গা জমি। আমরা আশ্রয়হীন ঝড়ে ডানাভাঙা উড়ো পাখি। ওঠ বললেই উঠতে হবে। ভয়ই মানুষের মৃত্যু আনে। মানুষ মরে না, মরবেও না কোনদিন। তাহলে মরণেরই বা ভয় কি? আসুক না মরণ তবু নতুন রক্ত জন্ম নেবে। হাড়গোড় মাস পুরনো রক্ত সব খেতে দাও এই শিয়াল কুকুর শকুনিগুলোকে। এই বিষ পান করে তারাই মরবে। আর শক্তি? শক্তি আমাদের যথেষ্ট আছে। তোমরা মনে রাখবে মানুষ যখন তার জীবনটাকে উপলব্ধি করতে পারে তখন তার মধ্যে একটা বিরাট শক্তির আবির্ভাব হয়। সেই শক্তিই মানুষের মনের মধ্যে ঢুকে আঘাতের পর আঘাত করে মানুষকে জাগিয়ে তোলে। সেই শক্তি আমাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হয়েছে আজ। আমরা মানুষ, আমরা স্বাধীন।

করুণসিং বললে—ভগবান বলেছেন সমস্ত শক্তি দিয়ে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে কিন্তু কই আমরা তো আমাদের একবিন্দু শক্তিও প্রয়োগ করি না। রোগ হলে আমরা ওষুধ খাই। কেন? রোগ প্রতিরোধ করতে। তাহলে আমরা যে রোগে ভুগছি তারও ওষুধের প্রয়োজন। এই ওষুধ আমাদের কাছেই আছে অথচ আমরা ব্যবহার করি না তার। আমাদের সম্মিলিত শক্তি যদি রুখে দাঁড়ায় তাহলে কার সাধ্য তাকে রোধ করে? ভারতে চা বাগানের সংখ্যা সাত হাজারেরও উপর হবে। শ্রমিক কাজ করে কমপক্ষে দশ লাখ এ-খবর তোমাদের অনেকেরই জানা নেই। এখন একবার ভেবে দেখ আমাদের শক্তি কত বড়। অথচ আমরা কতটুকু হয়ে আছি এই মুষ্টিমেয় লোকের কাছে। প্রত্যেক মানুষেরই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আমরাও আর আর মানুষের মত বেঁচে থাকতে চাই। এতে যদি কেউ বাধা দেয় তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সংকল্প গ্রহণ কর। পুরনো নীতিবোধকে ভেঙে 'চুরমার করে দাও। সেখানে ভগবান নেই। সেখানে আছেন এই মালিক বা ধনী সম্প্রদায়। তাঁরাই ভগবানের নামে দোহাই দিয়ে সৃষ্টিকে বিধ্বস্ত করে দিচ্ছেন। নতুন

নীতিবোধ দিয়ে নতুন মানুষ গড়ে তুলতে হবে। সত্যিকার শিবশঙ্করকে মনের আসনে এনে বসাতে হবে। তখন সব মানুষ এক হবে। ভগবানও এক হবে।

বিলাসী চুপচাপ বসে সকলের কথাই শুনছে, ভাবছে। নিজের মনেই নিজেকে প্রশ্ন করছে, জবাব দিচ্ছে। সে দেখতে পায়—সমস্ত জনতা একটা ধীর গম্ভীর উত্তেজনার ঢেউয়ে উঠছে, নামছে। এদের স্বপ্নালু চোখ যেন মহৎ, সুন্দর হয়ে উঠেছে। তারা ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্বে অতি ঊর্ধ্বে একটা ভাবময় রাজ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। তার মনে হয় সকলের ওপরই কি যেন একটা বিরাট কিছু ভর করেছে। ভাওনাথ সভাতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে শুরু করতেই তার বুকটাও কেঁপে উঠেছিল ভয়ে। সে মনে মনে জিতবাহন করমগোঁসাইকে ডাকছিল। তাঁরা তার মুখ রেখেছেন। সেই ভয় আর এখন তার নেই। একটা সফলতার আনন্দ উৎসব চলছে মনে। ভাওনাথের কথা মন দিয়ে শুনছে সকলে। ভাবছে। ওদের মন যেন আগেকার সেই সংকীর্ণ গলি পার হয়ে একটা বিস্তার্ণ দিগন্তে এসে বিস্ফূর্ত ফুটে উঠেছে। এই অন্ধকার পঁচা গলা জীবনধারার ওপর ভাওনাথ যেন আলোর ফিনকি ছিটিয়ে দিয়েছে। জ্বেলে দিয়েছে ওদের মনের দীপ। জীবনের সমস্ত দুঃখ দৈন্য গ্লানি অপমান মুছে গেছে। ন্যায় যেন রূপকথার মত স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে। এক-ভ্রাতৃত্বের রাজ্য কায়েম হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটা সহানুভূতিশীল স্নেহ ভালবাসার নতুন সমাজ। পুরনো পৃথিবী মরে গেছে। নতুন মানবতা নিয়ে আর এক নতুন নিষ্পাপ মানুষ জন্ম নিয়েছে।

বিলাসী বললে, পুরনো সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরেছে। আর ক'দিন মাত্র এর আয়ু আছে। ছেলেরা প্রস্তুত। এবারে মেয়েদের পালা এসেছে। তোমরা সন্তানের মা। দয়ামায়া ভরা তোমাদের দেহ, মন। শক্তিরূপিণী হয়ে ছেলেদের পাশে গিয়ে দাঁড়াও। তাদের একা যেতে দিও না। তোমরাও তাদের দুঃখ কষ্টের ভাগীদার হও। মা ছেলে এক সাথে মিলে সংগ্রাম চালাও। সত্যের জয় অনিবার্য। আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের মনের

মধ্যে সত্যের বীজ উপ্ত হয়েছে। যাদের মধ্যে হয়নি তাদের মাটি খুঁড়ে দেখিয়ে দাও মাটিতে কাদের রক্ত এখনও টলমল করছে।

মদনকুল বললে, ওরা যদি আমাদের বুটের লাথি, কিল, চড়, ঘুষি ও চাবুক মারে তাহলে আমাদেরই বা কেন রুখে দাঁড়াবার অধিকার থাকবে না? আমার কথা হচ্ছে ওরা যে ভাবে জীবন যাপন করে আমাদেরও ঐ ভাবে জীবন যাপন করার সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। আমরাও মানুষ। প্রত্যেক মানুষেরই এই দাবী করবার অধিকার আছে।

জনতা সমস্বরে জিগির গেয়ে ওঠে, দিতে হবে। আমরাও মানুষ। আমাদের দাবী মানতে হবে। জনতার স্বর ক্রমান্বয়ে উর্ধ্বে উঠতে থাকে। আকাশে বাতাসে উড়ে যাচ্ছে, দিতে হবে। আমরাও মানুষ। আমাদের দাবী মানতে হবে। কথাগুলো পাহাড়ে আঘাত খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে। মনে হচ্ছে বহুদুর থেকে তাদের কথার সাড়া আসছে। তারাও বলছে, দিতে হবে। আমরাও মানুষ। আমাদের দাবি মানতে হবে।

এই উত্তেজনার মধ্যে একটা অপরিচিত নারীকণ্ঠ শুনতে পায় সকলে। অনেকেই তাকে চেনে না, দেখেনিও কোনদিন। মেয়েটির বয়স, আঠার উনিশ হবে। যৌবন ফেটে পড়ছে। রাগে, ক্ষোভে দুঃখে তার দেহ থেকে যেন আগুন ছুটে বেরুচ্ছে। সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে কর্কশ চিৎকার করে উঠলো, অমানুষের দল, এখনও শপথ করছ না তোমরা। অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছ না? আগুন জ্বালো। চেয়ে দেখ, তোমাদের সামনেই রয়েছে কত জীবন্ত উদাহরণ। কানে শুনতে পাচ্ছ না দমকে দমকে কাশির আওয়াজ, ঘন ঘন নিশ্বাস। দেখতে পাচ্ছ না হাড়সার দেহটাকেও আর টানতে পারছে না। এই নিষ্ঠুর অমানুষ মানুষগুলো ওদের সব লুট করে নিয়েছে। আগুন জ্বালাও। ভাল করে দেখে নেও ওদের। আমাদের দেহের রক্ত দিয়েই স্ফীত হয়েছে ওরা। আমাদেরই রক্ত দিয়ে ওরা কিনছে সখের ঘোড়া। সেই ঘোড়া আমাদেরই বুকের ওপর দিয়ে খুরের শব্দ তুলে চলছে।

একজন বৃদ্ধা উঠে বললে—আইন যে আমাদের হাত পা বেঁধে রেখেছে।

মেয়েটি উঁচু গলা করেই বললো—এই আইন আইন নয়। বেআইন। এতে নীতিবোধ নেই। এই আইন পুঁজিপতিদের হাতেগড়া আইন। এই আইন ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে। নতুন আইন তৈরি করতে হবে। তাতে থাকবে নীতিবোধ। সেই আইনে ধনী হোক দরিদ্র হোক, মালিক হোক শ্রমিক হোক প্রত্যেকেই প্রত্যেককে মানুষ বলে স্বীকৃতি দেবে। এই আইন যে কি তা তো সামনের ওপরই দেখতে পাচ্ছ। একবার চেয়ে দেখ সশস্ত্র পুলিশ কর্মচারিদের দিকে। কথা শুনে কেমন লাফিয়ে উঠছে সঙ্গীন খাড়া করে। কটমট করে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। ন্যায়ের কথা নীতির কথা ভাল লাগছে না ওদের। লাগবেও না। কারণ ওরা যে ওদেরই পোষ্য। ওদের কথাতেই ওঠে বসে ওরা।

মেয়েরা সকলেই চিৎকার করে ওঠে—শপথ করছি। আমরা আমাদের সমস্ত অন্তর দিয়ে ছেলেদের সাহায্য করবো।

সকলেই মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এর মধ্যে অনেকেই মেয়েটির পরিচয় জানতে পেরেছে। মেয়েটি তোরঙ্গবাহাদুরের মেয়ে। নাম বীরমায়া।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার মেঘলা আষাঢ়ে অন্ধকার নেমে আসে। সভা ভঙ্গ হয়। দূরের চা-বাগানের বস্তিগুলো আঁধারে ডুবে গেছে। কোন ঘরেও একটা বাতি জ্বলছে না। লোকগুলো অন্ধকারে অবাধ পা ফেলে উত্তেজনার সুর ভাজতে ভাজতে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

দশ

মিটিংএর পর থেকে প্রতি বাগানে ঘরে বাইরে বীরমায়ার কথা চলতে থাকে। দূরের বাগান থেকে দলে দলে মেয়েপুরুষ এসে বীরমায়ার সঙ্গে আলাপ করে।

সুলেমানও বীরমায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। সে ভাওনাথকে বলে—সত্যিই, তোরঙ্গবাহাদুরের মেয়েটি একটি মূর্তিমতী শক্তি। আজকার সমাজে মদনকুল আর বীরমায়ার মত মেয়েরই প্রয়োজন। এদের সঙ্গে কথা বলেও শান্তি পাওয়া যায়।

এবার সুলেমানের অনুরোধে ভাওনাথ তাকে নিয়ে তোরঙ্গ-বাহাদুরের বাড়িতে আসে। ভাওনাথ আগে থেকেই বীরমায়াকে চিনতো। তবে সেই চেনা যেন চোখেই চিনেছিল আর জানতো সে তোরঙ্গবাহাদুরের মেয়ে বীরমায়া। কিন্তু এই বীরমায়া যে সত্য সত্যই বীর, একটি মূর্তিমতী শক্তি তা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি সে। তাকে দেখেছিল সে মায়া মমতা করুণার চোখ দিয়ে। একটা লাজুক শান্ত মেয়ে। তোরঙ্গবাহাদুরের কাছে বীরমায়ার পরিচয় পেয়ে সে মর্মে মর্মে আহত হয়েছিল। বীরমায়াকে ছোট বয়সে বিয়ে দিয়েছিল। আজ তিন বছর হয় তার স্বামী মারা গেছে। এরমধ্যে অনেক সম্বন্ধ এসেছে বিয়ের—কিন্তু বিয়ে করতে কিছুতেই রাজী হয়নি সে। কারণ কি, তাও বলেনি সে তাকে। এই সব কারণে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে সে তাকে আরো ক্ষতবিক্ষত করতে ইচ্ছা করেনি। কিন্তু আজ সে-ও তার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে চঞ্চল হয়ে ওঠে।

এতদিনের পরিচয়ে কোনদিনও বীরমায়া ভাওনাথের সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সে শুধু নিবিষ্ট মনে বসে তোরঙ্গবাহাদুর, মঙ্গলে ও তার আলাপ আলোচনা শুনেছে। একটি কথা বলেনি অথবা কোন মন্তব্য প্রকাশ করেনি। কিন্তু আজ

সে-ও ভাওনাথের সঙ্গে কথা বলতে উচ্ছল হয়ে উঠেছে। পাষাণ বুকের সমস্ত কাঠিন্য কেটে গিয়ে যেন একটা তরল পদার্থ টলমল করছে।

সুলেমান চুপ থাকতে পারেনি। সে বললে—মিটিংএ তোমার কথাগুলো শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমার মত মেয়েই এখন আমাদের এই পচাগলা সমাজে দরকার। মায়ের মধ্যে তেজ, দীপ্তি না থাকলে তেজী ছেলে পাবে কোথায় ?

তোরঙ্গবাহাদুর বললে—শুধু মেয়ে হলে চলে না ঐ সঙ্গে পুরুষও তেমনি দরকার। সমান সমান না হলে হয় না।

সুলেমান বললে—ঠিক বলেছ তুমি। দুটি সমান না হলে যেটি তেজী তার তেজও নষ্ট হয়ে যায়।

সুলেমানের কথা বীরমায়ার মনঃপুত হয়। সে তার অজ্ঞাতসারে ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানায়। মুহূর্তের মধ্যে বীরমায়ার চেহারার পরিবর্তন হয়। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছে।

তোরঙ্গবাহাদুর বললে—ঠিক কথাই বলেছ সুলেমান। আমার মেয়েটিও কম তেজী ছিল না কিন্তু জামাইটি ছিল একটা ভীরু, নিষ্প্রাণ। ওরা কিছুদিন একসঙ্গে বসবাস করার পরেই দেখা গেল ওর সেই তেজ সেই জেদ কে যেন চুরি করে নিয়েছে।

ভাওনাথ হঠাৎ খুশীর আমেজে রসিকতা করে ওঠে। সে বললে—তাই বুঝি সুলেমান তুমি তেজী মেয়ে না পাওয়াতে বিয়ে করছ না ?

সুলেমান বললে—কথাটা যে একেবারে সত্য নয় তা নয়। তুমি জান না ভাওনাথ ঐ পাদরী বেটা আমাদের যিশুর ভয় দেখিয়ে কবরের নিচেতেই রাখছে, মাথা উঁচু করতে দিচ্ছে না। আমার সঙ্গে বনে না তাই গীর্জাতেও বড় একটা যাইনে আমি। আমি জানি সকলেই উপরের দিকে উঠতে চেষ্টা করে। এমন কি জীবজন্তু পশু-পক্ষী গাছপালাও। পাখীরা আকাশে আকাশে উড়তে চায়, গাছ অঙ্কুর হতেই তা উর্দ্ধমুখে মাটি ফুঁড়ে ওঠে। তাহলে আমরাই বা উপরে উঠবো না কেন ?

বীরমায়া এবারে আর চুপ করে থাকতে পারে না। সে

বললে—তোমার জুড়ি মেয়ে এই কুলি-ধাঙড়ের মধ্যে কখনই জুটবে না।

সুলেমান এতক্ষণে বীরমায়ার দিকে পূর্ণদৃষ্টি মেলে তাকায়। বীরমায়াও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকে। তার মনে হলো সুলেমান যেন তার দৃষ্টির মধ্য দিয়ে অন্তরের সমস্ত কথা তাকে জানিয়ে দিচ্ছে। অনেক কথা শুনতে পাচ্ছে বীরমায়া।

ওদের তন্ময়তা ভাঙে তোরঙ্গবাহাদুরের কথায়। সে ভাওনাথকে জিগ্যেস করে—দেখতে দেখতে তো দু'হপ্তা কেটে যাবে নিরঞ্জনবাবুর কোন খবর পেলে ?

এখনও সময় হয়নি উত্তর আসার, বললে ভাওনাথ। হয়ত দু'একদিনের মধ্যেই চিঠির জবাব পাব।

তোরঙ্গবাহাদুর বললে, তাহলে আমাদের মত কাজে অগ্রসর হই তারপর তিনি এলে তাঁর পরামর্শ মত কাজ করা যাবে।

তাই-ই করতে হবে, বললে ভাওনাথ।

সুলেমান বললে, মেয়েদের ভার বিলাসী, মদনফুল ও বীরমায়ার ওপরে দেওয়াই ভাল।

কথাটা ভাওনাথ ও তোরঙ্গবাহাদুর উভয়েই মেনে নেয়।

ভাওনাথ বীরমায়ার দিকে চেয়ে জিগ্যেস করে, তোমার মত কি বীরমায়া।

বীরমায়া বললে, আমার নিজের তরফ থেকে কোন অমত নেই।

ইতিমধ্যে মিটিংএর দিন থেকেই সাহেব মহলে আতঙ্ক দেখা দেয়। পোষ্টমাষ্টার তার আর রেজিষ্টার্ড চিঠি পত্তরের গুতোয় অস্থির হয়ে উঠেছেন। একদিন ডি, পি, এর চেয়ারম্যান এলেন সাহেবদের ক্লাবে। তিনি ভাওনাথকে ঐদিন বিকেল বেলা ক্লাবে উপস্থিত থাকতে অনুরোধ করেন। সমস্ত বাগানের বড়সাহেবেরাও সেখানে উপস্থিত থাকেন। ডি, পি, এর চেয়ারম্যান ভাওনাথকে ধর্মঘট নভেম্বর মাস পর্যন্ত স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, তোমাদের বিষয় বিলেতে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা বিবেচনা করছেন। তাঁদের মিটিং বসবে। সেই মিটিংএ যাহোক একটা

কিছু করা হবে এই রকম একটা ইংগিত বিলেতের টিবোর্ড সেক্রেটারীর নিকট থেকে কলকাতায় আই, টি, এ সেক্রেটারীর কাছে এসেছে। তিনি তাঁর চিঠির কিয়দংশ ভাওনাথকে পড়িয়ে শোনান। সেক্রেটারী লিখেছেন, বাগানে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সংবাদ পেয়ে কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ বিশেষ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। শীঘ্রই মিটিং বসবে। সকলকেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি পাঠান হয়েছে। আই, টি, এ, ডি, পি, এ এবং বাগানের ম্যানেজারেরা যেন ডিরেক্টরদের মিটিং না হওয়া পর্যন্ত শ্রমিকদের ধর্মঘট মুলতুবি রাখতে অনুরোধ জানান।

এরপর একটা ঘরোয়া মিটিং বসে ডুয়াস চাবাগান মজদুর সংঘের। এই মিটিংএ ধর্মঘট মুলতুবি রাখার সমস্ত বিষয়টি বিশেষ ভাবে আলোচিত হয়। অনেকেরই ইচ্ছা নয় ধর্মঘট স্থগিত রাখা হয়। তারা যেন বেপরোয়া হয়ে ওঠে। সাহেবদের নরম বুলিতে আর মন ভিজছে না তাদের। যে আগুন জ্বেলেছে তা আর নিভাতে রাজী নয় তারা। সময় দেওয়া কিছুতেই চলবে না। তাদের বিশ্বাস সময় পেলেই সাহেবেরা আর একটা নতুন ফ্যাকড়া বাঁধিয়ে সব বানচাল করে দেবে।

ভাওনাথ বললে, সময় পেলে নতুন একটা ফন্দি আঁটা অসম্ভব নয়। সমস্ত জিনিসটা ভেস্তে দেওয়া হয়ত সম্ভবপর হবে না একথা তাঁরা জানেন, তবে এরমধ্যে একটা মস্তবড় দুরভিসন্ধি রয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার মনে হয় এই সময় নেওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ধর্মঘট যত দিন পিছিয়ে যাবে ততদিনের বাড়তি তলবটা তাঁদের বেঁচে যাবে আর এই ধর্মঘট যদি তাঁদের কথা মত নভেম্বর পর্যন্ত মুলতুবি রাখা হয় তাহলে কোম্পানীর তেমন কোন ক্ষয়ক্ষতি হবে না।

অম্বরবাহাদুর বললে, ঠিক কথাই তো। তখন আর পাত্তির জোর থাকবে না। ঐ সময়ে তো কলমই শুরু হয়ে যায়। কলম দু চার দশদিন বাদে হলেও কিছুই এসে যায় না।

সকলেই একযোগে বলে ওঠে, না, সময় দেওয়া হবে না।

বড় হট্টগোল হচ্ছিল। সুলেমান বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, এত

হট্টগোল হলে সুস্থ মস্তিষ্কও বিকারগ্রস্থ হবে। কেউ কারো কথা শুনতে পাচ্ছে না। ভাবতে পাচ্ছে না কিছু।

সুলেমানের ধমকানিতে গোলমাল থেমে যায়। করুণসিং বললে, আচ্ছা, নভেম্বর পর্যন্ত সময় না দিয়ে ওটাকে আগষ্টের শেষে করলে কি হয়? আমার তো মনে হয় এতে দুই কুলই রক্ষা হবে। মালিকদের অনুরোধও রক্ষা করা হবে আবার আমাদের উদ্দেশ্যও বজায় থাকবে। কারণ আগষ্টের শেষ পর্যন্ত পা।ত একটানাই আসবে। এতে ওরাও বুঝতে পারবেন যে তাঁদের উদ্দেশ্য আমাদের অজানা নেই।

আবার অসন্তোষের একটা গুঞ্জন শোনা যায়। অনেকেই বলাবাল করছে, না, সময় দেওয়া উচিত নয়।

সুলেমান করুণসিংএর কথা সমর্থন করে বললে, আমার মনে হয় একমাস সময় দেওয়া মন্দ নয়। আর সঙ্গতও। কারণ বিলেত থেকে সংবাদ আদান প্রদানে বেশ সময় লাগে।

মদনফুল বললে, আমিও করুণসিং ও সুলেমানকে সমর্থন করি। বিলেত থেকে চিঠির জবাব আসতে সময় লাগে। তারপর বিলেতের ডিরেক্টরদের বিনা অনুমতিতে এখানকার কারো কিছু করবার ক্ষমতা নেই।

এবারে সকলেই ব্যাপারটি তলিয়ে দেখে। আগষ্টের শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়া হবে স্থির করা হয়।

বীরমায়া একান্তভাবে চুপচাপ ছিল এতক্ষণ। সকলের কথাই সে মন দিয়ে শুনেছে।

সুলেমান একটু হেসে বললে, সকলেই তো যাহোক একটা মতামত দিয়েছে। তুমি তো কিছুই বললে না বীরমায়া।

বীরমায়া বললে, বলবার কি আছে? সবই তো বলা হয়ে গেছে। তারপর একটা তামাসা ভরা দুষ্টু হাসি দিয়ে বললে, পুরুষের কথার কাছে কি মেয়েরা দাঁড়াতে পারে, কি ঘরে কি বাইরে?

সকলের মুখেই একটা হাসি ফুটে ওঠে। অনেক তিক্ততার পর একটু মিষ্টিমুখ করা হলো। রসিকতা দিয়ে মিটিংএর সমাপ্তি ঘটছে।

ভাওনাথের খুব ভাল লেগেছে বীরমায়ার কথা কটি। ভারি গুরুগম্ভীর মস্তিষ্কে এবার একটু হালকা নরম হাওয়া লাগলো। সে ঠোঁট কেটে মুচকি হেসে বললে, এখানে কিন্তু পুরুষ মেয়ে সব এক। কোন তফাৎ নেই। যেদিন থেকে তোমরা সমিতির কাজে যোগ দিয়েছ সেদিন থেকেই তোমরা শুধু নারী নও তোমরা পুরুষ নারী দুইই। পুরুষের চেয়েতে অনেক উপরে। ভেতর বার সব তারই তাল সামলে দিতে হচ্ছে তোমাদের।

বীরমায়া বললে—সময় দেওয়া সম্বন্ধে আমার কোন অমত নেই। সুলেমান, করুণসিং, মদনফুল যে যা বলেছে সবই ঠিক। তবে আমার মনে হয় সমস্ত দেওয়ার ইস্তাহার তৈরি করার আগে আমাদের আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। সে-কথাটি হচ্ছে, সময় আমরা দেব আগষ্টের শেষ পর্যন্ত কিন্তু আমাদের মাইনে বাড়াতে হবে জুলাই থেকে।

বিষয়টি খুবই গুরুত্বপুর্ণ। অথচ এই বিষয় এতক্ষণ কেউ উত্থাপন করেনি যদিও ভাওনাথ শুরুতেই বলেছিল যে এই সময় নেওয়া অর্থই হচ্ছে যতটা সম্ভব টাকা বাঁচানো।

সকলেই অবাক চোখ মেলে বীরমায়ার দিকে চেয়ে থাকে। সুলেমান বললে—ঠিক কথা বলেছে বীরমায়া। আমরা এ-কথাটা কিন্তু ভুলেই গিয়েছিলাম। ভাওনাথ একটুক্ষণ আগে যে-কথা বলেছে তার প্রমাণ এখানেই হয়ে গেল। নারী যদি সত্যিকার নারী হয় তাহলে সে পুরুষের চেয়ে অনেক বড়।

ভাওনাথ বললে—একমাস সময় দেওয়া হচ্ছে বলে কেউ যেন স্তিমিত বা নিরুৎসাহ হয়ে না পড়ে। বুঝতে হবে এই সময় চাওয়া অর্থই আমাদের শক্তিকে স্বীকার করে নেওয়া! তাই সকাল সন্ধ্যার জিগির গাওয়া যেন আগের চেয়ে আরো জোরতালে চলে। এই জিগির বাজে কথা বা শুধু শুধু চিৎকার নয়। এ আমাদের ধ্যান। এই জিগিরই আমাদের ঘুমন্ত মনকে জাগিয়ে রাখবে।

এরপর নতুন করে ইস্তাহারের খসড়া তৈরি করা হয়। অন্য দাবীদাওয়ার সঙ্গে বীরমায়ার দাবীটিও সংযুক্ত হয়।

এই নতুন ইস্তাহার পেয়েও সাহেবেরা হাল ছাড়েনি। তাদের

ধারণা ছিল তরীখানি ঠিক মতই চালিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু প্রলয়ের মত ভয়ঙ্কর যে তুফান উঠেছে শান্ত সমুদ্রে তা নিভবার নয়। বরং আরো জোরে ঝড় বইতে থাকে। সাহেবদের হাজার চেষ্টাতেও আর সময় দেয়নি ভাওনাথ।

তিনদিনের মধ্যেই গাদায় গাদায় ইস্তাহার ছাপা হয়ে এলো আলিপুর প্রেস থেকে। বাগানে বাগানে বিলি করা হয়। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে, গুদোম অফিস, বাজার রাস্তাঘাটের বড় বড় গাছে রাতে রাতে এঁটে দেওয়া হয় সেগুলো। দিনের বেলাতে ঐগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয় কোম্পানীর লোকগুলো। আবার রাতে সে সমস্ত খালি জায়গা পুরণ করে মজুরদল।

এই সময়ে সমিতির কর্মীদের ঘুম ছিল না। তারা সারা রাত জেগে কঠোর পরিশ্রম করে। ক্লান্তি বা অবসাদ বোধ করে না। হাঁফিয়ে ওঠে না কোন সময়। এ-কথা ভুলেই গেছে তারা। তারা বুঝতে পেরেছে সাধনায় অবসাদ বা ক্লান্তির স্থান নেই। তাই যোগী পুরুষেরা রাতদিন সকল সময়ই ধ্যান করতে পারে।

করুণসিং, সুলেমান, মদনফুল, মঙ্গলে ও বীরমায়া অমানুষিক পরিশ্রম করে। তারা রাতে রাতে বাগানে বাগানে ঘুরে সকলকেই জাগিয়ে রাখে।

এই সময়ে একসঙ্গে কাজ করতে করতে পরস্পর পরস্পরের মনের কথা জানতে পারে। সুলেমান ও বীরমায়ার মধ্যে অনেক মনের কথার বিনিময় হয়। দু'জনের মধ্যে বেশ হৃদ্যতা জন্মে। ওরা দুইজনে একসঙ্গে কাজ করে তৃপ্তি পায়।

একদিন এক ফাঁকে সুলেমান বীরমায়াকে জিগ্যেস করে—আচ্ছা, তোমার তো তেমন একটা বয়স হয়নি। এ বয়সে তো অনেক মেয়ে বিয়েই করে না। তুমি কেন আবার বিয়ে কর না? সংসারের সুখশান্তি বোঝার আগেই তো তোমার স্বামী মারা গেছে। কথাটা বলেই প্রথমটায় একটু থমকে যায় সুলেমান। তার মনে হয় বীরমায়া হয়ত ক্ষুণ্ণ হবে।

কিন্তু বীরমায়াকে মোটেই ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যায়নি। সে হেসেই জবাব দেয়—তুমি যে জন্য করনি, আমিও ঠিক সেই জন্য।

সুলেমান বললে—আমি করিনি কারণ আমাদের খৃষ্টান মেয়েদের মধ্যে আমি মনের মত মেয়ে পাইনি। তারা সকলেই ভীরু। মানুষের যে তাপ রাগ তা তাদের মধ্যে নেই। পাদরি বেটাই এদের সমস্ত ব্যক্তিত্ব চুরি করে নিয়েছে।

তা, তুমি যখন জাত মান না তাহলে অন্য জাত থেকে মনের মত একটা মেয়ে আনলেই পার।

সুলেমান বললে—এরকম মেয়ে হয়ত এখনও জন্মেনি ভারতবর্ষে যে স্বজাতির গণ্ডি পার হতে ভয় পায় না। ধর্মভয়ই তো আমাদের দেশকে মাটি করেছে। জীবনের উপলব্ধি নেই, মানবতার স্থান নেই।

কাজের সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ, আনন্দ ও আবেগে অনেক মনের কথাই বিনিময় হয় ওদের। উভয়ে উভয়ের মনের মধ্যে বিদ্যুতের মত প্রবেশ করে। বীরমায়াও তার বিবাহিত অতীত জীবনের অনেক কথা বলে সুলেমানকে। স্বামীর সঙ্গে বেশি দিন ঘর করেনি সে। হয়ত আর কিছুদিন করতে হলে বীরমায়া পাগল হয়ে যেত। অত্যন্ত ভীরু অথচ মাতাল হয়ে কী চেঁচামিচিই না করত। কাজ করবে না। কিন্তু মদ বা হাড়িয়া সব সময়ই হাতের কাছে চাই। তা না পেলেই মারপিট, অশ্লীল গালাগাল করতো। তার ব্যবহারে এবং তার সঙ্গে থাকতে থাকতে আমিও একটা ভীরু বোকা অমানুষ বনে যাই। বাপমায়ের রক্তে পাওয়া সমস্ত তেজ, রাগরশ্মি যা মনের মধ্যে অঙ্কুরিত হচ্ছিল তা সব শুকিয়ে যায়।

এমনি করে ওরা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আকাশের নীল তারা জ্বলে ওরা ওদের নীল চোখে তাদের দিকে চেয়ে শপথ করে। ওদের উৎসাহ, উত্তেজনা ও কার্যক্ষমতা আরো বেড়ে যায়। শতগুণ উৎসাহে সমিতির কাজ করতে থাকে। স্বপ্নালু চোখে দেখতে পায় সব কিছু বদলে গেছে। এই দুনিয়ার মানুষ, আকাশ বাতাস গাছপালা। আর মাত্র পনর দিন বাদেই তাদের সাধনা সফল হবে। মজুরদের মাইনে বাড়বে, ভাল ঘরবাড়ি তৈরি হবে। ওরা ঘর বাঁধবে। মানুষের থাকার মত ঘর। একটা সুখী পরিবার। সেখানে মনের কোন দৈন্য বা গ্লানি থাকবে না।

একটা সব পাওয়া পরিপূর্ণ সংসার। ওদের থেকে জন্ম নেবে আর এক নতুন জীবন। মানব প্রকৃতির প্রতীক আরো তেজী আরো শক্তিমান এক অস্তিত্ববাদী নতুন মানুষ।

ধর্মঘটের দিন আসন্নপ্রায়। মাত্র এক হপ্তা সময় আছে। কোম্পানী থেকে মাইনে বাড়ানোর কোন খবর আসছে না। ধর্মঘট অনিবার্য। এই ধারণা নিয়ে শ্রমিক সম্প্রদায় পুরো উদ্যোগ আয়োজন করছে।

ভাওনাথের বুক কাঁপছে। নিরঞ্জনবাবু আসতে পারবেন না। হয়ত আর কোনদিনই আসতে পারবেন না আর। তাঁর হৃদরোগ। এই রোগ সারবার নয়। ভাওনাথের কাছে সমস্ত জগতটা কেমন ঝাপসা মনে হয়। নাকে ধোঁয়াটে গন্ধ। দুনিয়ার সব কিছু যেন ধ্বংসের পথে। কেমন একটা মায়া মোহ, মাটিটাকে আঁকড়ে ধরে আছে তবু। মাটিটাও ছাড়ছে না। তার বুক থেকে মানুষের রক্ত বেরিয়ে আসছে। তাজা উত্তপ্ত রক্ত।

এগার

কাল পঁচিশে আগষ্ট। ধর্মঘটের দিন। কোম্পানী কোন কিছু বিবেচনা করেননি। যারা জলের পাম্প চালায় তাদের কাজ বন্ধ করতে বারণ করে দিয়েছে ভাওনাথ। সমস্ত কুলি লাইনে একটা অস্বাভাবিক উত্তেজনা। চা বাগানগুলোর চোখে ঘুম নেই। ভোরের পাখীর ডাকের অপেক্ষা করছে। আকাশের দিকে চেয়ে প্রভাতী তারা উঠেছে কিনা দেখছে বারে বারে। যত রাত হচ্ছে তত উত্তেজনা বাড়ছে। অফিস গুদোম কলকারখানা অন্ধকারের মধ্যে ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে।

ভোর না হতেই চঞ্চল অধৈর্য হয়ে ওঠে কুলি লাইনগুলো। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ছে দূরে দূরে অতি দূরে, অনেক পথঘাট পেরিয়ে জলে জঙ্গলে পাহাড়ে। মিছিল চলেছে। চারিদিক থেকে পিঁপড়ের সারির মত পিল পিল করে সমানতালে পা ফেলে মজুরের দল ছুটে আসছে চৌমাথায়। বুড়ো অশ্বথটা নির্বিকার হাসছে। পাখিগুলো আর্তনাদ করতে করতে উড়ে চলছে। তাদের পাখার ঝাঁকুনিতে পাকা বটফলগুলো ঝুপ ঝুপ করে ওদের গায়ে পড়ছে। বাজারের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ। দরজা জানলা খোলা নেই। পুরুষেরা চিৎকার করছে। ঐ সঙ্গে মেয়েরাও ধুয়া তুলেছে। তাদের পিঠে কাপড়ে শিশুসন্তান। ছেলেগুলো কেউ কাঁদছে, কেউ ভয়ে মায়ের পিঠের সঙ্গে চোখমুখ বুজে জড়সড় হয়ে পড়ে আছে। তাদের ত্রস্ত দীর্ঘশ্বাস পিঠ ফুঁড়ে মায়ের অন্তরে গিয়ে চিমটি কাটছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। বুড়ো বটগাছ তলে মেয়েপুরুষ সকলেই জমা হয়। বুড়োরা সাধুর কথা স্মরণ করে। বটগাছের গোড়া থেকে ধুলো কুড়িয়ে মাথায়, বুকে, জিভেয় লাগায়। ঐ সঙ্গে তরুণেরাও ছুটে আসে। হুড়োহুড়ি পড়ে। কাড়াকাড়ি লেগে যায় ধুলো নিয়ে।

গুদোমে পাঁচটা বাজার ঘণ্টা পড়লো। কাজে যাওয়ার ঘণ্টা। চৌকিদার নেই। রাত তিনটে পর্যন্ত ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঘণ্টা পিটিয়েছে সে। চারটের ঘণ্টা আর বাজে নাই। পাঁচটার ঘণ্টা বাজায় ইঞ্জিনিয়ার সাহেব নিজে।

রাত তিনটে পর্যন্ত গুদোমের কাজ চলেছে। তারপর গুদোম ফাঁকা। বাগানের সাহেবেরা পরিস্থিতি বুঝে কাচা পাতি মলাই করেছেন যতটা সম্ভব। বাকি পাতিগুলো পাতিগুদোমের মেঝেতে টিপি করা রয়েছে। কতক পাতি রোলিং মেসিনের মধ্যে অর্ধ্ব মাড়াই হয়ে পড়ে আছে। রং গুদোমের কতকগুলো বেড খালি আর কতকগুলোতে মাড়াই করা পাতি, সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় পচছে। দুর্গন্ধ আসছে সেগুলো থেকে। শুকলাই ঘর চায়ে ভরতি। মেসিনের মধ্যকার ট্রেগুলোতেও আধোভাজা চা রয়েছে।

মিছিল চলে বাগানের বড় সড়ক ধরে গুদোমের দিকে। সেখানে গিয়ে খানিকক্ষণের জন্য জিগির গায় তারা। তারপর চলে বড়-সাহেবের বাংলার পথ ধরে বাগানমুখো।

এরমধ্যে অনেকগুলো উড়োজাহাজের শব্দ শুনতে পায় ওরা। দশ বারখানা উড়োজাহাজের। মনে হলো একই সঙ্গে এক জায়গায় পাহাড়ের ওপর গিয়ে জমা হয়। শেষে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিন দিকে উড়ে যায়। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্লেনগুলোকে আর দেখা গেল না আকাশে। শব্দও থেমে গেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার শব্দ। এই শব্দ প্লেনের নয়। মোটরের ঘরঘর পটপট ফটফট আওয়াজ। দেখতে দেখতে পাঁচখানা লরি ভরতি পুলিস এসে হাজির হয়। পুলিশ দেখে লোকগুলোর উত্তেজনা আরো বেড়ে যায়। তারা আরো চড়াগলায় জিগির গাইতে থাকে—আমাদের দাবী মানতে হবে। মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। না হলে গদি ছাড়।

পুলিশ এসে দাঁড়ালো অফিসের সামনে। সেপাইগুলো লরির মধ্যেই তৈরি হয়ে নিল। কোমরের পেটিটা শক্ত করে বাঁধল, বুটের ফিতে পরীক্ষা করে দেখল ঠিক আছে কিনা। শেষে বন্দুকটি কাঁধে ঝুলিয়ে লরি থেকে নামল। ইতিমধ্যে থানা অফিসার

এসে বড়সাহেবের সঙ্গে করমর্দন করে কথাবার্তা শুরু করেছেন। খানিকক্ষণ বাদে দু'জনেই বাইরে আসেন। পুলিশগুলো তাদের দিকে চেয়ে অফিসের খোলা প্রান্তরে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওঁরা দুইজনে বাইরে আসতেই সকলে জুতোর শব্দ করে সেলাম ঠুকলো। বড়সাহেব হাসিমুখে সকলের সেলামের প্রত্যুত্তর দেন।

ততক্ষণে মজুরবাহিনী গুদোমের মেন গেটের সামনে এসে জমা হয়েছে। আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে অবিরাম জিগির গেয়ে যাচ্ছে—আমাদের দাবী মানতে হবে। মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। তা না হলে গদি ছাড়।

এই জিগির গাওয়াই তাদের একমাত্র কাজ। কারণ ভাওনাথ সকলকেই সাবধান করে দিয়েছে, কেউ যেন কোনপ্রকার অত্যাচার অথবা অশ্লীল ভাষা প্রকাশ না করে।

এরমধ্যে বড় সাহেব ও পুলিশ অফিসার জনতার কাছে এসে উপস্থিত হন। সেপাইগুলোও তাঁদের পিছু পিছু এসেছে।

পুলিশ অফিসার ভাওনাথকে জিগ্যেস করেন, তোমরা কি চাও? তোমরা কি বুঝতে পারছ না যে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনছ। কোম্পানী বাগান বন্ধ করে দিলে তোমরা কোথায় দাঁড়াবে, কি খাবে?

ভাওনাথ জবাব দেওয়ার আগেই জনতা জিগির গেয়ে ওঠে, আমাদের দাবী মানতে হবে। তলব বাড়িয়ে দিতে হবে' তা না হলে গদি ছাড়।

এই জিগিরের মধ্যেই একজন স্ত্রীকণ্ঠে পিছন থেকে বলে ওঠে, বড় সাহেবের মেমসাহেবকে বাগানে পাঠিয়ে দেও তাহলে বুঝতে পারবে আমাদের কী কষ্ট। ঠ্যাংএর ওপর ঠ্যাং দিয়ে বসে খেলে গরিবের দুঃখ বোঝা যায় না।

ভাওনাথ পিছন ফিরে তাকালো। কোথা থেকে কথাগুলো এসেছে কিছুতেই বুঝতে পারলো না। ইতিমধ্যে অম্বরবাহাদুর এগিয়ে এসে পুলিশ অফিসারের মুখোমুখি হয়ে বললে, তুমি তো আমাদেরই একজন। তুমি এসেছ কেন সাহেবদের পক্ষ নিয়ে। তুমি না হয় পুলিশ হয়ে খাতির পাচ্ছ কিন্তু তুমি কি জান না যে

তোমার ভাই বন্ধু বাপ খুড়োরো এদেরই বুটের গুঁতো খাচ্ছে। তুমি তোমার ঘরে যাও। আমরা বোঝাপাড়া করে নেব।

একজন মেয়েলোক পুলিশকে লক্ষ্য করে বললে, ওগো, তোমরা তো আমাদেরই লোক। আমাদের দেশের জলে রোদে হাওয়া মাটির মানুষ সাহেবদের একবার বুঝিয়ে দেও যে আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত।

আর একজন বিজ্ঞ মুখেই বলে ওঠে, হ্যাঁ, বুঝিয়ে দেবে। জানিসনে, ওরা সব দালালের দল।

চারিদিক থেকে নানাপ্রকার গালিগালাজের গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। সমস্ত লোকগুলো বড়সাহেব ও পুলিশদের চক্রাকারে ঘিরে রেখেছে।

সেপাইগুলো পুনঃপুনঃ অফিসারের দিকে তাকাচ্ছে। তাদের দেহ রাগে ক্ষোভে স্ফীত হয়ে উঠছে। একটু নড়ে চড়ে চাঙ্গা হয়ে নিচ্ছে।

ভাওনাথ অস্বস্তি অনুভব করে। শ্রমিকের দল ক্রমশ বেশি উত্তেজিত হয়ে উঠছে। পুলিশও সঙ্গীন খাঁড়া করে প্রস্তুত। হয়ত একটা কিছু সাংঘাতিক রকমের ঘটে বসতে পারে। ক্রুদ্ধস্বরে চিৎকার করে ওঠে ভাওনাথ, তোমরা শান্ত হও। আমাকে এদের সঙ্গে কথা বলতে দেও।

ভাওনাথের কথায় জনতা একটু শান্ত হয়। সে পুলিশ অফিসারকে বললে, আমাদের কোনরকম গোলমাল করার উদ্দেশ্য নেই। আমরা শান্তভাবেই আমাদের ধর্মঘট পালন করবো। শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটের মধ্য দিয়ে আমরা বাগানের মালিকদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে আমরা কাজ না করলে তাদের ক্ষতি আমাদের চেয়ে অনেক বেশি। আমরাই তাদের পেট ভরতি করছি অথচ আমরাই উপোসী।

চারিদিক থেকে আবার তর্জন গর্জনের রেশ ভেসে আসছে। ভাওনাথ কেমন যেন ভীত হয়ে পড়ে। সে পুলিশ অফিসারকে আস্তে আস্তে বললে, শ্রমিকের দল তোমাদের দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠছে। তোমরা এখান থেকে সরে পড়।

পুলিশ অফিসার বড়সাহেবের কানে কানে কি বললেন।

বড়সাহেব অফিসের দিকে চলে গেলেন। পথে ইঞ্জিনায়ারের সঙ্গে দেখা। ইঞ্জিনীয়ারের সঙ্গে কি সব কথাবার্তা হয় তাঁর। সেই মুহূর্তে ইঞ্জিনীয়ার সাহেব লরিগ্যারেজে গিয়ে একটা গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে পিছনের ফটক দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যান।

ইতিমধ্যে গেটের সামনে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেছে। হল্লাহল্লি হচ্ছে।

পুলিশ অফিসার, ভাওনাথ ও অম্বরবাহাদুর ঘটনা স্থলে উপস্থিত হয়। তারা দেখতে পায় একদল খৃষ্টান কুলি গুদোমে কাজ করতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে এসেছে আর সংঘের লোকগুলো তাদের বাধা দিচ্ছে।

পুলিশ অফিসার বিপ্লবীদের বললে, তোমরা ওদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু করতে পার না। তোমরা যাবে না, যেও না কিন্তু যে যাবে তাকে বাধা দিতে পার না। এটা বে আইনী।

মদনফুল দৃঢ়ভাবে বললে, কে বললে, আমাদের ভাই বোনদের অন্যায়ের বাধা দেওয়ার অধিকার নেই। নিশ্চয়ই আছে। তোমরা তো পর। অন্যায়ের প্রশ্রয় দেবেই। এতে যে তোমাদের স্বার্থ আছে।

নয়মেসে পোয়াতী বিরামমায়া তার ভারি পেট নিয়ে এগিয়ে এসে বলে, আইন শিখাতে এসেছ, আইন। আজকার আইন, আইন। আগে এই আইন কোথায় ছিল? বুটের গুতো, চাবুকের বাড়ি খেয়ে আমাদের প্রাণ গেছে, মা-বোনদের নষ্ট করেছে সেই সময় তোমরা কোথায় ছিলে—কোথায় ছিল তোমাদের আইন। রাগে ক্ষোভে দুঃখে গজগজ করছে সে। দেহ কাঁপছে। হাতের মুঠো শক্ত করছে। তল পেটের কাপড়টা খুলে দেখায় বিরামমায়া। এর মধ্যে নয়মেসে একটা মানুষ আছে। বাড়তে পারছে না খেতে না পেয়ে। একে খেতে দেওয়া মানুষের কাজ নয়? মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার আইন নেই তোমাদের। আইন আছে মেরে ফেলবার। সকলেই পুলিশ অফিসারের দিকে এগিয়ে তার হাত ধরে বলে—পেটটায় হাত দিয়ে দেখ। কথা শুনতে পাবে। কাঁদছে, দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে।

পুলিশ অফিসার হাতটা ছিনিয়ে নেয়। রাগে ফোঁস করে কি বলতে যাচ্ছিল হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে একটা অঘটন ঘটে। অপেক্ষারত সেপাইদের মধ্য থেকে একজন সেপাই হনহন করে ছুটে এসে বিরামমায়াকে একটা জোর ধাক্কা মারে। জনতা এত ঘন ছিল যে তাতে সে মাটির-পরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়নি। কিন্তু তার সামনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল আর একজন সেপাই। তার গায়ের ওপর গিয়ে পড়ে বিরামমায়া। সঙ্গে সঙ্গে ঐ সেপাইটি একটা ধাক্কা মারে। ধাক্কা ঠিক নয়—অনেকেই চিৎকার করে ওঠে—ঘুষি মেরেছে। ঘুষিটা পেটে লেগেছিল বিরামমায়ার। সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। দেহ নিষ্পন্দ, মুখ নির্বাক। পুলিশ অফিসার সেপাই দিয়ে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। নিজেও সঙ্গে যায়, একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। জনতা অসম্ভবরকম উত্তেজিত হয়ে ওঠে। ভাওনাথ নিজেও আর সংযত থাকতে পারেনি। সেও চিৎকার করে ওঠে—রক্ত দেও, যত লাগে তত দেও। এই অরাজকতার ধ্বংস কর। এই অবিচার অত্যাচার কিছুতেই সইবো না।

জনতাও বিরামমায়ার সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল মুখো আসতে পারে। সেপাইগুলো বাধা দিয়েছিল কিন্তু জনতা কিছুতেই মানেনি। এতে জনতা ও পুলিশের মধ্যেও আড়ালে আবডালে ঘুষোঘুষি হাতাহাতি হয়। এর মধ্যেই জনতার অনেকেই কিছু না কিছু একটা হাতে নিয়েছে। কেউ গাছের ডাল, কেউ বাঁশের আগা আর বাকি সকলের হাতেই ইঁট পাটকেল পাথর জাতীয় একটা কিছু। হাসপাতালে যেতে প্রথমেই গুদোম আর অফিস। যেতে যেতে অনেকেই গুদোম আর অফিসে ইঁট পাটকেল পাথর ছোড়ে। গুদোম ও অফিসের অনেকগুলো কাচ ভেঙে যায়। অফিস প্রায় খালি। বাবুরা কেউ নেই। সব পালিয়েছে। শুধু ছোটসাহেবের কামরায় চারটি সাহেব ভেজা বেড়ালের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের বৃষ্টির ফোঁটা গুনছে।

এরমধ্যে এক সময়ে মেমসাহেবও কুঠি ছেড়ে মোটর নিয়ে অন্যত্র চলে গেছে।

উত্তেজিত জনতার জিগির চলছে সমানে। এখন সমস্ত সেনাবাহিনীই মেয়েদের হাতে। তারা মনে করে এখন এটা তাদেরই ব্যাপার। তারাই আগে, পিছনে পুরুষগুলো।

হঠাৎ ভাদুরে মেঘ ডেকে ওঠে আকাশে। আঁধার হয়ে যায় সব কিছু। বৃষ্টি শুরু হলো। মস্ত বড় বড় ফোঁটা। বিরাট শব্দ করে হাসপাতালের টিনের চালের ওপরে পড়ছে। মনে হচ্ছে কেউ বুঝি বোমা ফাটাচ্ছে। একটুক্ষণ বাদেই ঝড়ো হাওয়া বয়। বৃষ্টির ধারা তেরচা হয়ে জনতার চোখে মুখে বিঁধতে থাকে। জনতার কেউ কেউ এই বৃষ্টির দাপট সহ্য করতে না পেরে সরে পড়েছে। এই সময়ে হঠাৎ এক গাড়ি মিলিটারি ফোর্স এসে নামলো। হাবিলদার পুলিশ অফিসারের সঙ্গে দেখা করে। পুলিশ অফিসার হাসপাতালের এক কোণে দাঁড়িয়ে তাকে যেন কি সব বললে। জনতা আরো জোরে জিগির ধরেছে। বিরাম নেই। মেয়েরা হাসপাতালে ঢুকে বিরামমায়াকে দেখতে চায়। ঠেলাঠেলি করছে।

ইতিমধ্যে হাবিলদার এসে মিলিটারী ফোর্সের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে মিলিটারীগুলো জনতাকে ধাক্কা মেরে, লাঠির গুতো দিয়ে হটিয়ে দেয়। জনতা অফিস, গুদোমে এসে হল্লা করতে থাকে। সেখান থেকেও তাদের তাড়িয়ে দেয় মিলিটারীগুলো। জনতা গুদোমের গেটের বাইরে এসে দাঁড়ায়।

এরমধ্যে বৃষ্টি থেমে গেছে। খণ্ড খণ্ড মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছে আকাশের গায়ে। রোদ উঠেছে। কেমন ম্যাজম্যাজে রোদ। তাপ রাগ বলতে কিছুই নেই। এই সুযোগে বৃষ্টিতে বিচ্ছিন্ন লোকগুলো আবার এসে যোগ দিয়েছে জনতার মধ্যে। আবার জোর জিগির গাইছে। গেটের লোহার শিকগুলো বেঁকিয়ে দিচ্ছে। জনতা নিরুপায় হয়ে গেটের বাইরে দিয়ে বড় কুঠীর দিকে ধাওয়া করে। বড় কুঠীর কাছে গিয়ে ইট পাথর ছুড়তে শুরু করে। বাংলোর কতকগুলো কাচ ভেঙে যায়।

অবস্থা আয়ত্তাধীন নয় বুঝতে পেরে পুলিশ অফিসার হাবিলদারের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মুহূর্তের মধ্যে হাবিলদারের ইংগিতে

মিলিটারীগুলো বেপরোয়া কাঁদুনে গ্যাস ছাড়তে থাকে। ফলে জনতা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়।

লোকগুলো ঘরে না গিয়ে খোলা মাঠে গিয়ে মিটিং করে। সকলেই বিরামমায়ার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে। মিটিংএ ঠিক হয় যতদিন পর্যন্ত মালিক সম্প্রদায় তাদের বিষয় বিবেচনা না করবে ততদিন পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তবে তা শান্তিপুর্ণ ভাবে। কোনরকম মারামারি, গালাগালি বা অশ্লীল ভাষা প্রকাশ করা হবে না। হুমকি দিতে হবে ফোঁস করতে হবে কিন্তু কামড়ানো চলবে না।

রাতে সমস্ত বাগানের কমিটি মেম্বার এসে ভাওনাথকে তাদের স্ব স্ব বাগানের সংবাদ দেয়। দলমাননগরের মত সব বাগান-গুলিতেই এইরকম ছোট বড় অত্যাচার হয়েছে। পুলিশ, মিলিটারী মোতায়েন ছিল। প্রায় বাগানেই কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এতে জনতার উত্তেজনা কমেনি বরং বেড়েছে।

এদিকে অন্ধকার আকাশে দীপ জ্বলেছে। এক ফালি চাঁদ উঠেছে ঐ সঙ্গে অসংখ্য তারা। ভাওনাথ হেসে বললে—বড় কাজে এরকম একটা কিছু ঘটেই থাকে। এজন্য চিন্তার কিছু নেই। মোটের ওপর আমাদের সমস্ত শান্তিপুর্ণভাবেই পালন হয়েছে এবং আমরা জয়ী। তবে এই ধর্মঘট যথারীতি চালিয়ে যেতে হবে যতদিন পর্যন্ত না মালিক সম্প্রদায় আমাদের বিষয় বিবেচনা না করে।

এরপর আরো দশ দিন ধর্মঘট চলে। কিন্তু চার দিন পার হতেই অনেকের মন অন্য ধারায় বইতে থাকে। কোম্পানী রেশন বন্ধ করে দিয়েছে। সমস্ত শ্রমিক ধাওড়াগুলো দীর্ঘশ্বাসে দীর্ঘশ্বাসে গুমোটে ভরে উঠেছে। ঘরে খাবার নেই। যার যা কিছু সোনা দানা ঘটি বাটি ছিল সব বিক্রি করেছে। অনেকের ধারও হয়েছে মহাজনের ঘরে। মহাজন ধার দিতে চায় না। আবার আগেকার ঘটনা স্মরণ করে একেবারে না বলতেও সাহস পায় না। যদি লুটতরাজ করে। ঐ সঙ্গে বিরুদ্ধ আর একটা ভয় জাগে মনে। বড়সাহেব বারণ করে দিয়েছে ধার দিতে। তিনি

বলেছেন—যদি ধার দেও তাহলে বুঝবো তোমরাও কমিউনিষ্ট। পুলিশে খবর দিয়ে জেলে পুরবো তোমাদের। তবুও প্রথম আতঙ্কটার গুরুত্ব অনেক বেশি কারণ প্রাণ নিয়ে টানাটানির সম্ভাবনা আর দ্বিতীয়টিতে ঠিক এইরকম ভয় নেই। তাই ভয়ে ভয়ে দু'এক টাকা ধার দেয় গোপনে। কিন্তু এতে কি চলে?

ভাওনাথ জানে এরই মধ্যে গুঞ্জন উঠেছে ঘরে ঘরে। ক্ষুধার্ত ছেলেমেয়েগুলো গজ গজ করছে, কাঁদছে, মেঝেয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, মায়ের কাপড় ধরে টানছে, কামড়ে দিচ্ছে। মা দুই এক ঘা বসিয়ে দেয় রাগে। কান্না আরো পঞ্চমে ওঠে। ঘর ছেড়ে বাইরে এসে নিশ্বাস নেয় মা। শেষে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ে ছেলেগুলো। ঘরে ঢোকে মা। অন্ধকার ঘর আরো অন্ধকার হয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল ঝরতে থাকে। স্বামী স্ত্রী দুইজনেরই এক দশা। স্ত্রী স্বামীর বুকে মুখ লুকোয়। স্বামী তার উষ্ম দীর্ঘশ্বাস অনুভব করে।

অনেকেই ধর্মঘটের সফলতা সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠেছে। তারা তাদের বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে বলে, এমনি করে আর কয়দিন চলবে। কাজে যাওয়াই ভাল।

এদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, কোন মুখ নিয়ে কাজে যাব বল। এতে তো অত্যাচার আরো বাড়বে, আরো বেশি লাঞ্ছিত, অপমানিত হতে হবে।

তাই বলে কি জীবন দেব, বলে অন্য জন।

এ শুধু দলমালনগরের কথা নয়। সমস্ত বাগানগুলোরই এই অবস্থা। ভাওনাথ, অম্বরবাহাদুর, করুণসিং, প্রেমপ্রকাশ, মদনফুল, পদমমায়া, বিলাসী, সুলেমান, তোরঙ্গবাহাদুর, মঙ্গলে ও বীরমায়া সমস্ত বাগান ঘুরে ঘুরে সবাইকে বোঝায়।

ভাওনাথ চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার এতদিনের সাধনা বুঝি মিথ্যা হয়। নানা দিক থেকে নানাপ্রকার কথা আসছে। হয়ত শীগগিরই লোকগুলো তারই ঘাড়ে চড়াও করবে। সে জন্য ভয় খায় না সে। তার ভয়, সে যা করতে চেয়েছিল তা সবই পণ্ডশ্রম হবে। তারই মা বাপ ভাই বোন আরো অন্ধকারে তলিয়ে যাবে।

অনেকে বলে, কোম্পানীর মেরুদণ্ড বড় শক্ত। ও ভাঙবে না, বেঁকবে না কিছুতেই।

ভাওনাথ বললে, কথাটা সত্য কিন্তু তোমরা কি মনে কর এই যে লাখ লাখ টাকা লোকসান হলো কোম্পানীর তোমরা বিনাসর্তে ধর্মঘট ত্যাগ করে কাজে যোগ দিলে ঐ টাকা তোমাদের ঘাড় ভেঙে সুদে আসলে আদায় করবে না ?

ভাওনাথ সকলকে বললে, কাল সমিতি থেকে তোমাদের সবাইকে মাথাপিছু কিছু কিছু টাকা দেওয়া হবে। তা দিয়ে আধাপেট খেয়ে ধর্মঘট চালিয়ে যাও। আর ধর্মঘট না চালালে একেবারে জাহান্নামে যাবে। যেটুকু এগিয়েছ তার চেয়ে অনেক বেশি পিছিয়ে যাবে।

ভাওনাথের কথাতে সকলেই একটু আশ্বস্ত হয়।

বিলাসী, মদনফুল, সুলেমান, তোরঙ্গবাহাদুর করুণসিং ও বীরমায়ার কাছেও অনেকে এসে ধর্মঘট ত্যাগ করার যুক্তি দেখায়। তারা এর উত্তরে বলে, একবার মনে মনে চিন্তা কর তোমাদের পুর্বপুরুষেরা কী অত্যাচার, অন্যায় সহ্য করেছে আর তোমরাই বা কি করছ ? চোখ বুজে ভেবে দেখ তোমাদের ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ। এরপরও কি তোমরা ধর্মঘট পরিত্যাগের ইচ্ছা রাখো ? তোমাদের মধ্যে কি সত্যিকার মানুষ নেই ? তাঁর কথা তোমরা শুনতে পাচ্ছ না ?

সুলেমান বলে, যায় যাক, সব ধ্বংস হয়ে যাক। কিছুই এসে যায় না। ভগবানের সৃষ্টি থাকবেই। নতুন পৃথিবী হবে। নতুন রক্তের নতুন মানুষ।

বিলাসী বলে, তোমরা কি সন্তানের বাপ মা নও। একটু দয়ামায়া হয় না ওদের জন্য। সামান্য দুঃখ কষ্ট সইতে পারবে না সন্তানের জন্য, ওদের বংশধরদের জন্য ?

মদনফুল রাগতগলায় বললে, তাহলে কেন জন্ম দিয়েছ এদের ?

বীরমায়া চড়াগলায় বলে ওঠে। সুখের সময় মনে ছিল না ছেলেমেয়ের ওপর তোমাদের একটা দায়িত্ব আছে ? তাদের জন্য অনেক দুঃখ কষ্ট সইতে হবে। তাদের মানুষ করতে হবে।

এরপর এক হপ্তা কেটে গেল তবুও কোম্পানী নীরব। বড়সাহেব প্রতিদিন দুই বেলা সকাল বিকেল অফিস গুদোম দেখে যান। অফিসের চেয়ার ঠাণ্ডা। বেশিক্ষণ বসতে পারেন না। গুদোমে যান সমস্ত মেসিনপত্তরগুলোর গায়ে হাত দিয়ে চমকে ওঠেন, সব ঠাণ্ডা। বরফের মত ঠাণ্ডা।

ভাওনাথের বুকেও ঐ সব ঠাণ্ডা মেসিনপত্তরের ছোঁওয়া লাগে। মেসিনগুলোতে জঙ ধরে যাচ্ছে। মরে যাচ্ছে ওগুলো। ভারতের প্রতিষ্ঠান। ভারতমাতারই এক একটা অঙ্গ। হঠাৎ ভাওনাথের ঠাণ্ডা হাত দুটো গরম হয়ে ওঠে। অনুভব করে। মন দৃঢ় হয়। আবার মেসিনগুলো চালু হবে। মেসিন চলার ঘস ঘস শব্দ শুনতে পায় সে। মেসিন চলছে। আমাদের দেশ, আমাদের প্রতিষ্ঠান। আমরা স্বাধীন।

আবার শ্রমিক মহলে হাহাকার পড়েছে। সমিতির আর টাকা পয়সা বলতে কিছুই নাই। ভাওনাথ একদিনে বুড়িয়ে গেছে চিন্তায় চিন্তায়। তার শক্ত দেহ, বাহু যেন নুয়ে পড়েছে। বিলাসী, অম্বরবাহাদুর ও তোরঙ্গবাহাদুরকে ডেকে পরামর্শ করে।

ভাওনাথ বললে, আমার বলতে তো কিছুই নেই যা দিয়ে এই বুভুক্ষু শ্রমিকদের বাঁচিয়ে রেখে ধর্মঘট চালাই। কথার জের রেখে একটুক্ষণ চুপ থেকে বললে, হ্যাঁ, আছে। রুকমিণ আর সুকুরমণির কখানা গয়না। কথাটা ভাওনাথের মনে ছিল না। হঠাৎ কে যেন তার মন থেকে ছুঁড়ে ফেললো কথাগুলো।

বিলাসী বললে, যে করেই হোক ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হবে। তোমরা যে যাই বলো, আমি যেন দেখতে পাচ্ছি পুব আকাশ লাল হয়ে উঠছে। সূর্য উঠবে। আমি আমার সব দেব। সব কিছু। পাপের ধন আজ পুণ্যে লাগবে। হাড়িয়া বেচা টাকা।

অম্বরবাহাদুর, তোরঙ্গবাহাদুরও দিতে স্বীকার করে।

প্রতি বাগানেই কিছু কিছু টাকা ওঠে। মদনকুল, বীরমায়া আরো অনেক মেয়েরা তাদের গয়না বন্ধক রেখে টাকা দিয়েছে। সুলেমান বাগানে এসে বেশ কিছু টাকা জমিয়েছিল। ইচ্ছা ছিল দেশে গিয়ে কিছু জায়গা জমি কিনে চাষ আবাদ করবে। সেও

তার পুঁজিপাটা সব দিয়ে দেয়। করুণসিং, প্রেমপ্রকাশ মঙ্গলে সকলেই কিছু কিছু দিয়েছে।

ভাওনাথ মনে মনে অনুভব করে। সে লোকগুলোকে দোষ দেয় না। রোগগ্রস্ত মন যে বাঁচতে চায় না। তারা মরণকেই বরণ করে। তবু এই ধ্বংসের মধ্য দিয়েই নতুন জীবন জন্ম নিচ্ছে। সে মাঝে মাঝে চিৎকার করে বলে—তোমাদের প্রত্যেকের বাঁচবার প্রয়োজন আছে। সবাইকে বাঁচতে হবে। দুনিয়ার মানুষ এক সঙ্গে এসে দাঁড়াও, একই ঘরে এক পরিবারভুক্ত হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে থাক। সে বুঝতে পারে তাদের দুঃখ আছে, আরো অনেক রক্ত ঝরবে। এই রক্ত মানুষের দেহের, বুকের কিন্তু অস্থিমজ্জায় যে ডাক দিয়েছে, তা রোধ করবে কে? সেই ডাক যে আনন্দের। মানুষ সব ধ্বংস করতে পারে কিন্তু আনন্দের সাড়াকে ধ্বংস করতে পারে না। সে বলে—জগতে যা কিছু সত্য তাই গোপনের। সত্য কখনও ঢাকঢোল পিটায় না। এই সত্য হচ্ছে একটা বিরাট শক্তি। এর আগমন হচ্ছে আমাদের জীবনের দুঃখ বেদনা কাঠিন্যের মধ্য দিয়ে। গোপনে সে তার কাজ করে যাচ্ছে। অন্তরের সমস্ত অলিগলির মধ্যে দিয়ে চুপে চুপে আসছে সে। তারই স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি আমরা আজ।

কয়েকদিন বাদে নিরঞ্জনবাবুর কথা মনে পড়ে ভাওনাথের। শ্রমিকদের এই সামান্য ভিক্ষা—না, ভিক্ষা নয়, জীবনের দান আর এর বেশি কিইবা আছে তাদের তারা তো তাদের সর্বস্ব দিয়েছে তবু এতে আর কয়দিন ধর্মঘট চালানো সম্ভব হবে। নিরঞ্জনবাবুকে একটা তার করে সমস্ত বিষয়, এখানকার পরিস্থিতি জানিয়ে কিছু সাহায্যের জন্য অনুরোধ করলে হয়। কিন্তু কি হবে—তিনি তো অসুস্থ তারপর হার্টের রোগী। হয়ত মনে আঘাত পেয়ে একটা আকস্মিক অঘটন ঘটতে পারে। তিনি নিশ্চয়ই খবরের কাগজে সব জানতে পারছেন। কিন্তু কী আশ্চর্য—এই খবরের কাগজগুলোর কর্তারাও যেন মালিক সম্প্রদায়ের দিকে। এত অন্যায়, অত্যাচার এদের চোখে পড়ছে না। এরা আন্দোলনকারীদেরই দোষারোপ করছে। ইনিয়ে বিনিয়ে

সত্য মিথ্যা মিশিয়ে নানা নতুন কথার সৃষ্টি করছে। অথচ লোকে জানে এই সংবাদপত্রের সম্পাদকেরাই মানবতার পুজারী। এই যে নয় মেসে পোয়াতী বিরামময়ার পেটে আঘাত নিয়ে সন্তানটিকে নষ্ট করে দেওয়া হলো, তার জীবন নিয়ে টানাপড়াপড়ি হলো, ফুলমণির পিঠেবাঁধা ছেলের হাত ভাঙল আরো অনেক ঘটনা এর কোনটাই কাগজে প্রকাশিভ হলো না। দেশের লোক জানতে পারলো না তাদেরই ছেলে মেয়ে ভাই বোনের ওপর কী বীভৎস অমানুষিক কাণ্ড ঘটে গেল সেদিন। অথচ ফলাও করে বলা হলো—ধর্মঘট নৈতিক চরিত্র গঠনের অন্তরায়, দেশের সম্পদ নষ্ট করে। এদের কাছে মানুষের জীবন দেশের সম্পদ নয়, সম্পদ যত ঐ ভুঁড়িওলাদের পেটে আরো চর্বি লাগানো। কথাটা হাসির আবার দুঃখেরও বটে।

বিকেলের বিশীর্ণ আকাশ। সূর্য ডুবছে। বিদায়ের শব্দ হচ্ছে। এক ঝিলিক রোদ এসে লাগে পৃথিবীর ওপর। ভাওনাথ দেখতে পায় সব কিছু হাসছে।

এই সময়ে একটা রেজিষ্টার্ড চিঠি এনে ভাওনাথের হাতে দেয় পিয়ন। ভাওনাথ চিঠিটা হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। এমন সময় পিয়ন বললে—তাড়াতাড়ি করে নেও, আমাকে বিদায় দেও। কেউ দেখতে পেলে অনর্থ ঘটবে। আশেপাশে অনেক টিকটিকি ঘুরছে।

পিয়নের এই কথার তাৎপর্য বুঝতে পারে ভাওনাথ। কারণ সে আগেই শুনেছে যে বড়সাহেব পোষ্টমাষ্টারকে তার নামের সব চিঠিগুলো খুলে তাকে দেখাতে বলেছে। বাগানের মধ্যে পোষ্ট-অফিস। বাগান থেকেই তৈরি করে দিয়েছে ঘরবাড়ি। এ ছাড়া অনেক সুখসুবিধা পায় বড়সাহেবের কাছে। বাগান থেকে বছরের জ্বালানী কাঠ দেয় পোষ্টমাষ্টারকে। এই জন্য তাকে সাহেবের তাবেদারে থাকতে হয়। সাহেবও তাকে বাগানের অন্য অন্য বাবুদের মত একজন মনে করে।

চিঠিটা লিখেছেন নিরঞ্জনবাবু। তিনি লিখেছেন—"সংবাদপত্রে তোমাদের ওখানকার পরিস্থিতি জানতে পারছি। ধর্মঘট চালিয়ে

যাচ্ছ জেনে বিশেষ খুশী হয়েছি। ধর্মঘট চালিয়ে যাবে যতদিন পর্যন্ত না মালিক আর তোমাদের মধ্যে একটা আপোস মিমাংসা না হয়। তবে আমার বিশ্বাস—দুই একদিনের মধ্যে মিটমাট হয়ে যাবে। কারণ বিলিতি খবরের কাগজে দেখতে পাচ্ছি—ডিরেক্টরগণ বিচলিত হয়ে উঠেছেন। ভারতের চা বাগান শ্রমিকদের পরিস্থিতি নিয়ে বিশেষ আলাপ আলোচনা করার জন্য শিগগিরই সমস্ত কোম্পানীর ডিরেক্টরদের একটা বৈঠক বসছে। ঠিক জেনে রাখবে যে তাঁরা যতই হুমকি বা ভয় দেন না কেন তাঁরা কিছুতেই তাঁদের এত বড় একটা সম্পদ নষ্ট করে দেবেন না। এ ছাড়া গভর্ণমেণ্টও ত দেবেন না কারণ এই চা শিল্প থেকে তাঁদের বিরাট একটা আয় হয়। বুঝতে পারছি দীর্ঘদিন ধর্মঘট চালাতে হলে তোমাদের বহু দুর্দশা, অভাব অভিযোগের সম্মুখীন হতে হবে। তাই লিখছি—যখনই শ্রমিকদের অন্নাভাব হবে আমাকে তার করবে। আমি যথাসম্ভব সাহায্য করবো।”

মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত অন্ধকার যেন আলো হয়ে গেল। ফুলগুলো ফুটে উঠলো। বাসন্তী গন্ধ আসছে নাকে। ভাওনাথের মনে হচ্ছে সে চিৎকার করে একবার বলে ওঠে—পৃথিবী আছে, মানুষ আছে। আমরাও মানুষ। আমরাও সব কিছু সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারবো।

এরমধ্যে আবার এক গোলমালের সূত্রপাত হয়। সমস্ত বাগান থেকেই প্রতিনিধিরা আসে ভাওনাথের কাছে। তারা বলে—আমাদের ভাই বোন মা বাপ আমরা ধর্মঘটের আগে যে কয়েকদিন কাজ করেছি তার রেশন পাইনি। আমরা ঐ কয়দিনের রেশন চাই। এ আমাদের প্রাপ্য। না দিলে ছাড়বো না।

কথাটা সত্য। রেশন দেওয়া হয় মাসে দু'বার। পনর দিন বাদ বাদ। রেশন পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধর্মঘট করা হয়নি। তার তিন দিন পর, চার দিনের গোড়ায় গিয়ে শুরু হয় ধর্মঘট। তাহলে দেখা যাচ্ছে সত্যই তিন দিনের রেশন পাওনা আছে। কথাটা উঠেছে জ্ঞাননগর বাগান থেকে। বলেছে—বীরমায়া।

বীরমায়াও প্রতিনিধিদের সঙ্গে এসেছিল। সে স্বীকার করে

কথাটা। সে আরো বললে—এরা যে কথায় কথায় আইন তোলে এখানে আইন কোথায়? আমরা নিশ্চয়ই এই তিন দিনের রেশন দাবি করবো।

মদনকুল বললে, সত্যি কথা। নিশ্চয়ই দাবি করতে হবে। দাবি নয়, আদায় করতে হবে। গুদোম ভরতি রেশন রয়েছে আর আমরা না খেয়ে থাকবো?

মঙ্গলে বললে, প্রয়োজন হলে গুদোম ভেঙে রেশন নিয়ে আসতে হবে। আমাদের পাওনা রেশন কার অধিকার আছে তাতে বাধা দেওয়ার। থাক না পুলিশ পাহারা। এই মালিক সম্প্রদায়ই তো আমাদের অভাবগ্রস্থ করে উপবাসী রেখে চুরি করতে শিখিয়েছে, আমাদের চরিত্র নষ্ট করেছে। গুদোমের ঐ চাল ধান গম আটা ও সবই তো আমাদের ধন। আমাদের মেহনতি থেকে চুরি করে গুদোমে মজুত করেছে মালিকের দল।

করুণসিং বললে, সত্যিকথা। রেশন আমাদের দরকার। আমাদের প্রাপ্য রেশন নিশ্চয়ই আদায় করে নিতে হবে।

সুলেমান বললে, শুধু কি তাই? এই বাগানের গুদোম ছাড়া কোনো বাগানের বাজারে একদানা চালও পাওয়া যায় না। মহাজনেরা লুটতরাজের ভয়ে তাদের মালপত্তর টাকা পয়সা সবই সরিয়ে ফেলেছে এখান থেকে। এমন কি তাদের ছেলে মেয়ে মা বউকেও অন্যত্র পাঠিয়েছে। শুধু ফাঁকা ঘরে অন্ধকারের মধ্যে দু' চারটে প্রেতমূর্তি নিশ্চুপ চলাফেরা করছে। অন্ধকারে টিকটিকির টি টি শব্দতেই চমকে উঠছে। ভেবে দেখ, চাল সংগ্রহ করতে কী পরিশ্রমটাই না করছি আমরা। কোথায় কোন বস্তি, দেওয়ানির ঘর আর কোথায় আলিপুর দুয়ার।

ভাওনাথ বললে, গুদোম ভাঙাচুরোর কথা পরের। আমাদের পাওনাটাই আগে আদায় করা দরকার। আমার বিশ্বাস ম্যানেজারেরা দেবে না। তবু শান্তভাবেই তাদের কাছে দাবি পেশ কর সকলে। সমস্ত শ্রমিকদের যাওয়ার দরকার নেই। শুধু সমিতির প্রতিনিধিরা গেলেই চলবে।

সমস্ত কথাবার্তা শেষ হলে ভাওনাথ নিরঞ্জনবাবুর চিঠিটা পড়ে

শোনায় সকলকে। সকলেই অবাক হয়। উৎসাহ উদ্দীপনা আরো বেড়ে যায়।

অনেকে বললে, এই বিপদে তিনি আমাদের যে টাকা দিয়েই সাহায্য করুন না কেন আমাদের অবশ্য সেই টাকা ঘুরিয়ে দিতে হবে যখন আমরা আমাদের বাড়তি তলব পাব।

প্রত্যেকের চোখ মুখ হাসিতে ভরে ওঠে। আনন্দমাখা উত্তেজিত কণ্ঠেই বলে ওঠে, তবে আর ভয় কি? চালাও ধর্মঘট। ভুঁড়িওলাদের ভুঁড়ির মেদ চর্বি কমে সমান হয়ে যাক।

পরদিন সকালে সমস্ত বাগানগুলোতে হৈ চৈ পড়ে যায়। জিগির গাওয়ার বয়ান চলেছে। সমস্ত লোকগুলো জিগির গাইতে গাইতে আফিস, গুদোম, বাংলোর কাছ দিয়ে বাগানের বড় সড়ক ধরে চললো। রেশন দিতে হবে। রক্ত চাও রক্ত নাও, আমাদের দাবি মানতে হবে।

বাগানের প্রতিনিধিরা আসে ম্যানেজারের কাছে। এতদিন বাদে তারা তার কাছে আসছে দেখে মনে মনে খুশী হয়। তার ধারণা হয় এরা আপোস মীমাংসা করতে আসছে।

প্রতিনিধিরা তাদের আরজি পেশ করে। ম্যানেজার বিরক্ত ভাবে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে জবাব দেয়, না, তোমরা পেতে পার না। পাবে, কাজে যোগ দিলে। তাও কোম্পানীর বিচারাধীন।

পুলিশ অফিসার ম্যানেজারের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি একটা ম্লান হাসি দিয়ে ম্যানেজারের দিকে ফিরে আস্তে অস্পষ্টভাবে বললেন, এটা ঠিকই ওদের পাওনা। দিয়ে দেওয়াই ভাল।

ম্যানেজার পুলিশ অফিসারের কথায় অসন্তুষ্ট হন।

পুলিশ অফিসারও ম্যানেজারের ওপর কিছুটা ক্ষুণ্ণ হন। এরপর আর কোন কথা হয় না ওঁদের মধ্যে। পুলিশ অফিসার প্রতিনিধিদের বললেন—তোমরা যাও। দেওয়া হবে কি হবে না বিকেলবেলায় জানতে পারবে।

ভাওনাথ সকলকে গোলমাল করতে নিষেধ করে। সে বলে—দুদিন বাদে পাই তাতে ক্ষতি কি? আমাদের ঘরে তো কিছু খোরাক আছে এখনও।

বারোটা একটা বাজতেই বাগানে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এসে হাজির হন। পুলিশ অফিসার ও ম্যানেজারের সঙ্গে ওঁদের কথাবার্তা হয়।

সমিতির প্রতিনিধিরা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সঙ্গে দেখা করে।

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন—তোমাদের তিন দিনের পাওনা রেশনটা নিশ্চয়ই পাবে। আজ বুধবার। শনিবার বিকেলে পাবে। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। তিনি রাজী হয়েছেন।

সকলেই যেন জীবনের একটা নতুন স্বাদ অনুভব করে। আনন্দ ও উৎসাহে মেতে ওঠে তারা। তাদের শ্রমিক জীবনে এত সহজে কোনদিনই কোন কিছু পায়নি। এ ছাড়া এরমধ্যে যেন তাদের শক্তির পরিচয় আছে।

এত দুঃখ দুর্দশা অভাব অনাটনের মধ্যেও মাঝে মাঝে ভাওনাথ যেন অন্য জগতে চলে যায়। স্বপ্নের মত স্বচ্ছ সুন্দর একটা পৃথিবী। সে আশা করতে পারেনি এতটা। লোকগুলো যেন সব এক। এক মন নিয়ে একই পথ ধরে চলছে তারা। জাতি বৈষম্য নেই। সব এক জাতি। বামুন, আদিবাসী, নেপালী খৃষ্টান সবাই সকলের খাচ্ছে। একা খাচ্ছে না, ভাগাভাগি করে খাচ্ছে। আজ তারা বুঝতে পারছে এতে পরম আনন্দ আছে। এই আনন্দ কোনদিনই পায়নি তারা। আনন্দের উৎস স্থানটিতে শক্ত পাথর চাপা দিয়ে তার গতিপথ রুদ্ধ করে দেওয়া ছিল। সেই শক্ত পাথরকে তারা তুলে ফেলে দিয়েছে।

এগারো দিনের গোড়ায় সূর্য অন্ধকারের অপ্রতিহত শক্তিকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে আলো নিয়ে উঠলো। পুবের আকাশ রক্তরাগরঞ্জিত। ঘুমন্ত চা শিরীষের গাছগুলো জেগে উঠেছে। তাদের দেহের পাতার কয়লা কালো চিমনির ধোঁয়ার দাগ মুছে গেছে। প্রাণের একটা অস্ফুট স্পন্দন শোনে। একটা নতুন দিনের আলো। নতুন জীবনের সাড়া।

কোম্পানী থেকে তার এসেছে বাগানে। শ্রমিকদের মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার

নতুন ঋতুর উৎসব শুরু হয়েছে। শরৎ এসেছে। পাখীর গান, বন, পাহাড় নদীর শান্ত মধুর কল্লোল শোনা যাচ্ছে। সর্বত্র একটা আনন্দের সাড়া। উপরে উদার অনন্ত আকাশ। সর্বজয়ী রোল উঠেছে। মাটির সেই ভ্যাপসা দুর্গন্ধ আর নেই। মাটির গর্ভকোষ থেকে ভেসে আসছে নতুন জীবনের গোলাপী গন্ধ। সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে সোনালী বন্যা। নির্মল বায়ুতে নিশ্বাস নিচ্ছে লোকগুলো। উজ্জ্বল যৌবনের চঞ্চল স্পন্দনে জীবনের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে এক দিগন্ত থেকে অন্য দিগন্তে। লোকগুলো কাজ করছে। গায়ে গা লাগিয়ে কাজ করছে এক সঙ্গে। এক ভাবধারা। সমস্ত সন্দেহ, দ্বন্দ্ব মুছে গেছে। নতুন সমাজব্যবস্থায় অনেক নতুন মানুষ তৈরি হচ্ছে, জন্ম নিচ্ছে। সূর্য এদের জীবনের দিক নির্ণয় করছে আর মাটি এদের জন্ম দিচ্ছে।

এরমধ্যে দেশ স্বাধীন হয়েছে।

সুলেমানের সঙ্গে বীরমায়ার বিয়ে হয়েছে। ওরা দু'জনে বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করছে। সুলেমান দলমালনগর ছেড়ে যেতে চায়নি কিন্তু ভাওনাথের কথায় জাননগরে গিয়েছে সে। ভাওনাথ হাসতে হাসতে বলে আমরা আর কতদিন? তোরঙ্গবাহাদুর আর মঙ্গলেই বা কতদিন বাঁচবে? তারাও বুড়ো হয়েছে। এতো নতুন সমাজ গড়নের শুরু। এখনো অনেক বাকি আছে। সে সব তোমাদেরই করতে হবে। তুমি আর বীরমায়া জাননগরে থাকলে সেখানকার আশপাশের দশ বারোটা বাগানের কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলবে। আর এখানে থাকবে করুণসিং ও মদনকুল।

এত সুখ শান্তি আনন্দের মধ্যেও ভাওনাথ কেমন যেন একটা বেদনা অনুভব করে। ক্লান্তি, অবসাদ। হয়ত আরো কিছু হবে। এই পয়ষট্টি বছর বয়সেও জীবনে সে ক্লান্তি অনুভব করেনি

কোনদিন। আজ সত্যই সে ক্লান্ত। তার দেহ শিথিল। বাহুদ্বয় কে যেন মোচড়ে ভেঙে দিয়েছে। চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। সে দেখতে পায় দুনিয়ার সব কিছু ঘিরে এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার নেমে আসছে। এই কুৎসিৎ অন্ধকারের বুক থেকে বেরিয়ে আসছে এক দম আটকা পচা দুর্গন্ধ। আর ঐ সঙ্গে অসংখ্য কীট। মনের গভীরতম প্রদেশ থেকে একটা যন্ত্রণা উঠে আসে। এই যন্ত্রণা মৃত্যু যন্ত্রণা নয়। মৃত্যু যন্ত্রণারই মত আর একটা কিছু। হয়ত বা তার চেয়েও বেশি একটা কিছু হবে। মৃত্যু যন্ত্রণাকে সে জানে। অনেক মৃত্যু দেখেছে। তার বাপ মা, রুকমিণ সুকুরমণি ও বন্ধনীর মৃত্যু। এ যন্ত্রণা সেই যন্ত্রণা নয়। আর মৃত্যুর যন্ত্রণাকে ভয় নেই তার, মৃত্যু যন্ত্রণার মত অনেক যন্ত্রণাই সে জীবন্তকালেই ভোগ করেছে। এ নিশ্চয়ই অন্য কিছু। কালের সংহত প্রবাহ হবে। এ তারই সংকেত।

হঠাৎ সেই কুৎসিত ভয়ঙ্কর অন্ধকার ভেদ করে এক ঝিলিক আলো আসে নেমে। দেহের সেই ক্লান্তি নেই চোখ দুটো আগের মত পরিষ্কার। এই আলোতে দেখতে পায় সে তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষু আর সাধু।

এবারে চমক ভাঙে ভাওনাথের। সে কি স্বপ্ন দেখছিল? না, না স্বপ্ন নয়, সত্য। দুনিয়ায় যা কিছু আছে সব সত্য। মানুষ সংগ্রাম চালায়, বাঁচতে চায়। আবার মুক্তিও চায়। এই-ই মানুষের ধর্ম।

বৌদ্ধ ভিক্ষুকের দান—সেই জপমালাটি খুঁজে খুঁজে বার করে। মালা জপে সব সময়।

একদিন হঠাৎ কি মনে করে বিলাসী ও পদমমায়ার সঙ্গে মদনফুলের বিয়ে সম্পর্কে আলোচনা করে ভাওনাথ।

করুণসিং ও মদনফুলের মত জিজ্ঞাসা করে সে। করুণসিং নিশ্চুপ থাকে। মদনফুল উত্তর দেয়। সে হেসে উড়িয়ে দেওয়ার মত ভান করে বললে—এই বুড়ো বয়সে প্রায় চল্লিশের কোঠায় পা দিয়ে কবর না খুঁজে সংসার করবো?

ভাওনাথ বললে—মনের বাসনাকে গোপন রেখে মুক্তি নেই। তারপর সমাজ তৈরির কাজে তোমাদের বিয়ে হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আশ্বিনেই বিয়ে হয়ে যায় ওদের। হেমন্তের ফসল দেখা দেয়। নতুন বীজের নতুন শক্তিশালী ফসল। বিলাসী, ভাওনাথ ও পদমমায়ার আনন্দ ধরে না।

এরপর শীত এলো কাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে। কুয়াশা কুয়াশায় সমস্ত পৃথিবীটা ধোঁয়াটে অন্ধকার হয়ে যায়। আকাশ থেকে তীরের মত ছুটে আসছে বরফ জল। কোথাও কিছু নেই। সব যেন ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে ধোঁয়াময় হয়ে গেছে।

ভাওনাথ মালা জপছে আর এক মনে তাকিয়ে আছে ধোঁয়াটে ঐ অন্ধকারের দিকে। তার চোখে পরম বিশ্বাসের এক উজ্জ্বল আলোর দ্যুতি। পাশে বসে মদনকুল, বিলাসী, করুণসিং ও পদমমায়া।

ভাওনাথ নিষ্পলক চেয়ে আছে। কি এক নতুন অনুভূতি তার মধ্যে কাজ করছে। সে দেখতে পাচ্ছে—দূরে বহু দূরে সূক্ষ্মতম বিন্দুর মত আলো। ছোট সেই আলোকবিন্দু—দেখতে দেখতে একটা বিরাটত্বে পরিণত হলো। সমস্ত গাছপালা পাহাড় পর্বত নদী আকাশ মাটিতে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়েছে। সমস্ত বনজঙ্গলে গাছের পাতায় পাতায় মর্মরধ্বনি, হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর মুখে হাসি, ঝরণা গান গেয়ে চলেছে। পাখিরা ডানামেলে উড়ে যাচ্ছে। ফুলের গন্ধ আসছে ভেসে। কারো কোন ব্যস্ততা চঞ্চলতা নেই। একটা অখণ্ড নীরবতা। এই নিস্তব্ধতার বুক থেকেই সব কিছু আনন্দ, কল্লোল শিহরণ জেগে উঠছে। ভাওনাথ বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে সব। বুকে একটা যন্ত্রণা অনুভব করে। ভাওনাথের মনে পড়ে আগের সেই যন্ত্রণার কথা। এ সেই যন্ত্রণা। জপমালাটিকে দু'হাতে বুকে জাপটে ধরে জপ করতে থাকে। আবার অন্ধকার হয়ে আসে। সেই ভয়ঙ্কর বিদঘুটে অন্ধকার। কে যেন তার লম্বা বাহু বাড়িয়ে দিল। চলে গেল উর্ধ্বে, উর্ধ্বে, অতি উর্ধ্বে।

চা শিরীষের গাছ, ঘরবাড়ি মাটি কেঁপে উঠলো, কাঁদছে। উপর থেকে ধ্বনিত হলো—মায়া। মায়া।